ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

প্রথম বর্ষ □ অষ্টম সংখ্যা □ ডিসেম্বর ২০১২ □ ৩০ টাকা

Subscribe Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (কুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮ ই-মেল: chhelebela@swarnakshar.in

অনলাইন গ্রাহক হতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

বাঙালিমননে নবতরঙ্গ

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

এখন কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

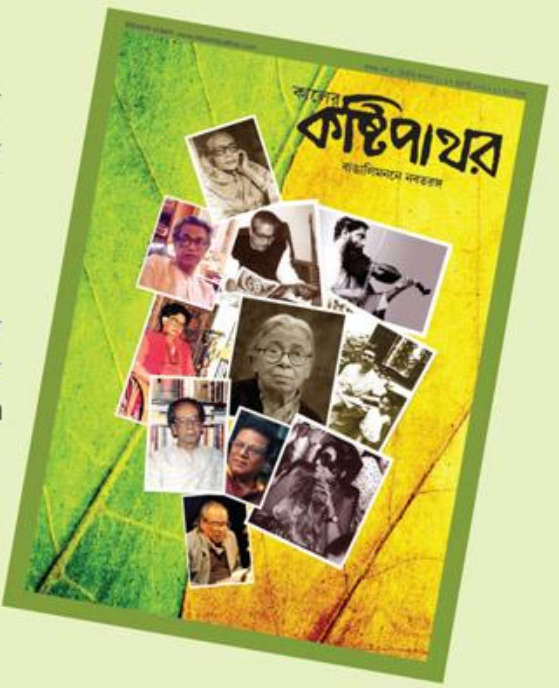

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের ১২টি সংখ্যার গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

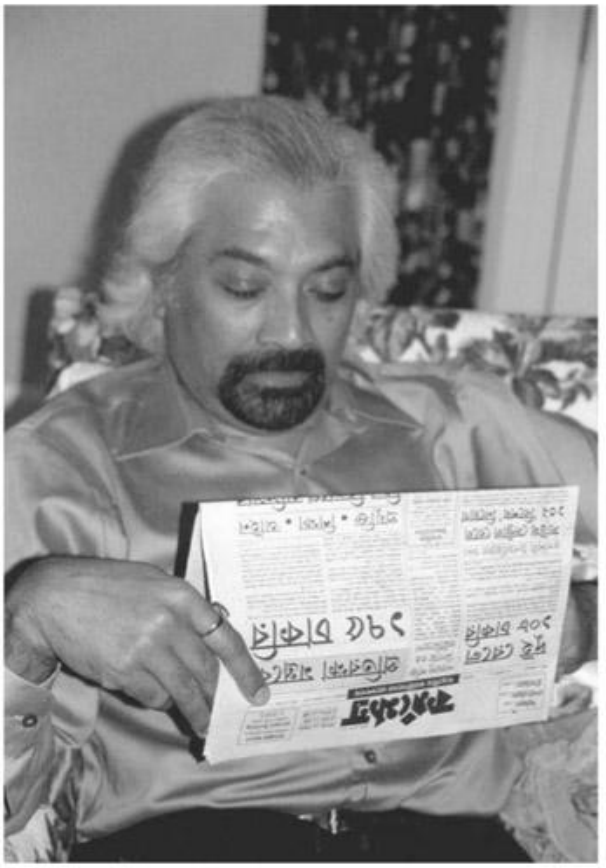

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, আঁত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। 'রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল' কর্মসূচির উপদেষ্টা।

'একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি 'কর্মক্ষেত্র'-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।'

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে 'কর্মক্ষেত্র'-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে **কর্মক্ষেত্র**: www.ekarmakshetra.com

ক্যারিয়ার খরচ ছাড়াই
ক্যারিয়ারে পেতে গ্রাহক হোন:
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

প্রথম বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা। ডিসেম্বর ২০১২। পৌষ ১৪১৯

সূ চি প ত্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ৯
আল মাহমুদ ■ তসলিমা নাসরিন ■ জ্যোতির্ময় দত্ত ■ মহাশ্বেতা দেবী
বিমলচন্দ্র ঘোষ ■ বাণী বসু ■ অমিয়ভূষণ মজুমদার ■ সাগরময় ঘোষ
বুদ্ধদেব বসু ■ অশোক মিত্র ■ মতি নন্দী

আমাদের হ্যামলেট। বিভাস চক্রবর্তী ৩৪

মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি
নন্দলাল বসু ১৭

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ। সবিতেন্দ্রনাথ রায়
কবি ঔপন্যাসিক সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ২১

কাজের বাংলা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯

আমলাহি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। চাঁদা ৮৪

সাময়িকপত্রে সেকালের লেখা। বারিদবরণ ঘোষ ৭৫

হেঁয়ালির ছন্দ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১

চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডী লাহিড়ী। চাঁদিফাটা গরম ৭

স্বনির্বাচিত গল্প। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
নসিরাম ৭৮

ভ্র ম ণ ক থা

অস্ট্রেলিয়ার ঝোপে-সৈকতে কবিদল। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৫৫
কাপাডোকিয়া। প্রতাপকুমার রায় ৮৬

ক বি তা র পা তা

কবিতা-পরিচয়
'নৌকাডুবি': সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৪৬
বুদ্ধদেব বসু ■ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ■ বুদ্ধদেব বসু ৫০

রবীন্দ্রনাথ পড়ার সময় : কালীকৃষ্ণ গুহ ৫২
কালীকৃষ্ণ গুহর স্বনির্বাচিত ছয়টি কবিতা ৫৩

ধা রা বা হি ক

আমার ছবিজীবন। **শুভাপ্রসন্ন** ২৬
গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি। **সমরেশ মজুমদার** ৩১
একাত্তরের দিনগুলি। **জাহানারা ইমাম** ৪০
বিষাদগাথা। **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী** ৬৩
নেকড়ের চোখ। **দানিয়েল পেনাক** ৯৩
অনুবাদ মৈত্রেয়ী নাগ

নি য় মি ত

সম্পাদকীয় ৫। কয়েকটি চিঠি ৬। ক্ষণের বচন ৮। শব্দবক্র ৮
সাহিত্যের খবর ৭০। পুরনো অ্যালবাম ৬২

প্রচ্ছদের ছবি : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

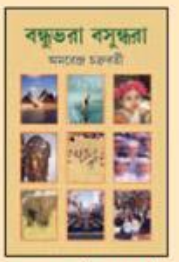

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▶ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
To be launched shortly
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: books@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

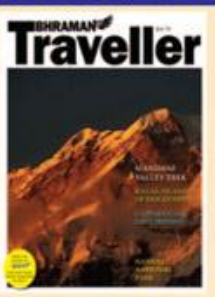

কালের কষ্টিপাথর
পৌষ ১৪১৯ □ ডিসেম্বর ২০১২

উৎসর্গ

(৩০ নভেম্বর ১৯০৮-১৯৭৪)

বাঙালির সাহিত্যচর্চার চিরন্তন সঙ্গী বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিতে

স ম্পা দ কী য়

মানুষ যদি কবিতা চূড়ান্ত আয়ত্ত করতে পারে
শয়তান আর রাক্ষসের ভীতির কারণ হবে সে

কিশিগবাতু
(মোঙ্গোলিয়ার কবি। ১৯৪৯-১৯১৬)

প্রায় অর্ধবর্ষব্যাপী 'কালের কষ্টিপাথর'-এ ভাবনাচিন্তার বড় কোনও অদলবদল না ঘটলেও দুটি সংখ্যার মধ্যে বিরতিকালের পরিবর্তন ঘটাতেই হল। এই সংখ্যা থেকে 'কালের কষ্টিপাথর' প্রতি পক্ষের বদলে প্রতি মাসে প্রকাশিত হবে।

একইসঙ্গে আমাদের মনের মতো ও মনস্ক পাঠকের ক্ষুধাসম্মত প্রচুর লেখা প্রতি পক্ষে প্রকাশ করা যত কঠিন, এক পক্ষকালে তা পড়ে ওঠাও প্রায় ততটাই অসম্ভব। এ-বিষয়ে বহু পাঠকের সুচিন্তিত মতামত আমাদের পথ দেখিয়েছে। পত্রিকার সাময়িকতা বদলের একটা জোরালো কারণও হয়তো উল্লেখ করা উচিত। অসৎ কাগজব্যবসায়ীর প্রতারণায় আমরা অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

সে যা-ই হোক, বাংলার এই নতুন সাহিত্যপত্রিকা বাঙালির অন্তর ছুঁয়েছে জেনে আমরাও অন্তর থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। প্রতি পক্ষের বদলে 'কালের কষ্টিপাথর' এখন প্রতি মাসেই বাঙালির মানসপরিক্রমার পথ হয়ে উঠুক। এ-ই হবে আমাদের প্রয়াস। এই হোক আমাদের প্রার্থনা।

ক য়ে ক টি চি ঠি

বিগতকালের মানুষদের কথা

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকাটি এতই অসাধারণ যে কত প্রশংসা করলে যে তা যথেষ্ট হবে জানি না। অবশ্যই এমন জিনিস দুয়েকটা আছে যা এই কাগজের যোগ্য নয় হয়তো। কিন্তু এই পত্রিকা প্রথমেই পুরোপুরি পড়ে শেষ করতে হয়, তারপর অন্য কাজ। আসলে এখন পুরনো কথাগুলি— বিগতকালের মানুষদের কথা— বেশি করে শুনতে ইচ্ছে করে। এখন তো আর সামনে কিছু নেই— সবই পিছনে পড়ে আছে! আজই অমিয় দেবের সঙ্গে পত্রিকার কথা হচ্ছিল— মুগ্ধতাবশত উচ্চারিত সব কথা! শুভেচ্ছা জানবেন। এবং কৃতজ্ঞতা।

কালীকৃষ্ণ গুহ
১ অক্টোবর ২০১২
বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ১০৬

জাহানারা ইমাম

'কালের কষ্টিপাথর' পড়লেই বোঝা যাবে এখানে আপনার সম্পাদকসত্তার সামর্থ্য নতুন করে আবার প্রমাণিত হয়েছে। রমানাথ রায়ের তিনটি গল্প রাখার পরিকল্পনায় বোঝা যায়, শক্তিশালী কোনও কথাকারকে নির্বাচন করে প্রতিবারই হয়তো এরকম তিনটি করে গল্প রাখা হবে একজনের। পুনর্মুদ্রণের বিভাগগুলিও সুনির্বাচিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি তো অনবদ্য। 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' বিষয়ক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা, সঙ্গে সঙ্গে নরেশ গুহ অরুণকুমার সরকারের প্রতিক্রিয়াগুলি আবার ছাপা হওয়াটা কত দরকারি ছিল, লেখাগুলি একত্রে পড়লে ধরা যায়। একইভাবে প্রয়োজনীয়, ১৯৮১ সালে লেখা আপনার ভূমিকাটির পুনর্মুদ্রণ। 'কবিতার পাতা' শিরোনামে যে এই লেখাগুলি দেওয়া হল এখানে সম্পাদক হিসেবে আপনার উদ্ভাবন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিয়মিত বিভাগগুলি প্রত্যেকটাই আকর্ষণীয়। 'বই ঠেক', 'বই পড়া', 'খোলা খাতা', 'চণ্ডীমণ্ডপ' পরের সংখ্যার জন্য উৎসুক করে রাখল। বিশেষভাবে বলবার মতো 'মহাজনসঙ্গ' 'পুরনো অ্যালবাম' এবং 'যে কথা বলা হয়নি'। জাহানারা ইমামের লেখার জন্যই আমার ধারণা, অনেকে, কষ্টিপাথর পড়বেন নিয়মিত।

বলতে ভুলে গেছি 'হেঁয়ালির ছন্দ' খুব ভালো লেখা। কত কী পড়বার জিনিস দিয়েছেন এই কাগজে।

একেবারে নতুনরকমের একটি পত্রিকা। পরবর্তী সংখ্যা থেকে আমাকে গ্রাহক করে নিন। ৪৬ বছর, মানে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, 'কবিতা- পরিচয়' পত্রিকা অল্পদিনের জন্য প্রকাশিত হয়। বাংলা কবিতার ইতিহাসে সেই 'কবিতা-পরিচয়' ও তার সম্পাদক ইতিমধ্যেই স্থান পেয়ে গেছেন। এই পত্রিকাটির দিকেও আমরা তাকিয়ে রইলাম।

জয় গোস্বামী
প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৭

সুনীল-স্মরণ

'কালের কষ্টিপাথর' ১৬ নভেম্বর সংখ্যায় 'সুনীল-স্মরণ'-এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। স্মরণপত্রে কবি উৎপলকুমার বসু ও বেলাল চৌধুরীর লেখা দুটি ভালো লাগল। আরও ভালো লাগল পুরো পত্রিকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অবিস্মরণীয় কবি-লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখা ও প্রাসঙ্গিক রচনাগুলো। সেইসঙ্গে অব্যর্থ সম্পাদকীয়টি।

অক্লান্ত লেখক, আমূল কবি, স্বাধীন চিন্তক, মতামত প্রকাশে নির্ভীক উদার মনের মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে আর নেই— ওঁর অসংখ্য অনুরাগীর মতো একথা মেনে নিতে আমারও বুক টনটন করে। টিভিতে কাগজে ব্যক্তি সুনীল ও তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ বহু বিশিষ্টজনের তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসে প্রশংসায় আমাদের মতো জনতার ভেসে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। কবির শেষযাত্রায় জনসমুদ্র বা সাহিত্যবহির্ভূত, সুনীল-বিরোধী সরকারের অঢেল আয়োজন তথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর সামিল হওয়া নিয়েও আমার কিছু বলবার নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের পর একমাত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই বাংলাসাহিত্যের যুগন্ধর স্রষ্টা— অনেকের লেখায় বলায় এরকম একটা ভাবনা-পরিবেশ তৈরি হতে দেখে আশংকা জাগে। জীবনানন্দ, মানিক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি— বাংলা ভাষায় মাঝের এইসব ঐতিহাসিক স্তম্ভ কি তবে ধুলোয় মিশে গেল! এমনকি হালের শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়?

ঠিক যে, এঁরা কেউ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো দুহাত বাড়িয়ে দুই বাংলার হৃদয় ছুঁতে পারেননি, আমাদের প্রিয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এটা একটা বিরাট জয়, কিন্তু সাহিত্যের প্রেক্ষিত তো ওই একটাই না! সেদিক থেকে সুনীলেরই বন্ধু, কবি উৎপলকুমার বসুর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন মনে হয় বহুলাংশেই সত্যাভিমুখী।

এখানে আরও একটা কথা হয়তো ভাবতে হবে। এবছরই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর মাস-কয়েক আগে, বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম লেখক হুমায়ূন আহমেদ অকালে তাঁর সাহিত্যজীবনের আকস্মিক ইতি টানলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৃহদায়তন, বিখ্যাত উপন্যাস-ত্রয়ী ও নীল লোহিতের আখ্যানগুচ্ছ বা কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার ওপারবাংলার মানুষ যত পড়বার সুযোগ পেয়েছেন, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস বা হিমু-কথিত আখ্যানমালা কি মিসির আলীর গোয়েন্দাকাহিনি এপারবাংলার পাঠকসমাজ তত পড়তে পাননি। পারলে বাঙালি পাঠকের দুই নয়নে হয়তো দুজনেই ভাগাভাগি করে আসন পেতেন। হুমায়ূনের প্রয়াণে বাংলাদেশের চ্যানেলে-চ্যানেলে, সংবাদপত্রে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ও ঐতিহাসিক শেষযাত্রা অনেকেরই হয়তো মনে আছে। অথবা এ-ও হয়তো সাহিত্যের রূপ-রহস্যভেদের এক অতি সরলীকরণ। বিশেষ করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সব কিছুর আগে বা সব ছাড়িয়ে কবি, তাঁর মতো আর কে লিখতে পেরেছেন— 'কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি'!

অবিনাশ আচার্য
কল্যাণী, নদিয়া

দুই সাহিত্যিকের স্মৃতি

'কালের কষ্টিপাথর'-এর সপ্তম সংখ্যায় (১৬ নভেম্বর ২০১২) সদ্যপ্রয়াত দুই সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক সবকটি লেখাই মন ছুঁয়ে গেল। 'কালের কষ্টিপাথর'-এর একজন একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে এ খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে, এই দুই সাহিত্যিকের কোনও লেখা আর এই পত্রিকায় পড়ার সুযোগ পাব না। তাঁদের স্মৃতি অমলিন থাকবে আমাদের হৃদয়ে আর থাকবে স্মৃতিকথায় সমৃদ্ধ 'কালের কষ্টিপাথর'-এর এই অমূল্য সংখ্যাটি। ধন্যবাদ আপনাদের।

জয়ন্ত বসু
বাগবাজার, কলকাতা

চণ্ডীমণ্ডপ

চাঁদিফাটা গরম

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

বর্ধমানের রাঢ় অঞ্চলের মাঠ এককালে গরমে ফুটিফাটা হয়ে যেত। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। গোয়ালারা তাদের গরুর পাল নিয়ে গঙ্গার ধারে বাথান করত। গরুগুলো ঘাস না পাক, খাবার জল তো পাবে। একবার এক মুসলমান গ্রামে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলাম। জমিদার বাড়ি। দোতলা মাটকোঠা। তালগাছ কেটে কড়িবরগা। মেয়েরা হয়তো অন্দরমহলে। বাইরের সিমেন্ট বাঁধানো মেঝেয় দুই জমিদার ভাই পাটি পেতে বসে। তাঁদের মাথা বিলকুল নেড়া। ঠিক মধ্যিখানে একতাল মাখন। মাখন গলছে না। দুই ভাই নট্ নড়নচরণ। মাথা যখন গরমকালে গরম হয়ে যায় তখন মাঝখানের ওই মাখন মাথা ঠান্ডা রাখে। বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত মাখনের তাল মাথায় নিয়ে তাঁদের বসে থাকতে হয়। নইলে পাগল হয়ে যাবেন তাঁরা।

ওই অঞ্চলে চৈত্রমাসে পাগলের সংখ্যা বেড়ে যায়। এদের বলে চোত্‌পাগল। আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি নামলে এরা সেরে যায়। দূর দূর অঞ্চল থেকে পাগলরা আবার ঘরে ফিরে আসে।

হিন্দুরাও কম যান না। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোবরেজরা মধ্যমনারায়ণ তৈল জমিদারবাবুকে পাঠিয়ে দেন। মঞ্জিষ্ঠা কাঠ তেলে চুবিয়ে তার রং করা হত গোলাপি। সেই তেলে কোবরেজ মশাই ওষুধ মেশাতেন।

ক্ষণের বচন

৪২

দেবতারও দোষ ঘটে, পণ্ডিতেরও ভুল হয় কাজে
দোষ-ভুল মেনে নিলে তবেই মানুষ হওয়া সাজে।
সবেতেই সাধুবাদ— বিষমাখা নাড়ু বলে জেনো
দোষ-ত্রুটি ধরে যারা তাহাদেরও বন্ধু বলে মেনো।

৪৩

ভালো-মন, ভালো-চোখ, হও ভালো লোক
যেমন পাখির গায়ে পাখির পালক

৪৪

পরস্পরের চোখের মধ্যে ভাসো
অচেনা মুখ হলেও তবু হাসো

৪৫

বিকেলবেলার হলুদ নদীর ধারে
সবাই সবার বন্ধু হতে পারে।

৪৬

পাকমগ্ন যে মানুষ অন্যে নিন্দা করে
আলোপ্রসাধিত তাকে আলেয়ায় ধরে
নিজে সে জানে না তাই সাফল্যে চেঁচায়।
এমন দুর্দশাগ্রস্ত জীবন কে চায়?

ক্ষণকথক

শব্দবক্র

৪২। অবশ্যম্বাদী

বিশেষণ; যিনি সমস্ত ইতিবাচক উত্তরে 'হ্যাঁ' না বলে 'অবশ্যই' বলেন >
— বোসবাবুর বাড়িটা কি এদিকে?
— অবশ্যই।
— মন্দিরের পিছনে কি?
— অবশ্যই...

৪৩। ইয়েপাগল

বিশেষণ; যাঁর কথায় 'ইয়ে' শব্দটির ব্যবহার এত বেশি যে বাক্যের অর্থ বোঝা প্রায় অসম্ভব > ইয়েকে বলিস তো আমাকে যেন একটা ইয়ে দিয়ে যায়, ইয়ের পরে হলেও চলবে।

৪৪। তাথৈবচ

বিশেষণ; যে বিশেষ পরিস্থিতিতে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোনও আচমকা সুখবর পেয়ে আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে হয় > পুজোর মুখে ট্রেন ফেল করে সবাই কাঁদ-কাঁদ, এদিকে আমার অবস্থা তাথৈবচ, শহর ছাড়ার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না।

৪৫। হ্রাস্ফালন

বিশেষ্য; পেট্রল বা খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির পর তা কমবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও 'কমিয়ে তবে ছাড়ব', 'এ অনাচার চলবে না' ইত্যাদি বলে যে হইচই ফেলা হয়।

৪৬। খবরদালাল

বিশেষ্য; সাংবাদিকতার ছদ্মনামের আড়ালে থেকে যেসব লোক শাসকদল বা বিরোধীদলের স্বার্থ অনুসারে সংবাদ উপস্থাপন করে থাকেন > কাগজে যা কিছু পড়ছি, সবই তো খবরদালালদের লেখা দেখছি। দেশে কি আর সাংবাদিক কেউ বেঁচে নেই?

শব্দবক্রমুণি

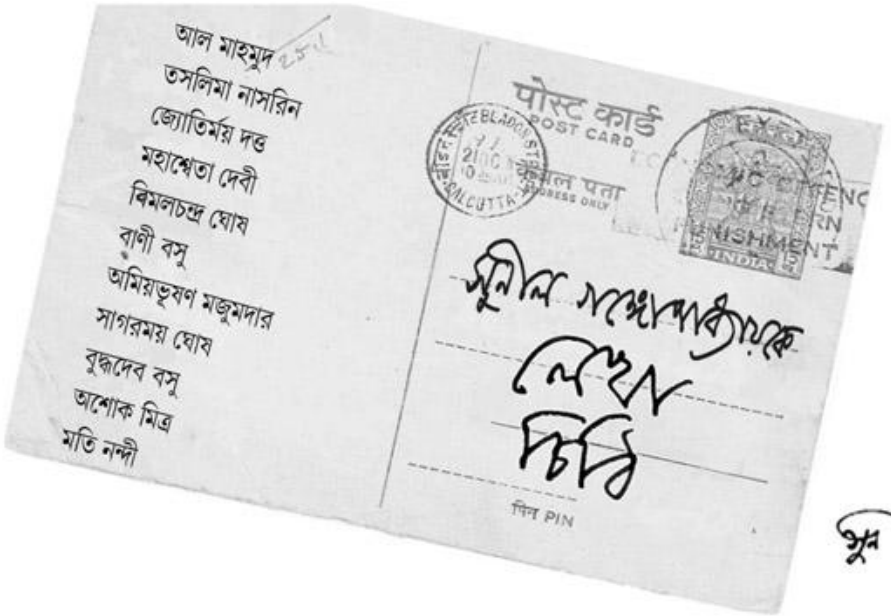

সংকলন ও টীকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা স্বনামখ্যাত বিভিন্ন গুণীজনের চিঠি এখানে কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে।

এই সংখ্যায় **অষ্টম ও শেষ পর্ব**।

সদ্য প্রকাশিত বই থেকে চিঠিগুলি পুনঃপ্রকাশের সানন্দ সম্মতি জানিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই পত্রলেখকদের উদ্দেশেও। সব শেষে প্রকাশক গৌতম সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ। তাঁর উদ্যোগ ছাড়া একসঙ্গে এত চিঠি হয়তো দেখাই যেত না।

—সম্পাদক

আল মাহমুদের চিঠি

আল মাহমুদ
উপ-পরিচালক
প্রকাশনা ও গবেষণা বিভাগ

প্রিয়বরেষু

আমার সালাম জানবেন। শুনলাম কৃত্তিবাস বন্ধ হয়ে গেছে। আঘাত পেয়েছি। কেন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও সবসময় ব্যক্তিগত ধান্ধাবাজি ও আলসেমির কারণে আপনার সাথে পত্রালাপ ইত্যাদি চালিয়ে যেতে পারিনি তবুও 'কৃত্তিবাস' মাঝেমধ্যে পেলে আপনার সান্নিধ্য অনুভব করেছি। চেষ্টাচরিত্র করে আরও কয়েক বছর ধরে রাখা যেত না? ভেবেছিলাম আপনার কথামত এবার কৃত্তিবাসে কবিতা পাঠাবো, একগুচ্ছ কবিতা। এর মধ্যে এই দুঃসংবাদ। শেষে ভাবলাম, পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে যখন আর কেউ সম্পাদকের কাছে পত্রাদি লেখে না তখন আমি বরং আপনার কাছে চিঠি লিখি। এবার কলকাতা থেকে এসে সবসময় মনের মধ্যে ছিলো কৃত্তিবাসে কিছু লেখা পাঠাতে হবে। কিন্তু মনের মতো কিছু লেখা হচ্ছিল না। আর এখন যখন হাতে কয়েকটি কবিতা জমে উঠেছে তখন কিনা কাগজটাই উঠে গেল। আসার সময় মায়াবী পর্দার একটি কপি আপনাকে দিয়ে আসতে পেরেছিলাম এটাই সান্ত্বনা। আপনি অবশ্য বলেছিলেন যে আনন্দবাজারে লিখবেন। হয়ত লেখা হয়নি। আপনি একটি চিঠি লিখে আমাকে জানাতে পারেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। যদি 'আল মাহমুদের কবিতা'র কোনো সংস্করণ বিকাশবাবু বের করতে চান তবে শেষ বইয়ের কবিতাগুলো আপনি জুড়ে দিলে ভালো হয়। বিকাশবাবুর কাছে কোনো বই নেই, কাজটা দয়া করে আপনাকেই করতে হবে। সোনালি কাবিনের অনেক কবিতাই সংগ্রহটিতে তখন নেয়া যায়নি এবার তা ঢুকিয়ে দিতে হবে। অবশ্য বিকাশবাবু আমার বইয়ের ব্যাপারে আর তেমন আগ্রহী কিনা ঠিক জানি না তবে আমাকে ত বলেছিলেন বইটার আরও একটা সংস্করণ করতে চান।

গল্প লেখা-টেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আপনি বলেছিলেন 'পানকৌড়ির রক্ত' খুব ভালো লেখা। আপনার কথার ওপর এমন ভরসা রেখেছি যে আরও কয়েকখানা গল্পের বই করতে সাধ জেগেছে।

'দেশ' কিছুদিন ধরে ঢাকায় আসছে না। কি ব্যাপার কিছু জানি না। তবুও দেশে লেখা পাঠাতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন। সাগরদা অবশ্য আমাকে অগ্রিম বলে রেখেছেন। এবার কলকাতায় গিয়ে কারো সাথে তেমন যোগাযোগ ও মেলামেশা করতে পারিনি। দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে গেলে এমনি হয়। এরপর যখন আবার আসবো তখন শুধু বেড়াবো। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গা আমার দেখার খুব ইচ্ছে কিন্তু ঢাকা থেকে কিছুদিনের জন্য ছাড়া পাওয়া বড়ো মুস্কিল। এখন অবশ্য

মোটামুটি ভালো আছি। অনটনের মধ্যে নেই। পাশপোর্টটাও আছে।

আপনাকে এবং বৌদিকে কোনো একটা আসর-অনুষ্ঠানের সুযোগে যদি আনা যেত বড়ো ভালো হতো। কিন্তু তেমন সুবিধা আপাতত দেখছি না।

কবিতা নিয়েও খুব ভাবছি। খুব সরলতামিশ্রিত কিছু গদ্যকবিতা লিখতে চাইছি। একটি দু'টি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয় পারবো। এবার একটু ধ্যানস্থ হয়ে লিখতে চাচ্ছি। তবে গদ্যছন্দ 'তরুণদের' যে অধিকার দেয়, আমার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর তা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা আমার কাছে অনুতাপের। তরুণতমরা, কি ঢাকার কি কলকাতার—ছন্দটাও ভালো করে শিখতে আগ্রহী নয়। শামসুর রাহমান মনে হচ্ছে অবস্থাটা টের পেয়ে সনেট-আঙ্গিকের মধ্যে ফিরে গেলেন। কিন্তু আমিই বেশী সংক্রামক।

'পানকৌড়ির রক্ত' বইটা কলকাতা থেকে প্রকাশ করতে পারলে খুব ভালো হতো। এ ব্যাপারে বেঙ্গল পাবলিশার্সের ময়ূখের সাথে আলাপ করে এসেছিলাম। তারপর আর কিছু জানি না। কিছু একটা সুরাহা করা যায় কিনা আপনি যদি দেখতেন। এভাবে আপনাকে লেখা ঠিক কিনা জানি না, তবে মনের মধ্যে সাহস পাই বলেই লিখলাম। বিশেষ আর কি, বৌদিকে আমার সালাম বলবেন।

ইতি

14.6.78 **আল মাহমুদ**

তসলিমা নাসরিনের চিঠি

TASLIMA NASRIN
199/2 Shantibag
Dhaka-1217, Bangladesh
Phone: 419044

সুনীলদা,

'আজকাল'এ বই পড়া সম্পর্কে আপনার অল্প কিছু মতামত আমাকে নাড়া দিল খুব।

আমার অতিতুচ্ছ কবিতা আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমি অপ্রতিভ হলাম, মুগ্ধও হলাম।

খুব ইচ্ছে ছিল কলকাতার বইমেলায় যাব, আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আড্ডা হবে। তা আর হল কই। সামান্য একজন মানুষ আমি, আর আমাকে নিয়ে সরকারের কী ভয়! পাসপোর্ট যারা আটকে রেখেছে, পুলিশের বিশেষ শাখা, তাদের ওপর আমার বই পড়বার নির্দেশ এসেছে। তারা বই পড়ছে এবং লাল কালির দাগ দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'চাকরি তো ছাড়লাম, এখন আর সরকারি লোক নই, সাধারণ নাগরিক, পাসপোর্ট দিয়ে দিন।' ওরা বলল 'সরকার যেদিন ইচ্ছে করবে আপনাকে পাসপোর্ট দিতে, সেদিন পাবেন, তার আগে নয়।' সরকার যে কবে এই ইচ্ছে করবে জানি না।

আপনি ভাল আছেন নিশ্চয়। স্বাতীদির জন্য শ্রদ্ধা জানাই। আর আপনার জন্য, সাহস হয় না বলি, যে, সবটুকু শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

স্নেহধন্য
তসলিমা
২৪.২.৯৩

• • •

ক'টা দিন আপনার কাছাকাছি থাকবার সৌভাগ্য হল। আপনি চলে গেলে এই করা উচিত ছিল ওই করা উচিত হয়নি ইত্যাদি নিয়ে মন বড় বিষণ্ণ ছিল।

সুনীলদা,

ক'টা দিন আপনার কাছাকাছি থাকবার সৌভাগ্য হল। আপনি চলে গেলে এই করা উচিত ছিল ওই করা উচিত হয়নি ইত্যাদি নিয়ে মন বড় বিষণ্ণ ছিল। সময় পেলে ঘন সবুজের দিকে যাওয়া যেত, স্মৃতির দিকে, সুন্দর ও সারল্যের দিকে। মাঝে মাঝে নাগরিক ধোঁয়া আর জট ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে করে দূরে। কিছুই করা তো হল না, মনে মনে ইচ্ছে ছিল যত। ঘুরে ফিরে দুর্যোগ ও দুর্ভাবনার কথাই হল, স্বপ্নের নয়, সৌহার্দ্যের নয়।

যে আমি আলপথ মানি না, কাঁটাতার মানি না, তাকেই কিনা দেশবন্দী করা হচ্ছে। আমেরিকার পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেছে আমি আসছি। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ পাচ্ছি। জানিনা কবে যেতে পারব বা আদৌ পারব কি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ আমাকে পাসপোর্ট ফেরত দেবার দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। পক্ষে তারাই দেখেছি দাঁড়ায় যাদের সঙ্গে আমার পরিচয়ই নেই। উচিত জবাব বইটির বিপক্ষে পত্রিকায় দেখলাম আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা মামলা করেছে। পাঠকের ভালবাসাই বোধহয় আমার সবচেয়ে বড় শক্তি, শেষ পর্যন্ত।

ইচ্ছে ছিল, আপনার কাছে উপন্যাস লেখা শিখব। তা আর সম্ভব হল কই। যা লিখছি তা আদৌ কিছু হচ্ছে কি না জানি না। লেখাটি যদি এ মাসে না দিয়ে সামনের মাসে দিই সাগরদা[১] কি রাগ করবেন?

ব্যাটারি একটিই পাঠালাম। প্রয়োজনে আরও পাঠাবো। আপনার সুখ ও সুস্থতা কামনা করি।

তসলিমা
১৯.৪.৯৩

১ সাগরময় ঘোষ

জ্যোতির্ময় দত্তর চিঠি

West Branch
Iowa 52358
USA

সুনীল

নানান সূত্রে সংবাদ পেয়েছিলাম বটে যে অবশেষে আপনিও বিবাহ নামক আবর্তে ঝাঁপ দিচ্ছেন। কেউ প্রেমে পড়েছে এমন রোমাঞ্চকর সংবাদ হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তবু আপনার জবানিতে জানতে পেরে আরো যেন ভালো লাগছে। আপনি লিখেছিলেন "স্বাতী-নাম্নী একটি ছোটো-খাটো শান্ত বালিকা"... শান্ত? তাঁর মতো দুঃসাহসিকা আর দ্বিতীয়

আমার জানা নেই। তাঁকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাবেন।

মীনাক্ষী স্বাতীর জন্য গতকাল একটি ছাতা জাহাজডাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি বারংবার বারণ করলাম, বললাম এই উপহারের ইঙ্গিত স্বাতী মোটেই সুনজরে দেখবেন না কিন্তু মীনাক্ষীকে তো জানেন। তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে বিচলিত হ'তে একবারই শুধু দেখেছি; বছর দুয়েক আগে গড়িয়াহাটের ফুটপাথের এক দোকান থেকে আমার জন্য এক লাল রঙের অন্তর্বাস তিনি কিনবেন বলে শাসাচ্ছিলেন এমন সময় এক সহৃদয় ষাঁড় আমার সাহায্যে উপস্থিত, মুহূর্তের মধ্যে দোকানি ও খদ্দেরদের দল, কর্জ্জপ্রার্থীর আগমনে উপযুক্ত বন্ধুর ন্যায়, সটকে পড়লেন, মীনাক্ষী প্রায় একছুটে ২০২-এ উপস্থিত।

এই ঘটনাটি থেকে আপনি বিবাহিত জীবনের দৈনন্দিন সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব, সংকট, ইত্যাদি আঁচ করতে পারবেন; আপনার নিজের অন্তর্বাস, টুথপেস্ট, চপ্পল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মতামতের আর দাম থাকবে না। মদ ও সিগারেট বিষয়ে আপনি সাবধান; প্রেমিকা যখন স্ত্রীরূপ ধারণ করেন তখন তাঁরা স্বামী সংস্কারের প্রথম পর্যায় হিসেবে এই দুই রম্যবস্তু সেবন নিষিদ্ধ করেন। ফলে, প্রত্যেক স্বামী যে-কোনো খুনি-ডাকাত-চোর-বাটপাড়ের মতো এক গুপ্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য হন।

কিন্তু স্বামী, বিবাহের ফলে, কেবল যে স্বাধীনতা হারান তাই নয়, লেখক স্বামী একটি ভক্ত পাঠিকাও হারান। আগে যিনি আপনার কবিতা পড়তেন, এখন তিনি পড়বেন আপনার চিঠি, মদের বিল, রেস্তোরাঁর রসিদ। এবং আগে যদি তিনি আপনার শিল্পের তারিফ ক'রে থাকতেন, আপনার সূক্ষ্মতার, আপনার বক্রোক্তির, আপনার অনুক্ত কথার ব্যঞ্জনার, এখনো তিনি করবেন, কিন্তু হায়, এই প্রশংসা আপনাকে দেবে না আনন্দ। "কী আশ্চর্য, এতোদিন তুমি বেমালুম চেপে গেছো, সতীশের কাছে তোমার এতো ধার! তুমি একবার শরৎ-এর আড্ডায় গিয়েছিলে! অথচ কেমন সরল ভাবে বললে মামাবাবুকে হাসপাতালে দেখতে যাচ্ছো? আবার তুমি বইয়ের পেছনে মদের বোতল লুকিয়ে রেখেছিলে!"

কেন যে মানুষ বিয়ে করে আমি ভেবে পাই না। কোনো যুক্তিও বার করতে পারি নি এই প্রাচীন ব্যক্তিবিরোধী শৃঙ্খলরূপ প্রতিষ্ঠানের। এটা একটা ঘোর নেশা, এক দীর্ঘ মোহ, মদ কি গাঁজার প্রতি আসক্তির চাইতেও ভয়াবহ কারণ এটা কাটানো যায় না। এই একটি মাত্র মানুষ যে কখনো আপনার মূক শ্রোতা, কখনো তর্জনকারিণী, কখনো মাতা, কখনো বা কন্যা, কখনো লাগাম, কখনো চাবুক, এই আশ্চর্য দেবী

খুব ভাল থেকো তিনজন। বড় আনন্দিতও হয়েছি এবং তোমাকে বুড়ো কে করে? চাষারা, আদিবাসীরা, বুড়ো হয়েও (বয়স) হয় না।

যার মুখ মাত্র চারটি কি দশটি নয়, হাত লক্ষেরও অধিক, এর সঙ্গে আপনি এক ঘরে বাস করেন ভাবতে গায়ে কাঁটা দেওয়া উচিত কিন্তু বেশ লাগে। বিয়ের বিরুদ্ধে এর চেয়ে সাংঘাতিক যুক্তি আর হয়তো কিছু নেই যা দৈব, অলৌকিক, আসুরিক, এমন কি তাকেও সহনীয়, গার্হস্থ্য, দৈনন্দিন সুখে পরিণত করে। ক্রমে আপনি তাঁর প্রতি এমন নির্ভর হয়ে পড়েন যে এমনকি কোন পাঞ্জাবিটা পরবেন তাও নিজে ঠিক করতে পারেন না, আর এই আফিম এমনই সাংঘাতিক যে অন্য নেশায় মুক্তির ইচ্ছে অন্তত থাকে, এখানে বরং অধিক থেকে অধিকতর পরাধীনতাই কাম্য মনে হয়। আপনি পরে বলতে পারবেন না যে আমি আপনাকে সাবধান করে দিই নি। দশ বছরের অভিজ্ঞতা আমার, আমার কথা শুনলে ভালো করতেন। **জ্যোতি।**

• • •

সুনীল,

আপনার অটুট নৈঃশব্দের কেল্লার উপর আমি চড়াও হয়েছি; যতোক্ষণ না দুর্গের দরজা খুলবে আমি আক্রমণ চালিয়ে যাবো।

আমার তৃতীয় নাটকটি প্রস্তুত। এর তুলনায় দ্বিতীয়টিকে বাসি, জোলো, নিরক্ত এবং গদ্যঘেঁষা মনে হচ্ছে। সুতরাং ওটি আপনি "জলসা" কি "দেশে" পার ক'রে দিন। যদি "জলসা" উৎসাহ না প্রকাশ করে ধ'রে রাখবেন; সাগরবাবু[১] শুনছি এদিকে আসছেন; তাঁকে আমিই নয় বাজিয়ে দেখবো। যাই হোক, কৃত্তিবাসে ওটা ছাপাবেন না; এবং ওর কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংশোধন আমি না-করার আগে কাউকেই ছাপাবার সম্মতি দেবেন না।

তৃতীয় নাটকটির নাম "আমরা সবাই যাবো কুল পাড়তে: একটি প্রহসন।" চার দৃশ্য। একটি গান আছে। বিষয়? বিষয় আর নতুন কি, সব কবিতা কি নাটকেরই যে একটি মাত্র বিষয় আছে— বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ শৈশব থেকে, ঈশ্বর থেকে, যে রাস্তাটা নিইনি কিন্তু নিতে পারতাম তার থেকে। আমার বিশ্বাস মঞ্চস্থ হ'লে দর্শকেরা উপভোগ করবেন।

এই আমার প্রথম রচনা যা ইংরিজিতে অনূদিত হলে আমি খুব অখুশি হবো না। এদেশে অভিনয়ের সম্ভাবনা খোঁজ ক'রে দেখতে হবে।

কি, নাটকটি দেখতে চান? তাহলে চিঠির জবাব দিন।

আপনাদের দুজনকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই; আপনাদের কিছু এসে-যায় না হয়তো, কিন্তু আপনাদের কথা ভাবতে আমাদের খুব ভালো লাগে।

জ্যোতি

---

১ সাগরময় ঘোষ

মহাশ্বেতা দেবীর চিঠি

২৪।৬।৮৩

সুনীল,

অভিনন্দন / শুভেচ্ছা / আনন্দ ইত্যাদি।[১]

নির্মলের অতর্কিত Cerebral Stroke ২৩শে মে। তারপর তার স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু due to severe brain haemorrhage caused by massive blood pressure ৭ই জুন,— ছেলে মেয়ে। নির্মল— এই তো! অবশ্য মৃত্যু কেন প্রত্যাশিত থাকবে? ফলে আমি বিশ বাঁও জলের নীচে। এবার লেখাটেখা বন্ধ। আমার প্রিয়জনরা, যাদের জন্যে বড় মনোযোগ

থাকত, সবাই চিন্তামুক্ত করে দিচ্ছে।

খুব ভাল থেকো তিনজন। বড় আনন্দিতও হয়েছি এবং তোমাকে বুড়ো কে করে? চাষারা, আদিবাসীরা, বুড়ো হয়েও (বয়স) হয় না।

মহাশ্বেতা

১ বঙ্কিম পুরস্কার পাওয়ার উপলক্ষ্যে।

• • •

২০।৮।৮৪

সুনীল,

হে ব্যস্ততম (?) মহান লেখক!

খোকনদের বালিগঞ্জ ও স্টেশন রোডের পুজো (আমার পাড়ার)। souvenir-এ ওকে বসিয়ে তোমার আশ্চর্য গদ্যে এক পাতা শুভেচ্ছা, অথবা ছোট্ট কোনো পুরনো লেখা (not necessarily গল্প) for reprint. মোট কথা, ওকে নিরাশ কোর না। আমাদের prestige issue, তোমার লেখা চাইই চাই।

সেই সময় বারবার পড়ি। বনজ্যোৎস্না ও বিন্দু ব্যাপারটাই মনে থাকে বেশী। নতুন বই (বড়/ছোট) থাকলে দিও। স্বাতী যদি পুরনো জামাকাপড় দিত! তুমিও আস না, আমিও যাই না, এগুলো কি হচ্ছে?

মহাশ্বেতা

বিমলচন্দ্র ঘোষের চিঠি

৬.৯.১৯৬৭
শনিবার

প্রীতিভাজনেষু

আপনার থেকে চব্বিশ বছর আগে পৃথিবীতে এলেও, বয়সের মামুলী দাবি নিয়ে আপনার ওপর মাতব্বরী করার জন্যে এ চিঠি লিখছি না। আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই কিন্তু আপনার কিছু কিছু কবিতা আমি পড়েছি এবং বলাই বাহুল্য, খুশি হয়েছি। সব চেয়ে খুশি হয়েছি আপনি (গত বছরেই বোধ হয় : দেশে) আপনার প্রথম উপন্যাসে[১] অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন দেখে। উপন্যাসটির মধ্যে অহেতুক ইচ্ছাকৃত নোংরামী সৃষ্টি করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ইদানীং বহুকাল-থেকে-ছাপার-অক্ষরে-নাম-বেরুনো-কোনো-কোনো প্রবীণ ঔপন্যাসিক যে পাঁক-ঘাঁটার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি সেই ঘৃণিত অশ্রদ্ধেয় লোভ আপনি অত্যন্ত সজাগ সতর্কতার সঙ্গে আপনার উপন্যাসখানির মধ্যে সংবরণ করেছিলেন বলে আপনাকে আমি মনে মনে আশীর্বাদ করেছি। শুধু তাই নয়, উপন্যাসখানির মধ্যে জীবনের বিষাদ ও দীপ্তি, অতিলোভ ও সংযম, সজীব আকাঙ্ক্ষা ও নির্জীব বৈমনস্য পাশাপাশি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমি অনেকের কাছেই আপনার এই উপন্যাসখানির প্রশংসা করেছি।

কিন্তু আজ আপনি আমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলেছেন। 'এষা'[২] একজন উচ্চাভিলাষহীন ইনভ্যালিড্ ও ভয়ঙ্করতম নির্মম প্রকৃতির সম্পাদকের পত্রিকা। এ পত্রিকায় কাঁচা হাতের লেখা নির্দোষ কবিতা হয়তো কিছু কিছু ছাপা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে শুধু একটি দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, যেন সেগুলির মধ্যে কোনো অশোভন উক্তি কিম্বা কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ না থাকে। কথাটা শুনে যেন আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে উদ্দেশ করে এ সব কথা বলছি না। এই নীতিই আমাকে অনুসরণ কোরে যেতে হবে যতদিন 'এষা' টেঁকে।

আপনি আমার মেজছেলে দীপঙ্করকে যে কবিতাটি 'এষা' শারদীয়া সংখ্যার জন্যে দিয়েছেন, কবিতাটি পড়ে আমি হো হো করে হেসেছি। বাড়ির সবাই হেসেছে। সকলেই তারিফ করেছে। এইখানেই আপনার কবিতাটির সাফল্য। মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেবার শক্তি একালের বেশির ভাগ কবিতারই নেই। উচ্চাঙ্গ রস না থাকলেও আপনার এই কবিতাটি পাঠকের মনকে নাড়া দেবে। তথাপি, এ কবিতা আমি প্রকাশ করতে পারবো না। পারবো না, দুটি কারণে। প্রথম কারণটি অসার ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। 'হিসি করি' কথাটা আমার কাছে শুধু অশ্লীল নয়, বড় লঘু, বড় ছেলেমানুষীর। এর জায়গায় যদি লিখতেন "ধর্মতলায় দিন দুপুরে ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াই কিম্বা দাঁড়িয়ে থাকি!" তা'হলেও খুব আপত্তিকর হতো না। আপত্তির দ্বিতীয় কারণটি হ'লো আপনার কবিতার শেষ লাইনটি। যার কবিতা আপনাদের 'আনন্দবাজার দেশে' প্রায়ই বেরোয়, তাকে সরাসরি ঠাট্টা করা হয়েছে। কবিতাটি[৩] 'এষা'য় ছাপলে সুভাষ[৪] আমার ওপর ক্ষেপে যাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এই কবিতাটি পাঠিয়ে আমাকে কী মুস্কিলে ফেলেছেন? আমার বিশেষ অনুরোধ, যদি আমার বক্তব্যে ক্ষুব্ধ না হন, তাহলে তাড়াতাড়ি অন্য একটি কবিতা পাঠিয়ে দিন। সময় একেবারে নেই, আগামী সোম মঙ্গলবার কবিতাটি পেলে ভালো হয়।

আমার অন্তহীন ভালবাসা নিন। ইতি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-কে
শুভাকাঙ্ক্ষী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১ 'আত্মপ্রকাশ'।
২ বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত পত্রিকা
৩ 'ইচ্ছে' নামের সেই কবিতাটি আছে 'বন্দী জেগে আছো' বইতে (১৩৭৫)। লাইনটি অবশ্য পালটাইনি। পরের চিঠিটি দ্রষ্টব্য।
৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

• • •

২১.৯.১৯৬৭
বৃহস্পতিবার

প্রীতিভাজনেষু

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার যুক্তি মেনে নিলুম এবং কবিতাটি প্রেসে কম্পোজ করতে পাঠালুম। আমরা সেকেলে মানুষ। স্বভাবতই কতকগুলি শব্দ আমাদের কানে বাজে। তাই আপত্তি জানিয়েছিলুম। আপনারা নবীন কালের প্রতিনিধি। আপনাদের শ্রুতিসিদ্ধির সঙ্গে অনেক সময় আমাদের মিল হয় না। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমার কিছুটা মতভেদ থাকবেই। আমার আপত্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অশ্লীলতার শুদ্ধত্ব ও লঘুত্ব নিয়ে। তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখা সংক্ষিপ্ত পত্রে অত কথা বলার উপায় নেই। তাছাড়া লিখেই বা কি লাভ! আপনি লিখেছেন: "পিতৃপ্রতিম কারুর কথা শুনেও আমি সাহিত্য ব্যাপারে নিজের বিচার ত্যাগ করতে পারবো

কিন্তু আপনাদের 'দেশে'র অফিসে অনেক গুণী-মানী-স্রষ্টা বসে থাকেন। সেখানে শুধু আপনার লেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে স্বভাবতঃই আমার অস্বস্তি হয়।

না।" একথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। শিল্পীর এই আত্মপ্রত্যয়কে আমি শ্রদ্ধা করি।

আপনার কবিতার শেষ পংক্তিতে লিখেছেন:

"মনুমেন্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি
আমার কিছু ভাল্লাগে না।"

আমি লিখেছিলুম, এই পংক্তিটি পড়লে সুভাষ ক্ষেপে যেতে পারে। আপনি লিখেছেন, আমার "রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে নিশ্চিত" এবং কেন আমার এ ধারণা হ'ল—তা আপনার "বুদ্ধির অতীত"। এ ব্যাপারে আমার আপত্তি কেন জানিয়েছিলুম সে কথাটি আর একটু বিশদ করে বললেই বুঝতে পারবেন, আমার 'ভ্রম' হয়নি। শ্রোতাদের কয়েকজনের মুখ থেকে শুনেছিলুম মনুমেন্টের সামনের ময়দানে 'ভিয়েতনাম দিবস' সংক্রান্ত জনসভায় সুভাষ একটি স্বরচিত কবিতা পড়েছিল। কবিতাটির প্রথম তিনটি লাইন নিম্নরূপ:

"আমার কিছু ভালো লাগে না
আমার কিছু ভালো লাগে না"...ইত্যাদি।

সুতরাং আমার মনে হয়েছিল, এই পংক্তিটির উল্লেখ করে আপনি হয়তো হাল্কা রসিকতা করেছেন। আমার এ ধারণার আরো একটি কারণ উগ্রবামরা সুভাষকে বিদ্রূপ করেছিল। 'ভাল্লাগে না' কথাটা হামেশাই উৎপল-সরোজ-সুশীতল-অমিয়[১] প্রভৃতি ব্যঙ্গের সুরে বলতে থাকে। আমি উগ্রবামদের এই নিয়ে কিছু কড়া কথা বলেছিলুম। যখন এঁদের দলের কেউ কেউ আমার কাছে এসে ঐধরনের সুভাষ-বিরোধী মন্তব্য করে। বলাই বাহুল্য আমি নিজেও একজন সুভাষের কবিতার অনুরাগী।

উপরোক্ত কারণে আপনার কবিতার শেষ পংক্তিটিকে আমি ভুল বুঝেছিলুম। যাই হোক, কবিতাটি প্রকাশ করে দেখি কে কি বলে। সুভাষ নিজেও আপনার কবিতাটির এই পংক্তিটিকে কিভাবে গ্রহণ করে সেটাও বোঝা যাবে।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন। ইতি

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-কে
বিমলচন্দ্র ঘোষ

১ উৎপল দত্ত, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী প্রমুখ বামপন্থী বিশিষ্টজনেরা।

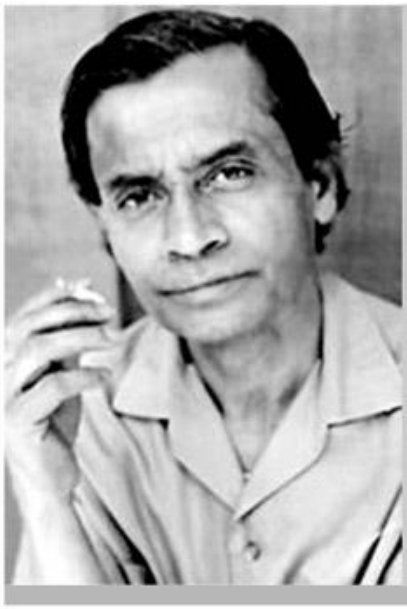

কিন্তু আমাদের বিষয়ে
কেউ জানে না,
জানতে চায়ও না— তাই
যে-কোনো অজ্ঞ, বাচাল,
দায়িত্বহীন ব্যক্তি
"ট্রামে-চাপা-পড়া"
"Jivananda"-র পিঠ
চাপড়ে আত্মপ্রসাদ
অনুভব করতে পারে।

বাণী বসুর চিঠি

শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
দেশ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়েছি। বলা বাহুল্য পেয়ে ভীষণই আনন্দিত হয়েছি। উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে আমার খুব বেশি রকম খুঁতখুঁতুনি আছে, নতুন কিছু যতক্ষণ না করতে পারছি ভালো লাগবে না। এরকম ক্ষেত্রে instinctকে অনুসরণ করা ছাড়া গতি নেই। অনেক রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও যে আমার উপন্যাস আপনাকে, আপনাদের টানতে পেরেছে সেটা আমার পক্ষে খুব একটা স্বস্তির সংবাদ।

আপনার দুটি লেখা পড়েই যে এবার মুগ্ধ হয়েছি, সামান্য বিশ্লেষণসহ সে কথা জানিয়েছিলুম। চিঠিটা কি পান নি? আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী। কিন্তু আপনাদের 'দেশে'র অফিসে অনেক গুণী-মানী-স্রষ্টা বসে থাকেন। সেখানে শুধু আপনার লেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে স্বভাবতঃই আমার অস্বস্তি হয়। তাই কেমন আছেন, কি খবর পর্যন্ত এগোনো যায়। সত্যি কথা বলতে কি নিজে লেখালেখি নিয়ে Serious ভাবনা-চিন্তা করবার পর থেকে বহু লেখকের লেখাই আমার ভালো লাগে। Courage to create, এবং সৃষ্টি-কর্মের নানান সমস্যা কে কিভাবে সমাধান করছেন দেখতে আগ্রহ বোধ করি। ফলে কারুর dialogue, কারুর humour, কারুর narration— নানাভাবে আমাকে ভাবায়। কোনও লেখাই ঠিক ফেলতে পারি না। এইসব আলোচনার জন্য চিঠির নিভৃতি, চিঠির coffee-house চাই। কাজেই আমি আপনার লেখার ওপর যৎসামান্য ভাবনা যেটুকু পাঠালুম, আপনি তার উত্তর না দিলে 'আলাপ' বেচারা আর জোড় ঝালায় পৌঁছতে পারে না। জানি আপনার অনেক কাজ, বিশেষ ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু তেমনি সাধ্যও আছে পর্যাপ্ত। তাই না? তার ওপর পটভূমি সামলাতে স্বাতী আছেন। (স্বাতীকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন) আমি যদি বৃদ্ধ ও রুগীর সেবা, তাছাড়া সংসার, তাছাড়া কলেজের দৈনন্দিন কাজ এবং social, পত্রিকা ও ক্ষণে ক্ষণে প্রশ্নোত্তর নিয়ে ছাত্রীছাত্রদের আনাগোনা ইত্যাদি সামলে আমার সীমিত সাধ্য সত্ত্বেও— চিঠি লিখে উঠতে পারি, আপনিও নিশ্চয়ই পারবেন। সেটা আমার পক্ষে একটা বিশেষ আনন্দের ঘটনা হয়ে থাকবে।

আপনার 'পাখির মা' গল্পটাও অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। আসল প্রতিপাদ্যর চেয়েও পাখিদের আসা-যাওয়া থাকা দিয়ে যে অলৌকিক আবহ সৃষ্টি করেছেন তার ইন্দ্রজালে ধরা পড়েছি। এই প্রসঙ্গে আপনার 'রাত পাখি' গল্পের ইংরেজি অনুবাদ (Statesman)-টির কথাও বলতে হয়। অসামান্য। গভীরভাবে ধ্বনিমনস্ক কবির হাত দিয়েই এমন গল্প বেরোনো সম্ভব। অনুবাদও হয়েছে অসম্ভব ভালো।

প্রীতি নমস্কার শুভেচ্ছা এবং পত্রালাপের আশা জানিয়ে চিঠি শেষ করছি।

বাণী বসু

অমিয়ভূষণ মজুমদারের চিঠি

Coochbehar
22.11.76

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আপনার অনূদিত রোমিও জুলিয়েট-এর অপেক্ষায় থাকতে পারবো জেনে ভবিষ্যৎকে হাল্কা-পাখার মনে হচ্ছে। খুশী খুশী লাগছে।

ফ্রাই সম্বন্ধে আমরা, আবার দেখা হলে, আবার আলোচনা করবো। আপনার ভালো লেগেছে জেনে বেশ ভালো লাগলো। এরকম ভাবেই সেতুবন্ধন হয়ে থাকে। কলকাতায় (বাংলাদেশের বলা যায়) একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক আছেন যাঁর সঙ্গে কথায় এবং চিঠিতে অন্তত একবার Browning-এর কথা উঠে পড়ে। এটা তাঁর এবং আমার মনের সংযোগসেতু।

কৃত্তিবাসে লিখবার জন্য আপনার আমন্ত্রণে আন্তরিক আগ্রহ অনুভব করছি। ছোটগল্প বা আলোচনা (যেমন ধরুন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস সম্বন্ধেই; হায়! আমরা কত কিছু না বলেছি এর সম্বন্ধে, আর আমাদের বাংলা অনার্সের ছাত্রেরা এবং এখন পাঠকরা কতই না মুখস্থ করেছে)— যাই এর পরে লিখব আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

একান্ত প্রীতি ও কল্যাণবাসনা জানবেন। ইতি

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সাগরময় ঘোষের চিঠি

দেশ
৩.৫.৮৮

সুনীল,

তোমার চিঠি পড়ে মনে বড়ো কষ্ট পেলাম। আমার আচরণে তুমি যে এতটা মর্মাহত হয়েছ আমি তা বুঝতে পারিনি। দোষ সম্পূর্ণ আমার আমি তা অকপটে স্বীকার করছি। আজকাল আমি বড় নিঃসঙ্গ মনপ্রাণ খুলে কারো সঙ্গে কথা বলতেও পারি না। সেই কারণেই মনের মধ্যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে, নিজেকে ছোটো করে ফেলেছি। তোমার এই চিঠি মস্ত বড় উপকার করল আমার এই ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। মন থেকে সব গ্লানি দূর করে ফেলো।

আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে, আর বেশিদিন নেই। যে ক'টা দিন আছি অন্তত তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে যেন চিড় না ধরে। তোমার চিত্তের ঔদার্য দিয়ে আমাকে ক্ষমা করে দিও। ইতি—**সাগরদা**।

খেলার প্রতিভা বইটির সঙ্গে তিনি আমাকে একটি চিঠি লেখেন। ...সেই চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তাঁর উক্তি আমাকেও বিশেষভাবে অভিভূত করে।

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি

ব্লুমিংটন, ইলিনয়
১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫

কল্যাণীয়েষু,

সুনীল, আজ আমার হাতে "City Lights Journal" পৌঁছলো। তাতে অ্যালেন গিন্সবার্গ বাংলা সাহিত্য বিষয়ে যে-মন্তব্য লিখেছে[১] তা যুগপৎ হাস্যকর ও গ্লানিজনক— তোমাদের সঙ্গে অতদিন কাটিয়েও সে যে ও রকম লিখতে পারলো তাতে সন্দেহ হয় বাংলা দেশ বা সাহিত্য বিষয়ে ওর সত্যিকার কোনো শ্রদ্ধা বা উৎসাহ নেই। রবীন্দ্রনাথ "big bore" ও "fire-side poet"এ-রকম পাপ-বাক্য উচ্চারণ করার আগে অ্যালেনকেও ভাবতে হ'তো, যদি তার স্বদেশে প্রতিবাদের কোনো সম্ভাবনা থাকতো! কিন্তু আমাদের বিষয়ে কেউ জানে না, জানতে চায়ও না— তাই যে-কোনো অজ্ঞ, বাচাল, দায়িত্বহীন ব্যক্তি "ট্রামে-চাপা-পড়া" "Jivananda"-র পিঠ চাপড়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারে। এবং তোমরাও তার কাছে উল্লেখযোগ্য একটু ভিন্ন কারণে, ভারতবর্ষের মাটিতে প্রসূত গঞ্জিকা সেবন করতে অ্যালেন তোমাদের শিখিয়েছে, সেটা তার পক্ষে গৌরবের হ'তে পারে, কিন্তু তোমরা তাড়ি খেয়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বেশ্যালয়ে সারা রাত পড়ে থাকো, এটা তার অথবা তোমাদের পক্ষে এমন প্রচারযোগ্য কথা, আমি তা ভেবে পেলাম না। তোমাদের কবিতা যদি ভালো হয়, তার প্রমাণ কি এইগুলো?

অ্যালেনকেও আমিও ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসি, সেইজন্যে আমাকে নীরবে থাকতে হয় সে যখন বিলিয়ম কার্লস বিলিয়মসকে মহাকবি বলে ঘোষণা করে— কিন্তু সে যদি পোল ক্লোদেলের মতো গ্যেটেকে "গর্দভ" বা রবীন্দ্রনাথকে "barbarous Asiatic" বলতে চায়, তাহলে অন্তত তাঁদের রচনার সঙ্গে তার পরিচয় থাকা দরকার, এই সহজ কথাটুকুও কি তার জানা নেই? সুনীল, সাবধানে থেকো, কবি হওয়া সহজ নয়, "কাফে-র করতালি"তে তলিয়ে যেয়ো না।

অ্যালেন যে-সব "অনুবাদ" করেছে তার মধ্যে তোমার দুটোই আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো। ঐ দুটো থেকেই একটা আমার অ্যান্থলজিতে নেবো, খুব সম্ভব আটাশ বছরের কবিতাটাই[২]। অনুবাদক হিসেবে যৌথভাবে তোমার ও অ্যালেনের নাম দিতে চাই— সেটাই ঠিক হবে কিনা জানিয়ো। অ্যালেন যেহেতু এক বর্ণ বাংলা জানে না, তাই শুধু তার নাম দেয়া অসম্ভব— তুমি নিশ্চয়ই প্রথমে একটা খসড়া করে দিয়েছিলে? অ্যালেন লিখেছে তোমরা "funny english"-এ অনুবাদ করেছিলে— ভেবে দ্যাখেনি, সে বাংলা লেখার চেষ্টা করলে সেটা আরো কত funny শোনাতো।

এই চিঠিটা জ্যোতিকে দেখিয়ো। তাকে আর তোমার কবিতার অনুবাদ করতে হবে না— তারাপদর, আর সম্ভব হ'লে শক্তির যেন পাঠায়। আমার বই তাহলেই শেষ হয়।

"কৃত্তিবাস" কি নিয়মিত বেরোচ্ছে? তুমি কেমন আছো?

বু. ব.

---

১ City Lights Journal, no.2, San Francisco, 1984। শরৎ শংকর মলয় আর আমার কবিতা (অনুবাদ) ছাপবার ভূমিকা হিসেবে অ্যালেনের তিনপৃষ্ঠা লেখা 'A Few Bengali Poets'।

২ 'আটাশ বছরে' নামের কবিতা, 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি'-বইয়ের।

• • •

হনলুলু, হাওয়াই
২৫ জুলাই, ১৯৬৫

কল্যাণীয়েষু,

সুনীল, তুমি যেদিন এ-চিঠি পাবে আমি তার দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতা পৌঁছবো, তবু তোমাকে লিখছি এই কথা জানাতে যে আমার সেই চিঠিটা, "কৃত্তিবাসে" ছেপো না। ওটাতে দু-একটা বিষয়ের উল্লেখ আছে যা আমার মতে ঠিক প্রকাশ্য নয় (অন্তত এখনই নয়), তাছাড়া কী প্রসঙ্গে লেখা তা তোমার পাঠকদের কিছুই জানা নেই বলে খাপছাড়া ও অর্থহীন লাগবে— পত্র-লেখকের বা তোমার পত্রিকার প্রতি সুবিচার হবে না। চিঠিটা থাক— আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে অন্য লেখা দেব।[১] নিতান্তই অক্ষমতাবশত তোমাকে বিদেশী খামে লেখা পাঠাতে পারলাম না— কিন্তু ফিরে গিয়ে কয়েকটি পুরোনো ও অসমাপ্ত কবিতা দাঁড় করাবার চেষ্টা করবো, নতুন দু-একটি পরিকল্পনাও আছে। কিন্তু পরিকল্পনার সঙ্গে মূর্তিরচনার ব্যবধান আমার পক্ষে আজকাল এত বৃহৎ যে কথা দিতে ঠিক ভরসা পাই না।— কিন্তু চিঠিটা না-ছাপালে তোমার দাবি থাকবে।

আওয়াতে গিয়ে আমরা তোমার অভাব খুব অনুভব করেছিলাম, কিন্তু মার্গারেট তার উৎসাহ ও বাক্যপ্রবাহের দ্বারা সেটা অনেকটা পুরিয়ে দিয়েছিল। ভালো লাগলো মেয়েটিকে— আশা করি কোনো-এক সময়ে ওকে কলকাতায় দেখতে পাবো। আওয়াতে যাবার আর-একটা ফলাফল এই হয়েছে যে পল এঙ্গেলকে[২] সত্যিকার ভালোবেসেছি।

আজ দিনটা তপ্ত হয়ে উঠেছে এখানে, তার উপর রবিবার— আমার কিছুই করার নেই— "হেলাফেলা সারাবেলা"-র পক্ষে আদর্শ দিন, জানলার বাইরে সামুদ্রিক দৃশ্যও উপস্থিত। উপরন্তু এই শহরে "দুপুরবেলা" নামক একটা ব্যাপারের অস্তিত্ব আছে— যদিও অনুভূতিহীন ইংরেজি ভাষায় তাকে "বিকেল" বলে— স্তব্ধতার ফাঁকে-ফাঁকে পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। অনেক কিছু মনে পড়ছে— "ছিন্নপত্র", হেম বাগচীর "গীতিগুচ্ছ", চীনে কবিতা— আমার মনে সব কিছুই সাহিত্যের স্মৃতি জাগায় সেটা আমার মস্ত দোষ— এইভাবে "জীবনকে"ও হারাই, কবিতাও লেখা হয় না।

ভালো থেকো। **বুদ্ধদেব বসু**

১ সেই অন্য লেখা 'বৃদ্ধ রাজা' (কৃত্তিবাস ২১/১৯৬৫)

২ কবি। আয়ওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রাম-এর প্রবর্তক, পরিচালক।

অশোক মিত্রর চিঠি

17 July 1992

সবিনয় নিবেদন সুনীলবাবু—

কলকাতা থেকে সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকার দরুণ আমি ৩০শে মের দেশ-পত্রিকায় আপনার অনবদ্য রচনাটি সদ্য পড়েছি। এত সমৃদ্ধ, সশ্রদ্ধ, মননশীল, গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বোধ আমি অধুনাতম সমালোচনা সাহিত্যে কোন সমতুল্য লেখায় পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমি কমলবাবুর বহুকালের অনুরাগী, তাঁকে আমি জীবনে যে মুষ্টিমেয় প্রতিভাশীল ব্যক্তি দেখেছি তার মধ্যে বিশিষ্ট জন বলে মনে করি। তাঁর সম্বন্ধে আপনার লেখাটি আমার কাছে রচনার চূড়ান্ত অর্ঘ্য মনে হয়েছে। খেলার প্রতিভা বইটির সঙ্গে তিনি আমাকে একটি চিঠি লেখেন। তখন বহু বছর তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, দিল্লী থাকি। সেই চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তাঁর উক্তি আমাকেও বিশেষভাবে অভিভূত করে।

আপনি আমার বিশেষ অভিনন্দন জানবেন, ইতি। জগদীশ গুপ্ত ও সতীনাথ ভাদুড়ীর উপর লেখাদুটিও একান্ত অনবদ্য, বলা বাহুল্য।

নমস্কার জানবেন, ইতি
বিনীত
অশোক মিত্র

মতি নন্দীর চিঠি

২০.৭
উল্টোরথ

সুনীল,

একি অসম্ভব কথা লিখেছেন। নিয়ত তাড়া করছে—উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।[১] কথা দিয়েছিলে, কথা রাখো, কথা রাখো মুক্তি, পৃথিবীর মুক্তি—এসব কি লিখেছেন। আপনি কি পাগল হলেন না আমি? নার্ভের উপর বড্ড চাপ দিচ্ছে। কান্না আসে। কোথায় সে রমণী?

ভাল লাগছে না লিখতে। ক্লান্তি আসে। এসব কবিতা পড়ার পর কিছু করতে ইচ্ছে করে না। একটা গল্প মাথায় এসেছিল আপনার চিঠি পড়ে—আমার নামে বহু টাকার ইন্সিওর করে মা প্লেনে উঠল গৌহাটি অথবা পাটনার উদ্দেশ্যে। আমার টাকার দরকার। সুন্দরী, মজবুত স্ত্রীলোক আমাকে বিয়ের অপেক্ষায়, টাকা চাই। তখন আমি মায়ের মৃত্যু চাইলুম। প্রশ্ন: অন্যায় করলুম কি? বুড়ি মা তো আজ নয় কাল মরবে, তাহলে আমাকে সুখী করে মরুক না। এরকম চিন্তায় বিবেক কতখানি বিরোধিতা দিতে পারে? এতে কি আমার পতন সূচিত হচ্ছে? একালের মানুষের? আমাদের মৌলবোধ, স্নেহ, প্রেম, করুণা, মমতা (আপনি এর শিকার) এগুলো তো দেখি দিব্যি জ্যান্ত। যদি মরে যেত তাহলে জীবনটা বড়ই একঘেয়ে পানসে হত, যেমন opposition না থাকায় টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্র হয়। তবু তো দেখি সেসব রাষ্ট্র বৈষয়িক উন্নতি করে। এই সময় আমাদের কি উন্নতি ঘটাল? নিঃসঙ্গতাবোধ এবং হ্যাংলামি? অতৃপ্তি এবং বৈরাগ্য? আমার তো মনে হচ্ছে আরও বেশী জ্যান্ত করছে।

আঠারোই ফিরছেন তো, তখন দেখব কি বুঝেছেন এই ক'মাসে। কবিরা অত স্বপ্ন দেখে কেন, বিশেষতঃ জলে ডোবা মানুষের? অভ্যাসটা ভালো নয়। অন্যকিছুর স্বপ্ন দেখুন না—ফিল্ম তোলার। সিনে ক্লাব আপনার লেখা চায়—প্রবন্ধ গোছের। ঠিকানা দিয়েছি।

কলকাতায় অদ্ভুত যেন ষড়যন্ত্র চলছে। সবাই বেশ খাতির করে কথা বলে। অনেককেই যেন ফিরে পাচ্ছি। P.I.B.-তে একটা পরীক্ষা দিয়েছি। চাকরী পেলে বেঁচে যাই। কলকাতায় এখন বৃষ্টি। কি ভীষণ বৃষ্টি। বৃষ্টিতে কফি হাউস থেকে শেয়ালদা সার্কুলার রোড, গ্রে স্ট্রীট হয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরলুম। নীরেনবাবু[২] খুব আপনার কথা বলেন। এবছর আম খেয়েছেন? তারাপদ রায়ের বাড়ী থেকে থালাবাসন ও কাঁসি হারিয়েছে বলে ওর মা শ্যামলকে কথা প্রসঙ্গে জানান। শ্যামল জানায়, দীপক মজুমদারকে সে ভাত খেতে দেখেছে একটা কাঁসিতে। দীপক ও তার স্ত্রী এখন শ্যামলকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কলকাতায় কোন ঘটনা ঘটছে না। সেই একই মেয়েগুলো চৌরঙ্গিতে ঘুরে বেড়ায়। বইয়ের দোকানে জেনের 'ব্যালকনি' নাটকটা পড়তে চাইলুম। দিল না। Seduced & Abandoned দেখলেন?

মতি

১ 'হিমযুগ' নামের কবিতার কথা, বেরিয়েছিল 'কৃত্তিবাস'-এর উনবিংশ সংকলনে (মে ১৯৬৪)।

২ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজ পাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের

কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

মহাজনসঙ্গ

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ১৪ ।

নন্দলাল বসু

গত শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ইস্কুলে যে নবরত্ন সভা বসিয়েছিলেন, তার মধ্যমণি ছিলেন নন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসেবে এসে নন্দলালকে প্রথম দেখে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছিলাম। সাঁওতালদের মতো কুচকুচে কালো গায়ের রং, বেঁটেখাটো চেহারা, খালি পা, খদ্দরের পাজামা কিঞ্চিৎ ওপরের দিকে তোলা, আর গ্রীষ্মকালে আরবি বেদুইনের মতো ছোট্ট তোয়ালে দিয়ে ফেট্টি বাঁধা। আস্তে হাঁটেন, আস্তে কথা বলেন, রোজ বিকেলে চা-চক্রের আসরে যেতেন। কখনও কখনওবা বন্ধু তেজেশচন্দ্র সেনের 'তালধ্বজ' বাড়িতে বিকেলে গল্প করতে যেতেন। পথে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন। হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশে রঙিন ফুল দেখলে দাঁড়িয়ে পড়তেন। কখনওবা খোয়াইয়ের দিকে যেতেন হাঁটতে হাঁটতে। আবার কখনও বড় মেয়ে গৌরী ভঞ্জের বাড়িতে যেতেন কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতে। গায়ে সেই সাদা ফতুয়া আর খাটো সাদা পাজামা বা লুঙ্গি। বৃদ্ধ হয়ে গেলে মহাত্মা গান্ধির ডাণ্ডি মার্চের ভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ কুব্জ হয়ে চলতেন লাঠি হাতে। একবার তাঁর কাছে মৃদু ধমক খেয়েছিলাম রাস্তার পাশে একটি রঙিন ফুল পেড়ে নিয়েছিলাম বলে। আমরা তাঁকে প্রায়ই দেখতাম পুরনো কলাভবনের 'নন্দন' বাড়ির সামনের পোর্টিকোতে বসে ছাত্রদের আঁকা ছবি শুধরে দিচ্ছেন, কখনওবা কারও সঙ্গে শিল্প সম্পর্কে দু-চার কথা বলছেন কিংবা শিষ্য রামকিঙ্কর যখন মূর্তি গড়ছেন বিরাট আকারে, তখন দুপুরের খর রৌদ্রে বসে তা দেখছেন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বা রামকিঙ্কর বেইজ— দুই যোগ্য শিষ্যকে দুই পাশে নিয়ে আলোচনা করছেন শিল্প নিয়ে— অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে আছেন সবসময়। তাঁর অজস্র ছাত্রছাত্রী সারা ভারতে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের অনেকেই এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন অনবরত।

নন্দলাল বসুর অলংকরণ, 'সহজ পাঠ' থেকে

নন্দলাল বসুর কাছে আঁকার পাঠ নিচ্ছেন কলাভবনের ছাত্রী

অটোগ্রাফ দিচ্ছেন অজস্র। কত অসংখ্য লোকের খাতায় তা ছড়িয়ে আছে।

অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল আচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে আলাপ করব ছবি নিয়ে। সাহস হয়নি। ইচ্ছেটা যখন পুরো আকারে দানা বাঁধল, তখন তিনি অসুস্থ। তারপর ১৯৫৬ সালে আমিও শান্তিনিকেতন ছাড়লাম। সেই ইচ্ছেটা পূর্ণ হল শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর। শ্রীনিকেতন যাওয়ার পথে তাঁর বাড়ি। তাঁর ছেলে বিশ্বরূপ বসুর সঙ্গে কথা বলে একদিন সন্ধ্যায় ঢুকে পড়লাম তাঁর বাড়িতে। বললাম আমি অমুক, আপনার নাতনি বাণীর সহপাঠী এবং নাতি সুপ্রতীকের মাস্টারমশাই। তিনি একটি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। গায়ে সাদা ফতুয়ার ওপর চাদর জড়ানো। এমনিতেই কথা বলতেন কম। তার ওপর ইদানীং অসুস্থ থাকায় কথা আরও কম, আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে। যাই হোক, একথা সেকথার পর আমি দেশের হালের মডার্ন আর্টিস্টদের সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। একটু

কলাভবনে নন্দলাল বসুর স্টুডিও

মডার্ন আর্টিস্টরা নেচারকে বড় ভয় পান। কিন্তু নেচারকে বাদ দিয়ে ছবি হবে কী করে?...কেবল চৌকো চৌকো বড় বড় লম্বা লম্বা বাড়ি দেখে কিউবিজম হবে, ঠিক ছবি হবে না। তবে তাঁরা যদি মন দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শোনেন তবে কাজ হয়, তাঁর গান শুনলে নেচারকে বোঝা যায়।

কেশে গলা পরিষ্কার করে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন— 'দেশে আজ সবাই ভাবছে ছবিতে নতুন কিছু করি, ওটা একটা ফ্যাশনের মতো। আমাদের দেশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না, তবু বিদেশি জিনিস আমদানি করা চাই। কিন্তু জোর করে তো পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না। বিদেশি ছবি ওদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়েছে, তাই ছবিও ভালো হয়েছে। বিদেশি ছবি নিতে পারবে না, এমন কথা বলিনি, তবে ওদেরটা 'এসিমিলেট' করতে হবে। তবে আমাদের পুরনো ধারাতেই এগিয়ে যাওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথ ও আমি নিয়েছি। পুরনো ধারা থেকে অনেক কিছু নিয়েছি। শুধু কি ইন্ডিয়ান? চাইনিজ ও জাপানিজ থেকেও নিয়েছি। ওদের ধারার সঙ্গে আমাদের ধারার মিল আছে।'

আমি জানতে চাইলাম আজকালকার ছবির বর্ণবাহুল্য সম্পর্কে। তিনি বললেন, 'রং বেশি থাকলেই ছবি খারাপ হয় না। তবে রং লাগাবার ক্ষমতা থাকা চাই। রাজপুত ছবিতেও বর্ণবাহুল্য আছে। কিন্তু জোর করে রং চাপালে জৌলুস বাড়ে, ছবি হয় না। এখানে আমরা নজর দিই তিনটি জিনিসের ওপর। নেচার স্টাডি, ট্র্যাডিশন ও অরিজিন্যালিটির ওপর। প্রথমে নেচার থেকে ছবি নেবে, কিন্তু সেটা অরিজিন্যাল হওয়া চাই। তারপর আসে ঐতিহ্যের কথা। ট্র্যাডিশনাল হলেই

রামকিঙ্কর বেইজ ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

স্টিরিওটাইপড্ হয় না। তার প্রমাণ অবনীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্রনাথের ছবি। আসল কথা হল, অরিজিনিল্যাটি থাকলে স্টিরিওটাইপড্ হয় না। সাবজেক্ট একঘেয়ে হয় না। আমি বীরভূমের একই দৃশ্যাবলি এঁকেছি অনেক তবু তা একঘেয়ে হয়নি ইমাজিনেশ্যানের জন্য। আজকাল অনেক নতুন আর্টিস্ট নতুনের মোহে নভেলটি দেখাচ্ছেন, কিন্তু অরিজিন্যালিটি দেখাচ্ছেন কই? মডার্ন আর্টিস্টরা নেচারকে বড় ভয় পান। কিন্তু নেচারকে বাদ দিয়ে ছবি হবে কী করে? আজকালকার আর্টিস্ট যদি চিরকাল কলকাতা শহরে কাটান, তবে ছবি হবে কী করে? কেবল চৌকো চৌকো বড় বড় লম্বা লম্বা বাড়ি দেখে কিউবিজম হবে, ঠিক ছবি হবে না। তবে তাঁরা যদি মন দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শোনেন তবে কাজ হয়, তাঁর গান শুনলে নেচারকে বোঝা যায়। ছবিতে এক্সপেরিমেন্ট ভালো, কিন্তু আমি কিছুই জানি না অথচ এক্সপেরিমেন্ট করছি সেটা ঠিক হয় না। মাতিস এপস্টাইন বড় আর্টিস্ট। এরা এক্সপেরিমেন্ট করে সফল হয়েছেন। তবে দেশের শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। দেশের ধারা অব্যাহত থাকবে না।'

বাইরে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি ও অন্ধকার। যেন নন্দলালের ছবি।

কাজের বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

। পর্ব ৮।

নানা কাজে এককথা

একই শব্দকে আমরা নানা কাজে লাগাই। নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া হল—
মাথার চুল থেকে পায়ের নখ। সবকিছুই কাজে লাগে।

মাথা

মাথা পেতে নেওয়া (মানা)।
মাথা কেনা (অধিকার দাবি)। মাথায় তোলা (প্রশ্রয়)। মাথা খাওয়া (নষ্ট করা)। মাথা গলানো (হস্তক্ষেপ)। মাথা কাটা যাওয়া (মান খোয়ানো)। মাথা গোঁজা (আশ্রয়)। মাথা ঘামানো (চিন্তা)। মাথায় রাখা (মনে রাখা)। মাথায় ঢোকা (বোধগম্য হওয়া)।

মুখ

মুখ রাখা (মান রক্ষা)। মুখের ওপর (সামনা সামনি)। মুখের কথা (সহজ)। মুখের মতো (সমুচিত)। মুখে আনা (বলা)। মুখ তুলে চাওয়া (সদয় হওয়া)।

বুক

বুক ঠোকা (আস্ফালন)। বুক বাঁধা (মনের জোর)। বুক দিয়ে পড়া (কায়মনোবাক্যে সাহায্য)। বুকের পাটা (সাহস)। বুকে হাত দিয়ে বলা (দিব্য করা)।

হাত

হাত করা (স্বপক্ষে আনা)। হাত পাকানো (রপ্ত করা)। হাত কামড়ানো (আপসোস)। হাত পাতা (চাওয়া)। হাতে নেওয়া (দায়িত্ব নেওয়া)। হাতধরা (বশ্য)। হাতভারী (কৃপণ)। একহাত নেওয়া (প্রতিশোধ)।

গা

গা করা, গা দেওয়া, গায়ে মাখা (আমল দেওয়া)। গা জ্বালা করা (বিরক্তি)। গা ঢেলে দেওয়া (এলিয়ে পড়া)। গা ঢাকা দেওয়া (গায়েব)। গায়ে পড়া (অযাচিত)। গা-সওয়া (অভ্যস্ত)।

চোখ

চোখ দেওয়া (লোভ করা)। চোখ টাটানো (ঈর্ষা)। চোখ ফোটা (হুঁশ হওয়া)। চোখ রাঙানো (চোটপাট)। চোখের পরদা (লজ্জা শরম)। চোখ রাখা, চোখে চোখে রাখা (পাহারা)। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো (নিঃসন্দেহ করা)।

কান

কান দেওয়া (গ্রাহ্য)। কান পাতা (শোনা)। কান ভারী করা (লাগানো)। কান-পাতলা (যে যাই বলে বিশ্বাস করা)। কান-কাটা (নির্লজ্জ)।

নাক

নাক গলানো (অনধিকার চর্চা) নাক বরাবর (সোজা)। নাক তোলা, নাক সিঁটকানো (অবজ্ঞা, ঘৃণা)। নাকে খত দেওয়া (প্রায়শ্চিত্ত)।

পা

পায়ে পড়া, পায়ে ধরা, (আত্মসমর্পণ)। পায়ে ঠেলা (ত্যাগ)। আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ ঐশ্বর্য)। বুড়ো আঙুল দেখানো (তাচ্ছিল্য)। তর্জনী তোলা (অভিযোগ)।

নখ

নখাগ্রে, নখের আগায়, নখদর্পণে (স্পষ্ট জ্ঞান)। নখের যুগ্যি নয় (তুলনা হয় না)।

মন

মন করা (সঙ্কল্প)। মন দেওয়া (মনোনিবেশ)। মন পাওয়া, মন গলা (তুষ্টি)। মন কেমন করা (উতলা)। মন-মরা (বিষণ্ণ)। মনের মতন, মনে ধরা (পছন্দ)। মন দেওয়া-নেওয়া (ভালোবাসা)।

গুণবাচক

বড়: বড় হওয়া (বৃদ্ধি)। বড় কুটুম (শালা)। বড় জোর (খুব বেশি হলে)।

ছোট: ছোট নজর (সঙ্কীর্ণ)। ছোট কাজ (হেয়)। ছোট মুখে বড় কথা (স্পর্ধা)। ছোটলোক (হীন)। ছোট করা (অবজ্ঞা)।

কাঁচা: কাঁচা বয়স, কাঁচা বুদ্ধি, কাঁচা হাত (অপরিণত)। কাঁচা কাজ, কাঁচা লেখা (অপটু)। কাঁচা রাস্তা (মাটির)। কাঁচামাল (উপাদান)। কাঁচা পয়সা (সহজলভ্য)। কেঁচে যাওয়া (পণ্ড হওয়া)। কেঁচে গণ্ডুষ (ফিরে আরম্ভ করা)।

পাকা: পাকা মাথা (অভিজ্ঞ)। পাকা কাজ (স্থায়ী)। পাকা হাত (নিপুণ)। পাকা কথা (চূড়ান্ত)। পাকা-পাকা কথা (জ্যাঠামি)। পাকাপাকি (নিশ্চিত)।

নানা কাজে এক ক্রিয়া

একই ক্রিয়া বিস্তর কাজে লাগে। যেমন:

লাগা

ভালো লাগা (পছন্দ)। সময় লাগা (দেরি)। টাকা লাগা (খরচ)। কাজে লাগা (ব্যবহার)। মনে লাগা (ক্ষুণ্ণ)। পিছনে লাগা (শত্রুতা)। লেগে পড়া (যোগ দেওয়া)। উঠে পড়ে লাগা (উদ্যোগী হওয়া)।

ধরা

ট্রেন ধরা (ওঠা)। এ স্টেশনে ট্রেন ধরে না (দাঁড়ায় না)। বৃষ্টি ধরেছে (থেমেছে)। ধরে যাওয়া (পোড়া)। দোর ধরা, মুরুব্বি ধরা (প্রত্যাশা)। গলা ধরা (গলা বসে যাওয়া)। ধরকাট (নিয়ম মানা)। মনে ধরা (মনোমতো)। বেশ ধরা (সাজা)। হাতধরা (অনুগত)। ম্যাঁও ধরা (দায়িত্ব নেওয়া)।

কাটা

সময় কাটা। সুর কাটা। তাল কাটা। টিকিট কাটা। বাজারে কাটা (বিক্রি)। দাগ কাটা। মনে দাগ কাটা (মনে থেকে যাওয়া)। কেটে পড়া (পালানো)। কাটিয়ে ওঠা (নিস্তার)। পকেট কাটা। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা)।

ওঠা

সকালে ওঠা। গাছে ওঠা। ঘরে ওঠা। বাজারে ওঠা। জাতে ওঠা (মর্যাদা)। দাঁত ওঠা। চুল ওঠা। ক্লাসে ওঠা। পাখা ওঠা (স্পর্ধা)। ভাড়াটে ওঠা। উঠে যাওয়া। উঠে পড়া। উঠ কিস্তি (বড়ে ওঠালেই কিস্তি পড়া)। উঠবন্দি (চাষের খেতে মেয়াদি বন্দোবস্ত)।

তোলা

শিকেয় তোলা (স্থগিত)। মাথায় তোলা (আশকারা)। বাড়ি তোলা। কানে তোলা। গাছে তোলা (প্রশংসা)। গান তোলা (শেখা)। কথা তোলা (প্রসঙ্গ ওঠানো)। রব তোলা (প্রচার)। তোলাপাড়া (বার বার ভাবা)। তোলপাড় (ওলট-পালট)। তুলকালাম (হুলুস্থুল)।

মুখের কথা

লেখার কাজে লাগানো যায় এমন কিছু লোকমুখের কথা: ডোকলা (অপব্যয়ী)। ট্যাঁটা। হিজলদাগড়া (বেহায়া)। টিট (জব্দ)। ঢ্যাঙা (লম্বা)। ড্যাকরা (শঠ)। ত্যাঁদড় (শয়তান) দজ্জাল (ঝগড়াটে)। দুম্বো, ধুম্বো (বড়সড়)। ধুমসো (মোটা)। নিকড়ে (নিষ্কপর্দক)।

নিড়বিড়ে (চটপটে নয়)। পাটোয়ার (অতি হিসেবি)। ফটিকচাঁদ (ফুটফুটে চেহারার লোক)। ফতো (অন্তঃসার শূন্য)। ফিচেল (ফন্দিবাজ)। ফুটানি (বড়লোকি চাল)। বইতাল (মিথ্যেকে সত্যি আর সত্যিকে যে মিথ্যে বলে চালায়)। মড়ঞ্চে (যে স্ত্রীর বাচ্চা বাঁচে না)। মাওরা (মা-মরা)। ম্যানতামুখো (মিনমিনে)। জোগাড়ে (জুটিয়ে নিতে পারে)। জোগালে (রাজমিস্ত্রির জন)। সাউকুরি (অন্যের পক্ষে ওকালতি)। হাউড়ে (পেটুক)। হারুন (দুষ্টু)। হেক্কট (অবাধ্য)। হাত নুড়কুত (যে ফাইফরমাশ খাটে)।

সাঁট ইশারা

লিখতে গিয়ে আমরা বাক্য শেষ করে দাঁড়ি টানি। শুরুতে, মাঝখানে, উপান্তে আর অন্তে থাকে প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি, বন্ধনী, কমা, সেমিকোলন, কোলন, হাইফেন, ড্যাশ, ফুটকি— এই রকমের হরেক চিহ্ন। পাঠক যাতে বাক্যটিতে অর্থের দিশা পায়।

যতিচিহ্ন

কমা,

বাক্যের মধ্যে কম সময় থামলে হয় কমা। নানাভাবে কমার ব্যবহার হয়: (১) সমজাতীয় বিভিন্ন পদ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয়, ক্রিয়া) পর পর থাকলে। স্নানঘরে তেল, সাবান, তোয়ালে, শ্যাম্পু সবই মজুত। আপনি, আমি, উনি সবাই এক গোত্রের। লোকটি মোটাসোটা, বেঁটে, মাঝবয়সি। তবে, যদি, কিন্তু এসব শুনতে চাই না। তোমার সঙ্গে আমার দেওয়া, নেওয়া, পাওয়ার সম্পর্ক নয়। (২) পর পর একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে: সকালে একজন ঘর ঝাঁট দিয়ে, বাসন মেজে, উনুন ধরিয়ে চলে যায়। (৩) পাশাপাশি একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে কমা দিয়ে আলাদা করা দরকার। আমি আসরে বসলাম, কিছুক্ষণ গান শুনলাম, দশটায় উঠে চলে এলাম। (৪) বাক্যের গোড়ায় প্রথমত, অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে, হ্যাঁ, না ইত্যাদির পর। প্রথমত, কী ঘটেছে দেখতে হবে। (৫) পরের বাক্যের তাহলে, কিন্তু ইত্যাদির আগে। তুমি যদি ওষুধ না খাও, তাহলে অসুখ সারবে না। (৬) বাক্যের গোড়ায় ক্রিয়াবিশেষণের পর। বরাত ভালো, ঠিক সেই সময় বৃষ্টি এল। (৭) উদ্ধৃতিচিহ্নের আগে। সে বলল, 'চললাম'। (৮) সম্বোধনপদের পরে। মা, আমি এসেছি। (৯) নামের শেষে পরিচয় চিহ্নের আগে। অমিয় দেব, প্রাক্তন উপাচার্য। (১০) সংযোজক (এবং) বা বিয়োজক (কিংবা) পদের আগে কমা হবে না। এখানে সস্তায় আহার এবং বাসস্থান মিলবে। ফাঁকা ট্রেনে যেতে পারেন অথবা ভিড়ের বাসও ধরতে পারেন।

পাঠক যাতে লেখকের বলবার কথা সহজে ধরতে পারেন, যতিচিহ্ন তার সহায়ক। ছোট ছোট বাক্যে কমা সেমিকোলনের আধিক্য কমানো যায়। পড়ে বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। যতিচিহ্ন মানেই, বাক্যে কমবেশি ছেদ আনা। বেশি ছেদচিহ্ন থাকলে পড়ায় অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটে।

সেমিকোলন:

কমার চেয়ে একটু বেশি থামতে হলে। (১) জটিল বাক্যের মাঝখানে। মানুষটি ছিলেন নির্লোভ, প্রচারবিমুখ; এবং পরিচিত সকলেরই ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। (২) ভাবগত মিল আছে, এমন পাশাপাশি বাক্যের মধ্যে। আজ যার এত কদর, কাল কেউ তাকে পুঁছবে না; এটাই জগতের নিয়ম।

কোলন:

(১) উদ্ধৃতির আগে। তাঁর কথা: 'যত মত তত পথ।' (২) দৃষ্টান্ত দেখাতে। এই যেমন: গান গাওয়া, ছবি আঁকা, পদ্য লেখা। (৩) দুই পৃথক বাক্যের ভাবগত অন্তর্মিল থাকলে। পড়লে চিন্তাশক্তি বাড়ে: বই হল ভাবনার খোরাক।

প্রশ্নচিহ্ন ?

যেখানে প্রশ্ন থাকে, সেখানে বাক্যের শেষে। তোমার কী নাম?

বিস্ময় চিহ্ন!

বিস্ময়, ঘৃণা, শোক, আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে। কী সুন্দর! তোমাকে ধিক!

ড্যাশ—

(১) হঠাৎ থামলে কিংবা চিন্তা অন্যদিকে মোড় নিলে। কী বলছিলাম— হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লটারিতে টাকা পেলে— যতসব উদ্ভট চিন্তা। (২) বক্তব্যকে বিশদ করতে। ওঁর আর সেদিন নেই— ক্ষমতায় এসে গাড়ি, বাড়ি, টাকা সবই হাতের মুঠোয়।

হাইফেন

পদ জোড়া দেওয়ার চিহ্ন। শ্রমিক-কৃষক। কাঠ-ফাটা। ভাত-রুটি। নুন-তেল-লকড়ি।

কোট-চিহ্ন " ", ' '

অন্যের কথা উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয়। চণ্ডীদাস গেয়েছেন: "সবার ওপরে মানুষ সত্য"। কখনও কোনও প্রসঙ্গ, বইয়ের নাম ইত্যাদিও কোট চিহ্নের অন্তর্গত করা হয়। অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে'। সেদিনের সেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন।

ছাড় চিহ্ন...

না-বলা কথা বোঝাতে। তখন সে যে ভাষায় বলল, তা লেখা যায় না...। স্থানকালের ব্যবধান বোঝাতে। দিন যায়... মাস যায়... বছর যায়...। আজ দিল্লি... কাল লন্ডন... পরশু নিউ ইয়র্ক।

উর্ধ্ব-কমা '

উচ্চারণে ও-কার কিংবা লোপ চিহ্ন হিসেবে। তুমি ওঁর বইটা প'ড়ো। ক'টা বাজল? ন'টা?

বন্ধনী ( )

বন্ধনী ব্যবহার করা হয় বাড়তি খবর বা প্রমাণপঞ্জির উল্লেখের জন্য। রাজনীতি আর দুর্নীতির আজ পিঠোপিঠি সম্পর্ক (তহলকা)। শ্রীলঙ্কায় ভারত গো-হারা (বিস্তৃত খবর, পৃষ্ঠা ১৩)।

ব্যক্তিবিশেষের অভিরুচিতে এসব চিহ্নের নানা রকমফের হয়। চোখ খুলে তাকালেই নানা জনের লেখায় তার নমুনা মিলবে।

এই প্রসঙ্গে দুটো জরুরি কথা মনে রাখা দরকার। পাঠক যাতে লেখকের বলবার কথা সহজে ধরতে পারেন, যতিচিহ্ন তার সহায়ক। ছোট ছোট বাক্যে কমা সেমিকোলনের আধিক্য কমানো যায়। পড়ে বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয় না।

যতিচিহ্ন মানেই, বাক্যে কমবেশি ছেদ আনা। বেশি ছেদচিহ্ন থাকলে পড়ায় অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটে। (ক্রমশ)

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

। পর্ব ৮।

কবি ঔপন্যাসিক সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী

বইয়ের দোকানটি রাস্তার ওপরেই। কলেজ স্ট্রিট ট্রাম লাইনের সমান্তরাল এই রাস্তাটি। রাস্তাটি বিশেষ দীর্ঘ নয়। সংস্কৃত কলেজের সামনে থেকে শুরু হয়ে মহাত্মা গান্ধি রোডের ট্রাম লাইন পেরিয়ে একটু গিয়েই শেষ হয়েছে। এই রাস্তার ওপরেই একটি ঘরে বইয়ের কাউন্টারটি। তখন এই বইঘরটির দুটি দরজা রাস্তার ওপর। দরজার সামনে দুটি টেবিল। ভেতরে চেয়ার-টুল পাতা। সেখানে বসেই কর্মীরা ক্যাশমেমো কাটেন। ঘরের ভেতরের আলমারি থেকে বই এনে ক্রেতাদের দ্যাখান। একটি দরজাই যেন নির্দিষ্ট ব্যবসা করার জন্য, বই দেখানো, ক্যাশমেমো কাটা ইত্যাদির জন্য। আর একটি দরজা ও টেবিল প্রায় বেদখল হয়ে যায় কোনও কোনও সময়ে। সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের আড্ডার জন্য।

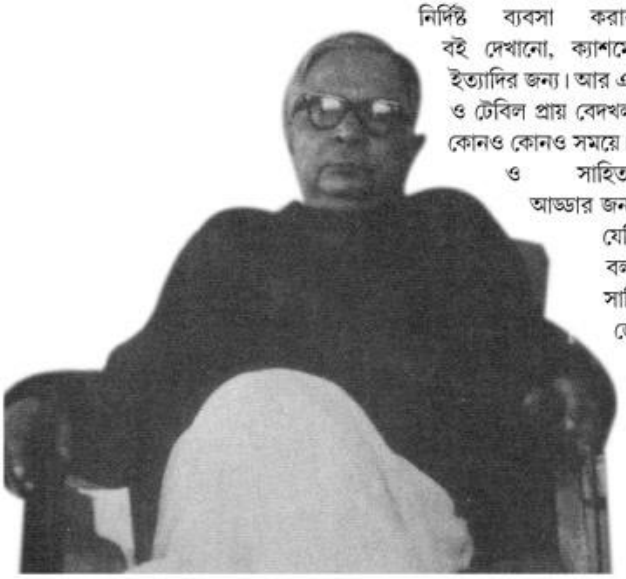

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন সাহিত্যিকদের জোর আড্ডা চলছে। তখন সময়টা শীতকাল। আড্ডার মধ্যে খর্বকায় মানুষটি যেন মধ্যমণি। তাঁর এক-একটি মন্তব্যে হইহই হাসি উঠছে। মানুষটি শীতকাতর, গায়ে প্রচুর শীতবস্ত্র দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু সেজন্য মানুষটির মধ্যে রসবোধের খামতি নেই। এমন সময়ে পথ-চলতি মানুষদের একজন সেই আড্ডা দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন— এই তো বিশীদা, আপনাকেই খুঁজছিলাম।

ভদ্রলোক নিরীহভাবে বললেন, কেন, আমি কী করলাম?

জিজ্ঞাসাকারী বললেন— ওই যে একটা শ্লোক আছে না? শেষ লাইনটা যার 'মাঘে সন্তি ত্রয় গুণাঃ'। ওর প্রথম তিনটি লাইন ভুলে গিয়েছি। একটু বলবেন? ওই তিনটি গুণ কী কী?

বিশীদা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন— বিলক্ষণ, মাঘের তো তিনটে গুণ— বাত, পিত্ত ও কফ— তিনটেই বড় কষ্টদায়ক।'

আড্ডার সবাই এবং প্রশ্নকর্তাও সমস্বরে হেসে উঠলেন— সত্যি, বিশীদা, এমন চমৎকার উত্তর আপনি খুঁজে পান কী করে?

পরে অবশ্য বিশীদা শ্লোকটি উদ্ধার করে দিলেন।

আসলে কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলি নতুন

শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় সহপাঠীদের সঙ্গে সামনের সারিতে বাঁদিক থেকে তৃতীয় প্রমথনাথ

প্রমথবাবু গণিতে কাঁচা ছিলেন। গণিত, বীজগণিত এড়িয়ে চলতেন। জ্যামিতি মুখস্থ করে পার পেতেন। একবার অঙ্ক পরীক্ষার খাতায় উত্তরে লেখেন— হে হরি দয়াময় হইয়া সদয় ... ইত্যাদি।

নয়। একালে যেমন, সেকালেও তেমনি ছিল। কবি মাঘ-এর সম্ভবত অনুরাগীবৃন্দ অথবা কবি মাঘই নিজেকে বড় করার জন্য শ্লোকটি তৈরি করেন। রসপণ্ডিতরা মনে করেন, কালিদাসের কাব্যে যেমন উপমা অলঙ্কার, ভারবিতে যেমন অর্থগৌরব, নৈষধের কাব্যে যেমন পদলালিত্য এমনটি আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেজন্যই কবি মাঘ অথবা তাঁর অনুরাগীরা এই শ্লোকটি তৈরি করেন—

উপমা কালিদাস্য
ভারবে অর্থগৌরবঃ
নৈষধে পদলালিত্যঃ
মাঘে সন্তি ত্রয় গুণাঃ।

যাই হোক, শ্লোক ব্যাখ্যার পর একজন বললেন, তা বিশীদা মাঘ যাই বলুন, আপনি একটু বেশি শীতকাতুরে। শীত পড়েছে, তবে আপনার মতো কারও এত জামাকাপড় গায়ে নেই, আজ কটা পরেছেন?

আপনারা এতক্ষণ নিশ্চয় বুঝে গিয়েছেন— ভদ্রলোকটি হলেন লেখক অধ্যাপক রসজ্ঞ-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী। বিশীদা বললেন— ক্লাসে ছেলেরাও তাই বলে। আমি বললাম কটা পড়েছি গুনে দ্যাখো। তারা কোট, সোয়েটার জামা, দুটো লম্বা হাতা গেঞ্জি গুনে বলল— স্যার, ৫টা। আমি বললাম— ভেতরে ২টো হাতকাটা গেঞ্জি আছে। সবসুদ্ধ ৭টা।

আড্ডার সবাই হেসে উঠল। একজন বললেন, আর একটু শীত পড়লেই আপনি পরশুরামের গল্পের নকুড়-মামা হয়ে যাবেন।

ততক্ষণে কাউন্টারের বেদখল হয়ে যাওয়া জায়গায় খবরের কাগজ পেতে মুড়ি-ডালমুট চলছে। প্রমথবাবু বললেন, হ্যাঁ মশাই, আমার বিরুদ্ধে তো অনেক কথা হল, এবার কফিহাউস থেকে তিতো ডালপোড়া ডালপোড়া গন্ধওলা কফিটা আনান।

কফি এল। কফি খেতে খেতে প্রমথবাবু বলেন, যাই বলুন— এই কফির কাছে ওই নেস-কাফে-টাফে লাগে না।

কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় দুটি আড্ডার জায়গা। একটা এই মিত্র-ঘোষে, আর একটি এম-সি-সরকারে। মিত্র-ঘোষে অপেক্ষাকৃত নবীন সাহিত্যিক সেজন্য নাম হয় এই আড্ডাটির হাউস অব কমনস। আর এম সি সরকার-এ প্রবীণরা বসতেন— সুধীর সরকার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কেদার চাটুজ্যে প্রভৃতিরা— সেজন্য এটার নাম হাউস অব লর্ডস। দুটি নামই প্রমথবাবুর দেওয়া। একদিন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন কর্মকর্তা মাখনলাল সেন এসেছেন হাউস অব লর্ডসে। তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪-৫ বছর। দুর্নীতির নানা গল্পগুজব উঠছে নেতাদের সম্পর্কে। প্রমথবাবু মাখনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, মাখনবাবু, আপনাকে একটা পিস্তল আর দশটা গুলি দিলে কাকে কাকে মারবেন একটা তালিকা দেবেন?

আড্ডার সবাই চুপ। মাখনবাবুর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু মাখনবাবু সবাইকে নিরাশ করে বললেন— হইব না। দশটায় কুলাইব না। আমারে বিশটা গুলি দ্যান। তারপর লিস্টি দিমু।

আড্ডার সবাই সমস্বরে হেসে উঠলেন।

প্রমথনাথ বিশীর জন্ম ১৯০১ সালের ১১ জুন। এখনকার বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার জোয়াড়ী গ্রামে। জোয়াড়ীর বর্ধিষ্ণু বিশী পরিবারের নাম বিখ্যাত। বিশী এই পদবি বেশি দেখা যায় না। কেউ কেউ বলেন, বিষয়ী থেকে অপভ্রংশ হয়ে বিশী হয়েছে। প্রমথবাবুরা সাতভাই পাঁচবোন মিলে মা-বাবার বারোজন সন্তান। পিতা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবাস বরণ করেন। শিক্ষায় যাতে ব্যাঘাত না হয় সেজন্য অন্যান্য অভিভাবকরা জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমথনাথ ও তাঁর ছোট ভাইকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে পড়তে পাঠান।

মাত্র ন' বছর বয়সে প্রমথনাথ ও তাঁর ছোট ভাই ১৯১০ সালের আষাঢ় মাসে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে পড়তে এলেন। কিন্তু ছোট ভাইটির বাড়ির জন্য, বিশেষ করে মায়ের জন্য মন কেমন করায় বাড়ি ফিরে গেল। তবে প্রমথবাবু রয়ে গেলেন।

প্রমথবাবুর শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতাটি অদ্ভুত।

যখন পৌঁছলেন, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরেই খাওয়ার ডাক পড়ল। একটা টিনের ঘরে লম্বা করে চটের আসন পাতা। শালপাতা আর গেলাস-বাটি সাজানো। খাবারের আয়োজন ব্যবস্থার মধ্যে ছিল খিচুড়ি ও পায়েস। ভোজনের পরে 'বীথিকা' গৃহে শয়নের ব্যবস্থা। প্রমথবাবু লিখছেন— 'নতুন ছাওয়া চালে খড়ের স্নিগ্ধ গন্ধ, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এই উদ্ভিজ্জ স্নিগ্ধ সুবাসেই আমার শান্তিনিকেতনের যথার্থ অভিজ্ঞতা।'

সকালবেলা বাইরে এসে প্রমথবাবু অবাক। ছেলেরা মাঠের মধ্যে ইতস্তত আসন পেতে বসে। তারপর সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে কী যেন মন্ত্র আবৃত্তি করে গেল। তারপর সবাই জলযোগের জন্য রান্নাঘরে গেল।

এরপর প্রমথবাবুর ক্লাসে ভর্তির পালা। তখন ম্যাট্রিকুলেশন বা আজকালকার স্কুল ফাইনাল ক্লাসকে প্রথম শ্রেণি বলা হত। সে সময়ে শান্তিনিকতনে এক-

এক ছেলেকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি করা হত। কেউ ইংরিজিতে বা বাংলায় পারদর্শী, কিন্তু অঙ্কে কাঁচা। সে বাংলা বা ইংরিজিতে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হত, কিন্তু অঙ্কে সপ্তম বা ষষ্ঠশ্রেণিতে। প্রমথবাবু গণিতে কাঁচা, সেজন্য গণিতে বরাবর এক শ্রেণি নীচে পড়তেন। একদিন গণিত শিক্ষক শরৎবাবু বোর্ডে একটি অঙ্ক করতে দিলেন। তাতে 'হন্দর' শব্দটি ছিল। প্রমথবাবু তখন সবে ডবল প্রমোশন পেয়ে নূতন শ্রেণিতে উঠেছেন। পাশের ছাত্রসঙ্গী জিজ্ঞাসা করল 'হন্দর' কথাটির মানে কী? প্রমথবাবু বললেন— ওটা বোধ হয় হাঙ্গর হবে। স্যার লিখতে ভুল করেছেন।

সঙ্গী বলল— জিজ্ঞেস করব।

প্রমথবাবু সভয়ে— চুপ, চুপ, একটা দিন অন্তত ডবল প্রমোশন ভোগ করতে দাও।

প্রমথবাবু গণিতে কাঁচা ছিলেন। গণিত, বীজগণিত এড়িয়ে চলতেন। জ্যামিতি মুখস্থ করে পার পেতেন। একবার অঙ্ক পরীক্ষার খাতায় উত্তরে লেখেন—

হে হরি দয়াময়
হইয়া সদয় ... ইত্যাদি

কবিতাটি ঠিক মনে নেই, অঙ্ক ভুল হলেও গণিতশিক্ষক যেন পাশ করিয়ে দেন ভগবানের প্রতি নিবেদন ছিল কবিতার বিষয়বস্তু।

গণিত শিক্ষক খাতাটি নিয়ে সোজা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত। খাতা দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন প্রমথর কাণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ সব দেখে বললেন, ওকে গণিতটা একটু জোর দিয়ে শেখাও, তবে কবিতাটা যেন বাদ না দেয়, ওইটুকু ছেলে কিন্তু কবিতাটা ঠিক ঠিক লিখেছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিজে পড়াতেন। একবার dying শব্দের অর্থ বললেন, 'মুমূর্ষু'। অকুতোভয় প্রমথনাথ বললেন, ওটা তো গুরুদেব 'মুমূর্ষ' হবে না, 'ম্রিয়মাণ' হবে।

গুরুদেব বিস্মিত। বললেন, কেন রে?

প্রমথ বললেন, লোকটার তো মরবার ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছার্থে 'সন' প্রত্যয় হয়।

গুরুদেব আরও বিস্মিত। একথা কে বলেছে?'

প্রমথবাবু আরও নির্ভীক। বললেন, 'পাণিনি।'

গুরুদেব এবারে হতাশ হয়ে বললেন, 'এ তো সংস্কৃতও শিখলি না, বাংলাও ভুললি।

যাই হোক, সেদিন থেকে পাণিনি পড়ার চাপ কমল।

রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে সতেরো বছর শান্তিনিকেতনে বাস প্রমথবাবুর জীবনের এক অমূল্য সঞ্চয়। তখন রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে স্বয়ং ছাত্রদের পড়াতেন। কোনও ছাত্রের জিজ্ঞাসাকে বা প্রদত্ত উত্তরকে তুচ্ছ করতেন না। সাহিত্যবাসরে নিজে অংশ নিতেন।

একবার এরকম একটা সাহিত্যবাসরে রবীন্দ্রনাথ থাকতে পারেননি। দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে সাহিত্যবাসর চালাবার ভার দিয়েছিলেন। দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে শান্তিনিকেতনে সাহেব বলতেন সবাই।

সেদিন রাত ১০টায় রবীন্দ্রনাথের ডাক এল প্রমথবাবুর কাছে। তখন শীতকাল। শীতকালে রাত ১০টা শান্তিনিকেতনে অসম্ভব ঠান্ডা। এই অসময়ে গুরুদেবের ডাক মানে নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর অপরাধ। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের ভোরে গাছে উঠে খেজুর রসের ভাঁড় ভেঙে খাওয়া বা সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে না বলে মুরগির ডিম নেওয়া এসব অপরাধ প্রায়ই ঘটত। প্রমথবাবু কোন অপরাধ করেছেন ভাবতে ভাবতে এলেন।

প্রমথবাবু লিখছেন, পূর্বদিকের বারান্দায় একটা দীর্ঘায়িত মূর্তি পায়চারি করছেন। কাছে যেতেই গুরুদেব বললেন, হ্যাঁরে সাহেব এসে শুনিয়ে গেল তুই আজকের সাহিত্যবাসরে একটা কী লিখেছিলি! তার মধ্যে একটাই শব্দ ছিল— 'Taxi-তে'। ও তো বাংলা বোঝে না। আমি শোনবার পর থেকেই ভাবছি, বাংলা নাটকের মধ্যে Taxi ঢুকল কী করে?

প্রমথবাবু বললেন, ওটা একটা ছত্রের শেষ শব্দ। আগের ছত্রটার শেষ শব্দ ছিল 'এক শীতে'। কাজেই 'Taxi-তে' না থাকলে মিল পেতাম কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ শুনে হেসে উঠলেন, 'দেখো একবার পাগলের কাণ্ড! শোনবার পর থেকে আমি মিল খুঁজে মরছি। শেষে কিছু না পেয়ে তোকে এত রাতে কষ্ট দিলাম। তারপর আবার হেসে বললেন, পাগলটা কিছুতে বাংলা শিখল না, বাংলা না বোঝবার ফলেই এই বিভ্রাট ঘটছে। যা তুই শুতে যা।

প্রমথবাবু ভাবতে ভাবতে ফিরে এলেন— কে পাগল? এন্ড্রুজ, না গুরুদেব। একটা সামান্য মিলের জন্য না ঘুমিয়ে পায়চারি করছেন, তারপর হাল ছেড়ে রাত দশটায় ছাত্রকে ডেকে পাঠানো।

প্রমথবাবু অন্যত্র লিখেছেন, এরকম অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই স্ত্রীর গয়না বেচে, অশেষ কষ্ট সহ্য করে শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন। তখন তো জলের কল, বিজলি আলো কিছুই ছিল না। কিন্তু শান্তিনিকেতনের এই সতেরো বৎসরের বাস তাঁর সাহিত্যের ভিত্তি ও জীবনের বনেদ গড়ে দিয়েছিল।

তবে এই দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করলেও তাঁর ওপর এবং তাঁর সাহিত্যের ওপরও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বেশি। এটি কেন হল বোঝা যায় না। হয়তো রবীন্দ্রনাথেরই শিক্ষার ফল। যার যা ব্যক্তিত্ব তা যেন যথাযথ স্ফুরিত হয়।

শান্তিনিকেতনে ম্যাট্রিক পাশ করার পর, অবশ্য তখন অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হত, ১৯২৭ সালে প্রমথবাবু ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে বি এ পাশ করেন। ওই সালেই তাঁর বিবাহ হয়। আবার ওই বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজিতে এম এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু পিতা স্বদেশি আন্দোলনে গ্রেপ্তার হলে সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য পড়াশুনোয় সাময়িক ব্যাঘাত হয়। ১৯৩২ সালে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন।

এম এ পাশ করার পর তিনি রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি নিয়ে বাংলায় গবেষণা শুরু করেন। এই গবেষণারই ফল হল তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ-গ্রন্থ— রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, যা আজও রবীন্দ্র-কাব্য গবেষণার এক অনন্য সহায়।

রবীন্দ্রনাথ ও সি এফ অ্যান্ড্রুজ

রবীন্দ্রনাথ শুনে হেসে উঠলেন, 'দেখো একবার পাগলের কাণ্ড! শোনবার পর থেকে আমি মিল খুঁজে মরছি। শেষে কিছু না পেয়ে তোকে এত রাতে কষ্ট দিলাম। তারপর আবার হেসে বললেন, পাগলটা কিছুতে বাংলা শিখল না, বাংলা না বোঝবার ফলেই এই বিভ্রাট ঘটছে। যা তুই শুতে যা।

নোয়াখালিতে গান্ধিজি

এই গ্রন্থে একটি সমালোচনা ছিল— রবীন্দ্রকাব্যে অতিকথন ও অল্পকথন। এই সমালোচনা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ আশা করেননি। তাঁর কোনও ছাত্র এমন সমালোচনা লিখবে। পরে প্রমথবাবুর 'পদ্মা' উপন্যাসটি বেরলে তিনি একটি কপি গুরুদেবকে দিয়ে এসেছিলেন। সেই বইটি পড়ে গুরুদেব তার পৃষ্ঠার জায়গায় জায়গায় মন্তব্য করেছেন— ইহা কি অতিকথন নয়? অথবা, ইহা কি অল্পকথন নয়? বইটি আমি পুলিনবিহারী সেন মশাইয়ের কাছে দেখি। প্রমথবাবুও দেখেছিলেন। প্রমথবাবু পরে বলেন, এখন বুঝি গুরুদেব সমালোচনা পড়ে কতটা আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো তাঁরই হাতে তৈরি।

প্রমথবাবু কর্মজীবনে প্রথম দশবছর রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন। রিপন কলেজে তখন চাঁদের হাট। নানা বিভাগে নামজাদা অধ্যাপক সব। সবই ভালো কিন্তু বাংলার অধ্যাপকদের বেতন পঁচাত্তর টাকা, অন্য বিভাগে সব একশো টাকা। আজকালকার দিনে কি একথা ভাবা যায়! কিন্তু এ নিয়ে কোনও ঈর্ষা-বিবাদ বা অসন্তোষ ছিল না।

একদিন কী একটা কাজ করছি, প্রমথবাবু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ভানুবাবু চলুন একটু বেড়িয়ে আসি, অনেকক্ষণ তো কাজ করছেন।

অগত্যা ওঁর সঙ্গে বেরলাম। উনি কাউকেও সঙ্গে না নিয়ে সাধারণত ট্রাম লাইন পেরতেন না। ট্রাম লাইন পেরিয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট নামের রাস্তায় ঢুকে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। রাস্তার ওপরের একটি ঘর দেখিয়ে বললেন, এই ঘরটায় আমি থাকতাম। তখন এটা মেসবাড়ি ছিল। দেখে মনে হয় হয়তো এখনও মেসবাড়িই আছে। এইখানে একটা তক্তাপোষে বিছানা পাতা থাকত। সকালে সেটাই গুটিয়ে টেবিল হত। তারই ওপর পড়াশুনো লেখালিখি। এখন কি কোনও অধ্যাপক করবে?

যে সময়ে প্রমথবাবু আমাকে দেখালেন, তখন ১৯৭৮ সাল। তখন তো অবসর জীবন। রিপন কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৪৬-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে যোগ দেওয়া। তারপর ১৯৫০-এ আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হওয়া, পরে প্রধানাধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক পদে বৃত হওয়া, ১৯৭২ সালে রাজ্যসভার সদস্য হওয়া— এই ব্যাপক সময়েও তাঁর চালচলন সদাসর্বদা সাদামাটা ছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা ছাড়লেও দীর্ঘকাল তিনি সপ্তহে দু'বার 'কমলাকান্তের আসর' বলে একটি কলাম লিখতেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর যখন ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায় তখন দুটি অসাধারণ সম্পাদকীয় লেখেন— একটি কলকাতার ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় তৎকালীন সরকারের অপদার্থতার জন্য— 'মজস্তালী সরকার', আর নোয়াখালিতে যখন গান্ধিজি শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় পদব্রজে ভ্রমণরত তখন লেখেন— 'শ্মশানে এক সন্ন্যাসী।'

কমলাকান্তের আসরে লেখেন এক স্বপ্নাদ্য কাহিনি। তখন গীতিনাট্যর খুব হুজুগ চলছে। প্রমথবাবু স্বপ্নে দেখলেন— বিদ্যাসাগরের জীবনের এক ঘটনা নিয়ে গীতিনাট্য। একটি মাইলস্টোন যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে এল— এই দ্যাখো মোর বুকে আঁকিয়া রেখেছি টুকে, ইংরিজি আখরেতে 2, এরপরে 3, 4— নয়নে পড়িবে তোর, কোকিলায় কুহরিবে 'কু'। এরপর বিদ্যাসাগরের একটি ছবি দেয়াল থেকে ভেঙে পড়ায় কমলাকান্তের নিদ্রাভঙ্গ ও স্বপ্নভঙ্গ একই সময়ে।

'কমলাকান্তের আসর'-এ যে কত মণিমুক্তা ছড়ানো তা বলে শেষ করা যায় না। প্রমথবাবু আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা কাহিনির বড় ভক্ত ছিলেন। এক সময়ে বাজারে অগাথা ক্রিস্টির বইটার খুব অভাব দেখা দেয়। ঠিক ওই সময়েই একটি সংবাদ বেরল— ভগবান দাশ নামে এক ধীবরের জালে মাছের বদলে একটি হাঙর ধরা পড়েছে। কমলাকান্তের আসরে একটি কবিতা বেরল— শেষটা মনে আছে—

ভগবান তুমি হাঙর ধরিছ কোনো দিকে তব দৃষ্টি নাই,
বাজারে আগাথা ক্রিস্টি নাই।

তাঁর সাদাসিধে চালচলনের কথা বলছিলাম। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ-জি-সি অধ্যাপক। একবার প্রবল বৃষ্টি হয়ে জল জমে গিয়েছে, সবাই ভাবছে কী করে বেরবে। প্রমথবাবু এক ছাত্রের ছাতার নীচে তাঁর কাঁধ ধরে এক হাতে জুতো নিয়ে অম্লান চিত্তে আমাদের আড্ডায় এসে বসলেন। ছাত্রদের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন বন্ধুর মতো। রোল কল করছেন— সতী সেন-এর হয়ে কোনও পুরুষ সহপাঠী 'প্রক্সি' দিল। উনি 'স্ত্রিয়াম ঈপে পুং কণ্ঠ' বলে আবার রোল কল চালিয়ে গেলেন। বাংলায় পাশ্চাত্য

স্ত্রী সুরুচি বিশীর সঙ্গে প্রমথনাথ

সাহিত্যের প্রভাব পড়াবেন। এসে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন— তোমরা বিদেশি সাহিত্য কে কী পড়েছ? কেউ সদুত্তর দিতে পারল না। প্রমথবাবু বললেন— তাহলে তো আজ পড়ানো হবে না। আগে বিদেশি সাহিত্য পড়ো। তারপর গল্পগুজবে ক্লাস পিরিয়ড কেটে গেল। পরদিন ক্লাসে আসতেই সবাই তৈরি— প্রমথবাবু কে কী কী পড়েছ জিজ্ঞেস করতেই— কেউ বলে ডিকেনস, কেউ হুগো, কেউ অসকার ওয়াইল্ড, কেউ থ্যাকারে। প্রমথবাবু বললেন, বা বাঃ, তোমরা এত পড়ে ফেলেছ, কোনটা থেকে শুরু করি, সেদিনও গল্পগুজবে কেটে গেল। কিন্তু পরদিন যখন পড়ালেন, তখন ক্লাস শেষে প্রত্যেকের আপশোস, রোজ কেন স্যার পড়ান না।

কংগ্রেস সাহিত্যসভায় বাঁদিক থেকে বনফুল, প্রমথনাথ, নরেন্দ্র দেব এবং অজয় মুখোপাধ্যায়

ছাত্রদের সব থেকে বিস্ময় লাগত, হয়তো সাতদিন বাদ গেল, কিন্তু সাতদিন আগে যেখানে পড়ানো শেষ করেছিলেন, প্রমথবাবু ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলেন পড়ানো। কী করে মনে রাখতেন?

১৯৮৫ সালের ১০ মে তিনি চলে গিয়েছেন। কিন্তু ছাত্রদের কাছে তাঁর স্মৃতি অম্লান। আমরাই কি ভুলতে পারি যাঁরা তাঁর নিত্য আড্ডার সহচর ছিলাম।

এই মানুষটি সাহিত্যসমালোচনা লিখেছেন, কত হাসির নাটক গল্প লিখেছেন, জোড়াদীঘির উদয়াস্ত, লালকেল্লা, কেরী সাহেবের মুন্সীর মতো উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন কত।

একদিন আড্ডার মধ্যেই দুটি গানের মধ্যে বা দুটি গল্পের মধ্যে কী কী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, কোনও যোগসূত্র আছে কিনা এই আলোচনাতেই লিখে ফেললেন— রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো অনবদ্য আলোচনা গ্রন্থ। আর কোনও শান্তিনিকেতনবাসী এমনভাবে রবীন্দ্রচর্চা করেননি। কিছু করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী।

প্রমথবাবুকে আড্ডায় সবাই ভালোবাসত তাঁর কুইক রিপার্টির জন্য। একদিন তাঁর এক পুরাতন বন্ধু এসে বললেন, অনেকদিন দেখা হয়নি। বিশীদার সঙ্গে তাই দেখা করতে এলাম। একথা-সেকথার পর বললেন বন্ধু, বিশীদা আপনি কত বছর ছিলেন শান্তিনিকেতনে।

বিশীদা বললেন, সতেরো বছর।

বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, সাহিত্যচর্চা নাটকচর্চা গান শেখা সবই তো ওখান থেকেই তাহলে।

বিশীদা বললেন, সাহিত্যচর্চা নাটকচর্চা ওখানে থেকেই, তবে গান শেখা হয়নি।

গান শেখা হয়নি শুনে বন্ধু আশ্চর্য । নিজের মনেই বলছেন, বিশীদা সতেরো বছর শান্তিনিকেতন রইলেন, আর গান শিখলেন না।

বিশীদা চুপ করেই আছেন। বন্ধুকে বললেন, চা খান।

বন্ধু চা খাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর আক্ষেপ যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই বলছেন, সতেরো বছর তো কম নয়, তবু গান শেখা হল না।

তারপর বললেন, যাই বাড়ি চলি।

বিশীদা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় বাড়ি?

বন্ধুটি বললেন, দমদমে।

বিশীদা নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, নিজে করেছেন?

বন্ধুটি একটু সগর্বে বললেন, না, আমাদের তিনপুরুষের বাড়ি। ঠাকুরদা জমি কেনেন, বাড়ি করেন। বাবা সে বাড়ি আরও বাড়িয়েছেন।

বিশীদা আরও নিরীহভাবে প্রশ্ন করলেন, আপনি এরোপ্লেন চালানো শিখেছেন?

বন্ধু আশ্চর্য হলে বললেন, কেন, এরোপ্লেন চালানো শিখব কেন?

বিশীদা এবার মুচকি হেসে বললেন, আমি সতেরো বছর শান্তিনিকেতনে থেকে গান শিখিনি বলে আপনি আক্ষেপ করছিলেন তাই আমি ভাবলাম, তিনপুরুষ যখন দমদমে আছেন, প্লেন চালানো নিশ্চয় শিখে গিয়েছেন!

আড্ডার সবাই তখন সমস্বরে হেসে উঠেছেন। বন্ধুটি বিধ্বস্ত হয়ে ধপ করে আবার বসে পড়লেন। বিশীদা বললেন, বসলেনই যখন, আর এক কাপ চা খেয়ে যান।

প্রমথবাবু ছিলেন যেন এই সাহিত্যের আড্ডার সেই অঘোষিত আড্ডাধারী। জমাট আড্ডা বসলে চশমার আড়ালে সেই বুদ্ধিদীপ্ত চোখ ও মন্তব্যের জন্য এখনও আমাদের মন কেমন করে।

প্রমথবাবু ছিলেন যেন এই সাহিত্যের আড্ডার সেই অঘোষিত আড্ডাধারী। জমাট আড্ডা বসলে চশমার আড়ালে সেই বুদ্ধিদীপ্ত চোখ ও মন্তব্যের জন্য এখনও আমাদের মন কেমন করে।

আমার জীবন ছবি নিয়ে। তাই ছবিজীবন। সেই শৈশব থেকে যা দেখি তাই আঁকি। তখন অন্তরের কী বাইরের তা বুঝতাম না। জানার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই জানাবার আগ্রহ চলে আসে। অযুত মানুষের কাছে দেখা, শোনা, জানার ভিন্নতাই— ভিন্নভাবে জানাবার সুযোগ দেয়। মূর্তপথে, বিমূর্তপথে, শব্দে, বাক্যে, সুরে, কবিতায়, ছবিতে প্রকাশ পায় তা। এ পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্যে এ খেলা চলে অবিরত। তাই সকলের জীবনবোধ-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা আর জীবনপ্রবাহের বিচিত্রতাই এক অন্যরকম ছবি বা গাথার জন্ম দেয়। কেউ তা জড়ো করে মালা গাঁথেন, কেউ অনীহায় কিংবা আলস্যে ফেলে দেন। ঝরাপাতার মতো আপনি ঝরে যায় সে পল্লব। বনপথের মর্মরধ্বনির কলতানে নির্দিষ্ট হয় না সে ঝরাপাতা। হারিয়ে যায় অনন্তের কাছে। মিলিয়ে যায় অস্তিত্ব ক্রমশ। তবুও বেঁচে থাকার আশা, জানা আর জানাবার আশা অফুরান থেকে যায়। 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।' তাই আঁকি, গড়ি, লিখি ছবিজীবন নিয়ে। প্রথম কিছু পর্ব পুনর্মুদ্রণ হলেও তা পরিমার্জিত করার সুযোগ পেয়েছি। আশা করি আমার এ ছবিজীবন কষ্টিপাথরে পাঠক যাচাই করে নেবেন, যদি আদৌ আমি নিজেকে কোনও ধাতুর দাবিদার মনে করতে পারি!

8

গোড়ার দিকে ঠিকানা জোগাড় করে বসুমতী অফিস, যুগান্তর পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা এসব জায়গায় যাঁরা বিভাগীয় সম্পাদক তাঁদের সঙ্গে নিজে-নিজেই যোগাযোগ করতাম। পরখ করার জন্য দু-একদিন যাতায়াতের পর একটা ছোটখাটো লেখা ধরিয়ে দিতেন তাঁরা। বলে দিতেন এক কলম কী দু-কলমে ইলাস্ট্রেশন। তখন অফসেটেরও যুগ নয়, এখন ছাপার কৌশল কত বদলে গিয়েছে! সেইসব ছবি, কালো রঙে টোন ছাড়া আঁকতে হত। আর সেই লেখার নামকরণে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের মতো নামাঙ্কনের হরফ তৈরি করে নিতাম। এইভাবে পরিচয় হতে হতে বসুমতীর কল্যাণাক্ষদা, শান্তিদা, যুগান্তরের আশুতোষবাবু, প্রফুল্লবাবু থেকে শুরু করে আনন্দবাজারের সাগরদা, বিমলদা, নীরেনদা, রমাপদবাবু কে নয়! এইভাবে তাঁরা কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। আমার পদচারণা থেকে ভয় চলে গেল। অন্যদিকে ওঁরা আমাকে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন, উৎসাহ দিতে লাগলেন। বসুমতী একদিন উধাও হয়ে গেল। যুগান্তর, অমৃতবাজার কত বিচিত্র ঘটনায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল!

তুষারকান্তি ঘোষ সে-সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের গোটা সংবাদপত্র দুনিয়ার কী প্রতাপশালী মানুষ ছিলেন।

তুলনাহীন হাস্যরস, কৌতুক আর অনর্গল কথা বলায় তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁকে অল্প-দেখা, অল্প-চেনার উপলব্ধি থেকে বাঙালি চরিত্রের এক বর্ণময় ব্যক্তিত্বের ছবি আমি পাতার পর পাতা আঁকতে পারি। একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি, দুপুরে যুগান্তরের বাগবাজারের গলির অফিসে তিনতলায় দক্ষিণারঞ্জন বসুর ঘরে বসে আছি। এই বাড়ি এখনও আমি পরিষ্কার দেখতে পাই। লিফট-এ ওঠার আগে একটা প্রাচীনতম ছাপাই মেশিন অ্যান্টিকের মতো শোভা পেত। বড় মাপের লিফটটার দু-দিক খোলা যেত। সোজা উঠত তিনতলায় কাঁপতে কাঁপতে। দেখা যেত বিশাল প্রেস। দৈত্যের মতো অসংখ্য মেশিন। মানুষ আর মেশিনের আওয়াজে এক অদ্ভুত কলতান। বিপুল নিউজ প্রিন্টের স্তূপ। কালি আর নতুন কাগজের গন্ধ। হাজার লোকের আনাগোনা। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকা কেজো অকেজো মানুষেরা। তিনতলায় উঠে বিশাল হলঘর, তুলনায় শান্ত। খোপ খোপ করা ঘরে বেশিরভাগই মধ্যবয়সি প্রৌঢ়, বৃদ্ধও— টেনশনহীন তাঁরা। কেউ লিখছেন, কেউ চা খাচ্ছেন, কেউ শুধুই পা তুলে আড্ডা মারছেন। একটা-দুটো বেয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দক্ষিণাদাই এর মধ্যে ব্যস্ত। বলিষ্ঠ তাঁর চেহারা। স্যুয়িং ডোরের ভেতরে তাঁর ঘর। স্তূপীকৃত কাগজ, মুখে গাম্ভীর্য কিন্তু সফলতার জৌলুস। হঠাৎ সবাই ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, বার্তা সম্পাদকের কাছে বিশেষ গৃহবার্তা আসায় চেয়ার ছেড়ে উনি দাঁড়ালেন, আমাদেরও দাঁড়াতে হল। স্যুয়িং-ডোর ঠেলে আমরা হলঘরে বেরিয়ে পড়লাম। ওখানে যাঁরা ছিলেন সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ঘরের ওই প্রান্তে জানালার দিক দিয়ে একজন বৃদ্ধ একটু ন্যুব্জ, হেঁটে এগিয়ে আসছেন। পিছনে পাঁচ-ছজন তাঁকে অনুসরণ করছেন। একজনের হাতে একটা বড় মাপের হালকা সবুজ-সাদা রঙের একটা কিছু। আমি চকিতে কিছুই বুঝিনি! তিনি যখন প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছেন তখন বোঝা গেল ইনি তুষারকান্তি ঘোষ। তাঁর বাগানে বিশাল আকৃতির এক লাউ ফলেছে। তিনি অফিসে তা দেখাতে এনেছেন, গর্বিত বাগান-মালি সগর্বে লাউটির বর্ণনা দিচ্ছেন। লাউ-বাহক কর্মচারীটি তাঁর সঙ্গে তারিফ করে চলেছেন, আর নামজাদা সাংবাদিককুল, লেখককুল, লাউটির গুণমুগ্ধ স্তুতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা হলঘরটি। দুর্লভ প্রজন্মের ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাও ম্লান হয়ে যায় লাউটির ফুটে ওঠা, তুষারকান্তি ঘোষের বাগিচায়।

তুষারকান্তি ঘোষ ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে একটি অবিস্মরণীয় নাম। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এ প্রতিষ্ঠানটিকে কী করে গড়ে তুলেছিলেন ততটা জানি না। কিন্তু আমি ছেলেবয়স থেকে তুষারকান্তি ঘোষের প্রতিষ্ঠান অমৃতবাজার/যুগান্তরে যাতায়াত করেছি, কাজও করেছি। ওই প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু থেকে বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ মানুষ তুষারকান্তি ঘোষের গুণমুগ্ধ ছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা বহু ব্যাপারে ভারতবর্ষের সংবাদপত্র জগতে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁর প্রজন্মের কেউই ধরে রাখতে পারেননি সেই ধারা। আমার এই জীবনে দেখা সেই বিশাল প্রতিষ্ঠানের পতন সত্যিই অবাক লাগে। অতি বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, অসংখ্য দক্ষ কর্মী কেমন করে যেন হারিয়ে গেলেন! আমি তুষারকান্তিকে কাছাকাছি দেখেছি অনেকবার। রসিক, অমায়িক, আড্ডাবাজ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চকচকে অথচ অহংকারহীন। আমার স্কুলের একজন প্রাক্তনী হিসেবে এসেছিলেন আমাদের স্কুলে। সেদিনের স্মৃতি আমার কাছে আজও উজ্জ্বল।

শুধু যে কাজের তাগিদে রুজিরোজগারের জন্য এইসব সংবাদপত্র অফিসে যাতায়াত করতাম তা নয়, মনের তাগিদও অনুভব করতাম। সে-সময়ে সংবাদপত্র জগৎ কর্পোরেট অফিসের মতো ছিল না। অসম্ভব উজ্জ্বল সৃষ্টিশীল মানুষেরা কাজ করে যেতেন, আড্ডাও দিতেন। নানা ধরনের মানুষের আনাগোনা চলত। কত চমৎকার লেখা বেরত এঁদের কলমে। দক্ষিণারঞ্জন বসু, অনিল ভট্টাচার্য, অমিতাভ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, প্রফুল্ল রায়, বিমল কর, কানাই সরকার, আরও কত বাঘা-বাঘা মানুষ। কখনও শিবরাম, কখনও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, এমনকি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ঘোরাঘুরি করতেন এইসব জায়গায়। কত বড় হৃদয় ছিল তাঁদের। মালিক-কর্মচারীর সম্পর্ক ছিল না। মালিকরা অনেক সময় সাংবাদিকের টেবিলের সামনে বসে কথা বলতেন।

সেই নিউজ প্রিন্টে ছাপা কাগজ আজও প্রকাশিত হয়। কলমচির অভাব নেই। বাহ্যিক চেহারায় প্রযুক্তির ঝকঝকে ভাব, কিন্তু গোটা সংস্কৃতিটাই বদলে গিয়েছে। যেটা ঘাটতি তা হৃদয়ের, আবেগের, মানসিকতার।

বঙ্গসংস্কৃতি উৎসব, সাহিত্য পুরস্কার, এসব আয়োজনের সূচনাও হয়েছিল এইসব পত্রিকা গোষ্ঠী থেকেই। তখন বাংলা ছিল, বাঙালি ছিল। একান্ত বাংলা, একান্ত বাঙালি। খোলা মন আর উদারতায় খামতি ছিল না। সেই নিউজ প্রিন্টে ছাপা কাগজ আজও প্রকাশিত হয়। কলমচির অভাব নেই। বাহ্যিক চেহারায় প্রযুক্তির ঝকঝকে ভাব, কিন্তু গোটা সংস্কৃতিটাই বদলে গিয়েছে। যেটা ঘাটতি তা হৃদয়ের, আবেগের, মানসিকতার। এটা আমার অনুভব।

এঁরা বাঙালির দৈনন্দিন সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি জীবনে প্রভাব ফেলেছিলেন। দু-একজন ছাড়া কেউই ঠিক কমিউনিস্ট ছিলেন না। একটা আবহ ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধী আর একটা প্রতিষ্ঠানমুখীদের। এখন বুঝতে পারি বাস্তব আর দর্শন কত তফাত। ক্ষমতা আর আদর্শে কত তফাত। মানুষের কথা ভাবা কত কঠিন।

আমার ভবিষ্যৎ তখন কী আমি জানি না। বাবার জগৎ, সংসারের গতিপথ থেকে আমি বিচ্যুত। সংবাদপত্র ঘিরে এইসব মানুষই আমার অভিভাবক, রক্ষক। তাঁরা যেমন প্রশ্রয়ও দেন, আবার শাসনও করেন। এর ফাঁকে ফাঁকে সংগঠন করি, ছোটদের নিয়ে রাত, দিন কেটে যায়। ফুরসতহীন পরিশ্রম। মনে আছে ছোটদের নিয়ে ওয়াই-এম-সি-এ কলেজ স্ট্রিট শাখার হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। ছোটদের নাটক শিখিয়েছি— হিংটিং ছট। আমার কিছু বন্ধু ছিল, তারা আমাকে সাহায্য করত। কিন্তু গোটা দায়িত্বই থাকত আমার মাথায়। হলভাড়া থেকে অতিথি আপ্যায়ন করা টাকাপয়সা জোগাড় করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের বোঝানো, অনুষ্ঠান অলংকরণ সবই আমায় করতে হত। কিন্তু ওই দু-চারজন বন্ধু যাদের ডাকলে কাছে পেতাম, সেইসব সঙ্গী পাওয়াও কম কী! অনুষ্ঠানে একবার দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, যুগান্তরের বার্তা-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু, আর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের শিবরাম চক্রবর্তীকে। দক্ষিণাবাবু শর্ত দিয়েছিলেন যাতায়াতের ভাড়া চুকিয়ে দিতে হবে। শিবরাম চক্রবর্তীর ওসবের বালাই ছিল

না। উনি হেলেদুলে যাতায়াত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। অনুষ্ঠানের দিন সকালে স্টেজ রিহার্সাল হয়ে গিয়েছে। বিকেলের দিকে যখন আয়োজন প্রায় শেষ— সন্ধ্যার মুখে অনুষ্ঠান শুরু হবে। দক্ষিণাবাবু বাগবাজার থেকে এসে পৌঁছেছেন। একপিঠের ভাড়া ছ-টাকা। ঢুকেই চেয়ে নিলেন বারো টাকা। আমি নিয়ে গিয়ে স্টেজে বসিয়ে দিলাম। পর্দা তখনও খোলা হয়নি। শিবরাম চক্রবর্তী এলেন। প্রথমে স্টেজে উঠতেই অনিচ্ছা তাঁর। রাজি করিয়ে স্টেজে তোলা হল, বসলেন। ইতিমধ্যে হলঘর ভরে গিয়েছে কচিকাঁচাদের উপস্থিতিতে। বিশেষ অতিথিরা স্টেজ ভরিয়ে দিয়েছেন। দু-চার কথা হওয়ার পর সমবেত সঙ্গীত হল। তারপর শিবরাম চক্রবর্তীকে অনুরোধ করলাম 'সবুজ বাহিনী'র অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছু বলতে। উনি মাইকের কাছে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে বলতে শুরু করলেন, এইসব কচিকাঁচা আমাদের মতো পাকাদের কথা কী শুনবে? ওদের উদ্দেশে বললেন, কক্ষনো পাকাদের কথা শুনো না তোমরা। বরঞ্চ এক কাজ করি, বলে পকেট থেকে কড়কড়ে একটা দশ টাকার নোট বার করে ভিড় করা কচিকাঁচাদের উদ্দেশে বললেন, এই দশ টাকা আমি দিচ্ছি, স্টেজে-বসা বাকি বন্ধুদের অনুরোধ করব তারাও পাকা পাকা কথা বলার চেয়ে কিছু কিছু টাকা দিয়ে একসঙ্গে করে লজেন্স কিনতে। সব টাকা মিলে যে লজেন্স হবে সেই লজেন্স তোমরা খাবে সব্বাই, বক্তৃতা শেষ। স্টেজে বসা বাকিরা সকলেই এই পরিস্থিতিতে শিবরামকে অনুসরণ করলেন, এমনকি দক্ষিণারঞ্জন বসুও।

এইভাবেই ছবিজীবনের পাশাপাশি নিজের জীবনের রসদ সংগ্রহ করে বেড়াতাম নানা অছিলায়। মানুষকে দেখা, মানুষকে জানা, বোঝার ব্যাপারে আমার আবাল্য কৌতূহল। খাবারটা বাড়িতে জুটে যেত। আশ্রয় ছিল, তাকে পুঁজি করে জীবনের আসল মূলধন সংগ্রহ করতাম এইভাবে। কিছু নিয়ে মেতে থাকা। কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পরিচিত হওয়ার প্রবৃত্তিতেই আমি সংগঠনের কাজ করতাম। ছবিই আমার পরিচয়। কিন্তু ছবির মধ্য দিয়ে আমি কতটা পথ হাঁটতে পারব, সে পথের শেষ কোথায় সে পথের উপযুক্ত পথিক আমি হয়ে উঠতে পারব কিনা, আমার সুপ্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হবে কিনা, সে ফুলের গন্ধে সুরভিত হবে কিনা এইসব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তখন আমার সমাজের গণ্ডি ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু কিছু কিছু চরিত্র, কিছু কিছু মানুষ, আমার জীবনে এমন ছাপ ফেলে গিয়েছেন তাতে আজও নিজেকে বর্ণময় মনে করি। শিবরাম চক্রবর্তী— তাঁর সঙ্গে সেই কবে আলাপ। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে আমি যাব কিছু

শিবরাম চক্রবর্তীর বাড়িতে তাঁর পোর্ট্রেট আঁকছেন লেখক

কিনতে। আমার বাড়ি থেকে গলি পেরোলে ট্রাম রাস্তা। ওই পারে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। সেই কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের বিশাল বিশাল সাইনবোর্ড, জওহরলাল-পান্নালাল, কমলালয় স্টোর্স, শাল মিউজিয়াম। কাঠ কেটে মোটা মোটা অক্ষর তৈরি করে তাতে সোনালি রং করে লেখা থাকত— 'কমলালয় স্টোর্স'। কী রমরমা সেইসব দোকানগুলোর, আর কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। খানিকটা জয়পুরি, খানিকটা ইসলামি স্থাপত্যের অনুকরণে, মেটে লাল রঙের গম্বুজ-ওলা প্রধান ফটক। আমি তখন এতই ছোট চট করে ট্রাম রাস্তা পেরোবার সাহস ছিল না। এদিক-ওদিক চেয়ে কোনওরকমে রাস্তা ডিঙিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ি। একজন আলুথালু পোশাকের মোটাসোটা লোক আমাকে খপ করে ধরে ফেলে। বড় বড় চোখ, উল্টে আঁচড়ানো কাঁচাপাকা চুল। আমাকে বলতে থাকেন, 'আমাকে তুমি কি চিনতে পারছ? আমি কিন্তু তোমাকে চিনি'। আর কিছু না বলে ধরে নিয়ে গেলেন লজেন্সের দোকানের সামনে। একমুঠো লজেন্স কিনে নিয়ে গেলেন পরের বাজারে। সেখানে প্রচুর ফলের দোকান, কিনলেন আপেল আর একগুচ্ছ আঙুর ঠোঙা ভর্তি করে, তারপরে বাজার ঘুরে আমাকে বললেন, 'তোমাকে পরশু দেখেছি রাজভবনে। সাহেব তোমার কপালে চুমু খেয়ে এঁটো করে দিয়েছেন, আমি তোমার গালে আদর করি।' সাহেব মানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভরোশিলভ। রাজভবনের অনুষ্ঠান ছিল ইসকাস-এর। শিবরাম চক্রবর্তী সেই সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন। তখন তো জানতাম না, উনি কে। সেদিনও জানতে পারিনি। উনি পরে ট্রাম রাস্তা পার করিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নেন। সেই শিবরামকে পরে নানাভাবে দেখেছি। নানান অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে গিয়েছি। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে তাঁর মেসবাড়িতে প্রায় যেতাম। পরবর্তীকালে এখানে-ওখানে তাঁর গল্পের ইলাস্ট্রেশন করতাম। মনে আছে আনন্দমেলায় শারদীয় সংখ্যায় পূর্ণেন্দু পত্রী ওঁর এক বড় গল্পের অলংকরণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তখন সবে অফসেটে পত্রিকা ছাপা শুরু হয়েছে। জলরঙে যা কিছু করার সুযোগ পেয়েছি আমরা। তাঁর মজার গল্পের ছবি করেছি আমি। তারপরে একদিন সদাহাস্যময় এই দিলদার মানুষের কী অসহায় অবস্থাও দেখেছি। উনি কখনও কারও দোষ দেখতেন না। কতবার আমাকে বলেছেন, প্রেমেনের (প্রেমেন্দ্র মিত্র) কথা, অচিন্ত্যর (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) কথা, আর হরপ্রসাদ মিত্রের কথা। প্রেমেনের বউ তাঁকে মাছের মুড়িঘন্ট খাইয়েছেন। হরপ্রসাদ কত ভালো মানুষ— এইসব বলতেন। কলেজ স্ট্রিট বাটার সামনে ওঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেয়েছি কতবার। কলেজ স্ট্রিটেই একটা ড্রাই-ক্লিনিং-এ ওঁর সঙ্গে গিয়েছি। সেখানে উনি পাঞ্জাবি কাচাতেন। সেখানে গায়ে দেওয়া পাঞ্জাবি খুলে রেখে পরে নিতেন অনুরূপ ইস্তিরি করা পাঞ্জাবিটি। সংসারে এমন হৃদয়বান সন্ন্যাসীতুল্য মানুষ দেখিনি। যিনি রাজনীতি থেকে দর্শন, বাস্তব থেকে স্বপ্নে অনাবিল বুদ্ধিদীপ্ত নকশায় অনায়াসে পদচারণা করতে পারতেন। পাঁকে থেকেও তিনি পাঁকাল মাছের মতো। নাহলে কী করে সংসার নিয়ে এত কৌতুক করতে পারতেন? মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে আমার কাছে মাংস-ভাত খেতে চেয়েছিলেন। খেতে বড় ভালোবাসতেন। তথাকথিত ভাইপো-ভাইঝি নামক স্বজনেরা সুযোগ বুঝে সব লুট করে নিয়েছিল। রয়্যালটি বলে তাঁর কিছু ছিল না প্রায়। অল্প টাকায় বেচে

দিতেন পাণ্ডুলিপি। সেই টাকায় মেসভাড়া, খাওয়ার খরচ, ওষুধ, আর ভাইপো-ভাইঝির আবদার মেটানো। ভবিষ্যতের চিন্তায় দিন কাটাননি, মাথা ঘামাননি। মানুষকে ভালোবেসে কোনও প্রতিদান চাননি। আমি লেকটাউনে নিয়ে গিয়ে ওঁকে আনন্দ করে মাংসের ঝোলভাত খাইয়েছিলাম। এক সকালে সহায়সম্বলহীন আনন্দময় সেই শিল্পীর ছবি এঁকেছিলাম। তেলরঙে। পশ্চিমদিক থেকে পড়ন্ত রোদের আলো চোখের দু-দিকে এক অদ্ভুত অর্থবহ চাহনি করে তুলেছিল। সে চোখের আকারে, দৃষ্টিতে কোথায় যেন নজরুল ইসলামের মিল ছিল। আমি আমার মতো ধরার চেষ্টা করেছিলাম তা। এঁদের কি আমার ছবিজীবন থেকে ভুলে যেতে পারি?

আর্ট কলেজের জীবনটা অনিশ্চয়তার সঙ্গে টানাটানি আর অনিয়মের দিনগুলি। খাবার ঠিক নেই। বাড়ি ফেরার ঠিক নেই। একটা মহলে আমি পরিচিত সম্মান পাই, ভালোবাসাও। পরিশ্রম করে যাই খুবই। রোদে, ঝড়ে, জলে চলে অবিরাম চর্চা। কিছুরই অভাব বোধ করি না। শরীর খারাপ হয়। জ্বর। প্রবল জ্বর। কাশি। কাশি থামতে চায় না। একদিন কাশতে কাশতে রক্ত বেরিয়ে আসে। খুব দুর্বল হয়ে পড়ি। ডাক্তার সুকুল ভর্তি করে দেন শালবনিতে চন্দ্রকোণা রোডে সরকারি স্যানিটোরিয়ামে। সে এক অন্য ভুবন। ডাক্তার নার্স আর শয্যাধারীরা আমায় খুব ভালোবাসেন, আমি যেন তাঁদের কাছে অন্য গ্রহের বাসিন্দা। চারদিকে শালবন, সন্ধ্যায় সাঁওতালি গান ভেসে আসে। কোনও কোনও দিন এক মাতাল বাঁশিবাদক টিবিতে বসে একমনে বাঁশি বাজায়। বিস্তীর্ণ স্যানিটোরিয়ামের গন্ধ বর্ণ সব আলাদা তখন। কারও সঙ্গে যোগাযোগের কোনও উপায় নেই। আমি যেন নির্বাসিত অন্য কোনও দ্বীপে। যেখানে শহুরে কোনও স্পর্শ নেই। ক'মাস পরে ভালো হয়ে ফিরে আসি। একটু সাবধানে চলা, একটু সচেতনে থাকা। আবার ঘড়ির কাঁটা আমার মতো হয়ে যায়। আকাঙ্ক্ষা আছে, পরিকল্পনা-পথ জানা নেই। বাড়ি থেকে কোনও রসদই পাই না। বাবার অমতে অন্যপথে চলে গিয়েছি। আর্ট কলেজের খরচ, রং-তুলির আর যোগাযোগের খরচ এই নিয়ে সাকুল্যে একশো টাকা জোগাড় করতে পারলেই আমি ধনী। রোজগারের সূত্র— কলেজ স্টিট পাড়ায় বইয়ের মলাট আঁকা, কাগজে ইলাস্ট্রেশন করা আর সুযোগ পেলেই পোর্ট্রেট আঁকা। পয়সা নিয়ে যত প্রচ্ছদ করি তার চেয়ে অনেক বেশি করি বিনেপয়সায়, কবি-বন্ধুদের আব্দারে। কবি-বন্ধুদেরই বা দোষ দিই কী করে। তাদের স্বপ্ন তো একটা বই প্রকাশ। কে আর কেনে? তাই প্রচ্ছদ আঁকানোর জন্যই শুধু তাড়া। বেরিয়ে যাওয়ার পর সে কবি-বন্ধুর কোনও হদিশই পাই না। চমকে যাই যখন বছর ঘুরে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংয়ে টাঙানো পুরনো বইয়ের ভিড়ে আমার আঁকা প্রচ্ছদ দেখতে পাই। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি! বিনা পয়সার কাজ করার এটাই প্রাপ্য।

মুক্তমেলার কথা মনে পড়ে যায়, তখনও আর্ট কলেজ শেষ হয়নি। আমাদের মহলে গুঞ্জন ছড়াল ময়দানে মুক্তমেলা হবে। এখনকার টাটা সেন্টারের উল্টোদিকে বিশাল বিশাল মেহগনি গাছের তলায় এক অন্য ময়দান। তুষার রায় আসত খুব আমাদের কাছে। ড্যাবা চোখ। তীক্ষ্ণ নাক। খয়াটে চেহারা। নেশা আর যতটা সম্ভব নিজেকে পোড়ানোর এক সচল মূর্তিমান। আলাপচারিতায় কখনও কবিতার কথা বলত না। সে যে এক মহাশিল্পী, বড় বড় অজুরা পায় রেস্তোরাঁয় কী হোটেলে— এইসব গুলঞ্চ ছিল তার মুখের ফুলঝুরিতে। ও-ই ছিল মুক্তমেলার অন্যতম নায়ক। গাছের গুঁড়িতে নানারকম পোস্টার সেঁটে একেকজন কবিতার গুণমুগ্ধ তরুণ-তরুণীকে জড়ো করে কবিতা, ছড়া পাঠ করে যেত। কোথাও কেউ গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা বাউলাঙ্গের। একেকজনকে ঘিরে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মানুষের ভিড়। একটাই প্রিন্ট মিডিয়া— যার থেকে খবর ছড়িয়ে পড়ত আগুনের মতো। তাকে ঘিরেই এরা জীবিকা-উপজীবিকার মন্দির করেছিল। কোথাও সুনীল গাঙ্গুলি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বেলালদা আর তুষার রায়। অ-অনুকরণীয় ভঙ্গিতে, উচ্চারণে কবিতা আওড়াত। কলকাতায় বসন্ত এসেছে/কলকাতায় বসন্ত এসেছে.../প্রাচীরে প্রাচীরে হোর্ডিং/বসন্তের টিকা নিন কিংবা প্রেমিকের উদ্দেশে... 'তুমি ভাঙা বাথরুমে ঝকঝকে মুতের বেসিন'।

আমি মতলব করলাম, এই জমাটি মেলায় আমার অস্তিত্বের একটা কিছু প্রমাণ রাখি। কোনও এক গাছের ডালে পোস্টার আটকে দিলাম, 'আপনার ছবি আঁকান পাঁচ মিনিটে দু'টাকার বিনিময়ে'। সেই প্রথম কলকাতায় প্রকাশ্য রাস্তায় পোর্ট্রেট আঁকার বিজ্ঞাপন। একটা ঝোলা তাতে সাইজে কাটা একগুচ্ছ নিউজপ্রিন্ট আর সিক্স-বি পেনসিল। সঙ্গী তখন অসি আর রতন। খুব ভিড় হতে লাগল। আমি চটপট এঁকে ফেলি, একের পর এক পোর্ট্রেট। ঘাড় তোলার অবকাশ নেই। তিনটে থেকে ছ'টা। অন্ধকার নামতেই লোকেরা চলে যায়। গড়ে পনেরো থেকে কুড়িটা ছবি আঁকি। উইক-এন্ডের রোজগার জমে ওঠে। তারপর একদিন বসেছি যথারীতি। লোকজনের ভিড় হতে শুরু করল। আমি একটা কী দুটো কাজ করেছি মাত্র হঠাৎই বিকট শব্দে একটা বোমা ফাটল। সব লোক ছুটতে শুরু করল। আমি ব্যাগ গুটিয়ে কাগজ, বোর্ড আর কোনওরকমে ঝুলি নিয়ে দে দৌড়। চটি হারিয়ে গেল!

তখন নকশাল মাথাচাড়া দিয়েছে। কলেজ ক্যান্টিনে গুজরান। এইসব বুর্জোয়া সি আই-এর দালালরা মুক্ত মেলাটেলা করে। এদের শায়েস্তা করতে হবে। আমার সব ঘুলিয়ে যায়। যারা এসব বলে তারা খুব গরিবঘরের ছেলেমেয়ে নয়। বাবার পৃষ্ঠপোষকতায় অতিপুষ্ট বিপ্লবী। আমার জীবনসংগ্রামে বাধা হয়ে যায়। আর আমরা তো কাউকে মদত দিতে চাইনি! দু'টাকার বিনিময়ে ছবি আঁকব তার একটা জায়গা করে নিয়েছিলাম। হাংরি জেনারেশনের কিছু কবি এটার পরিকল্পনা করেছিল। এসব নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি, বুঝতেই চাইনি।

কলকাতায় আমার এই পোর্ট্রেট আঁকা কিছুটা প্রচার পেল। অনুষ্ঠান, মেলায় আমার ডাক পড়তে লাগল। এরকমই দেশপ্রিয় পার্কে এক বিরাট মেলা-জলসার আয়োজনে ওখানকার সংগঠকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ এসব ভালোবাসেন। সেই মতো আমি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাই। ছবি আঁকা শুরু করি, বেশ খাতির পাই। লক্ষ করি, একটি নিটোল চেহারার মিষ্টি মেয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা দ্যাখে। প্রতিদিন সে আমার পৌঁছনোর আগে দাঁড়িয়ে থাকে, বোধহয় ভল্যান্টিয়ারের দায়িত্ব পেয়েছে আমায় সাহায্য করার জন্য। ছবি হলে ঠিকঠাক পয়সা চেয়ে নেওয়া, কাঁধের ঝোলা ঠিক করে দেওয়া, এসবেই আমার মনের শরীর অনুরণিত হতে লাগল। তারুণ্যের প্রায় শেষ। যৌবন জানান দিচ্ছে। আনমনা হয়ে যাই। মনে মনে ভাবি, মেয়েটি কী সুন্দর! ও হয়তো আমায় একটু আলাদা ভাবে। দিন যায়। মেলা শেষ হওয়ার সময় চলে আসে। পয়সা রোজগারের চেয়েও মেলা আমায় টানে সেই মেয়েটির জন্য। সেও প্রতিদিন আসে, শেষপর্যন্ত থাকে। কাজ ছাড়া শুধু একদিন বলে, শেষের দিন আমাদের এখানে পিকনিক হবে সেদিন আপনাকে আমার মা-বাবার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেব। আমাদের বাড়ি তো কাছেই। নিয়ে যাব একদিন। আমি শেষদিনটা তাড়াতাড়ি যাই। শেষদিনে ভাঙা মেলা। আমি আগে-আগেই পৌঁছে যাই। সকলেই খুব ব্যস্ত। আমার ছবি আঁকায় মন নেই। তাকে খুঁজছি। মেলায় ব্যস্ত সকলে শেষদিনের খাওয়া-দাওয়া হইচইয়ে মেতে আছে। আমি এদিক-ওদিক অনেক খোঁজ করেও সেদিন তাকে খুঁজে পেলাম না। তবে শরীরী স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম। সন্ধে শেষ হলে কোলাহলের মাঝ দিয়ে আমি মেলা ছাড়লাম। এদিক-ওদিক চাইলাম। সে তো

বলেছিল, তার বাড়ি তো কাছেই, কিন্তু কোন কাছে? আমি তো তার ঠিকানা জানি না!

যেমন ঝড়ের আগে, কোনও অসময়ের আগে প্রকৃতি থমথমে হয়ে যায়, মানুষের মনে এক অজানা উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার থেকে অন্যরকম করে দেয়— এই সময়টা ওইরকম ছিল। উগ্র কমিউনিস্টদের দাপাদাপি, নকশালবাড়ির আন্দোলন তখনও তেমন দানা বাঁধেনি। ভেতরে ভেতরে গুপ্ত বিপ্লবীরা। আমরা যারা কলেজ স্ট্রিটে জীবনযাপন করি, অলিগলি-স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি আর নতুন-পুরনো বই, লেখক, প্রকাশক আর চিন্তাবুদ্ধির মানুষদের পেশা, জীবন আর স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকার জায়গা এই সেই কলেজ স্ট্রিট। নানা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের হর্ম্যগুলি উলম্ব হয়ে থাকে। কৃষ্ণদাস পালের স্ট্যাচু ঘেরাও করে রাখে পসারিরা। বড়লোকের ঘরের ছেলেরা মেতে ওঠে সমাজ বদল করার কাজে। কে বা কারা যে তাদের প্রাণশক্তি, জানি না। কিন্তু অধিকাংশই যে আমার সহপাঠী, পরিচিত, এলাকার বন্ধু কিংবা বন্ধুর বন্ধু তা জানি। এরাই যেন স্বঘোষিত মাও-সে-তুং, হিটলার কিংবা স্ট্যালিনের অনুচর। রাজনীতি নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাইনি। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে। অন্যায় দেখে চুপচাপ থাকা উচিত নয়। ভেতরে ভেতরে একটা প্রতিবাদী মন সহায়সম্বলহীন তারুণ্যে আমি জারিত রাখতাম।

একদিকে রক্ষণশীল পরিবার, বাবার গম্ভীর অনুশাসন— যেখানে কোনও পারিবারিক প্রশ্রয় নেই, আবার অন্যদিকে তথাকথিত বন্ধুও আমার ছিল না। খেলাধুলো, আড্ডায়, পাড়ার রকে কিংবা পাড়ার কাজে কখনও অভ্যস্ত হইনি। রক্ষণশীলতার অদৃশ্য দড়ি আমার গলায় বাঁধা ছিল। একদিন স্কুলের বন্ধুরা খবর পাঠাল স্কুলের একশো পঁচিশতম উৎসব উদ্‌যাপন হবে। প্রাক্তনীরা এর মাতব্বর। আমাকে যোগ দিতে বলল। মনে আছে আর্ট কলেজ কামাই করে এক দুপুরে স্কুলের একতলায় একটা ঘরে আমরা কতিপয় বন্ধুরা কী কী অনুষ্ঠান করব তার আলোচনায় বসেছিলাম। একদিকে রোমাঞ্চিত হচ্ছি এই সেই স্কুল— যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হত, সেই স্কুলে আমরা কতটা দাদাগিরি করতে পারছি। এরই মধ্যে হঠাৎ এক বন্ধু কথোপকথনের মাঝে কীসব স্লোগান দিয়ে আমাদের সাবধান করে দিল, যেন আমরা কিছু বুর্জোয়া কাজ না করি। ওদের পার্টিলাইন মেনে কাজ করি। আর বলল, সে তার বাবার কারখানায় শ্রমিকদের হয়ে হুলিয়া জারি করেছে। বলেছে, যদি শ্রমিকরা ন্যায্য সময়ের বেশি কাজ করে, আর তার বিনিময়ে তাদের নির্ধারিত টাকা না পায় তাহলে কারখানা জ্বালিয়ে দেবে। আমার অদ্ভুত লাগল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি বলে ফেললাম, তোরা কী ভাবিস? আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম করিস। আমাদের দেশটায় বহু স্বাধীনচেতা মানুষ জন্মেছেন। দেশের মানুষের মর্যাদা, আত্মসম্মান, ধর্ম, সংস্কৃতি এগুলো বিবেচনা না করে হঠাৎ হঠাৎ কীসব শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারার চেষ্টা করিস কেন? এই জাতীয় কিছু কথা বলে ফেলেছিলাম। সেই বন্ধুটি আমায় তেড়ে এসেছিল। ঘরটা থমথমে হয়ে উঠেছিল। অন্য বন্ধুরা আমার চোখমুখের দিকে তাকাল না। আমি সেদিন কাজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে চলে যাই। বন্ধুরা বোধহয় আমাকে চিহ্নিত করে ফেলেছিল।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমার ছবির প্রদর্শনী আর আমার আঁকা হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন বিখ্যাত মানুষদের পোর্ট্রেট তিনতলার বড় ঘরে টাঙানো হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন থেকে বিজ্ঞানী সত্যেন বোস পর্যন্ত বহু কালজয়ী মানুষ হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমি জলরঙে রেখা-প্রধান ছবি এঁকেছিলাম প্রায় কুড়িটা। স্কুলের প্রাক্তনী শংকরপ্রসাদ মিত্র সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। তাঁর ছেলে মনোজিৎ আমার সহপাঠী। শংকরপ্রসাদ আমায় খুব স্নেহ করতেন। প্রায়ই হ্যারিসন রোডে শিয়ালদার মুখে মনোজিৎদের বাড়িতে যেতাম। ওঁর বিশাল চেম্বারে মাঝে মাঝে ডাক পড়ত। বিধান রায়ের আমলে তিনি ছিলেন আইনমন্ত্রী। উনি এসেছেন উদ্বোধন করতে। আমি তাঁকে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখাই। একপাশে আমার তেলরঙে, জলরঙে আঁকা আর্ট কলেজের ছবিচর্চার নিদর্শন, পনেরোটা ছবি। সব মিলে আমারই ঘর। কিছু শিক্ষক, কিছু অভিভাবক মিলে পঁচিশ-তিরিশ জন আমরা শংকরপ্রসাদ মিত্রকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখাতে থাকি। এমন সময় দু-তিনটি অল্পবয়সি ছেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে খবর দেয়, শুভাদা, তোমাকে একতলায় কয়েকজন ডাকতে এসেছে। কেন কী জানি ভেবে ওই অবস্থাতেই ছেলেদের ডাকে প্রদর্শনীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই। বেশ কয়েকজন ছেলে আমার সঙ্গে জুটে যায়, নেমে পড়ি একতলায়। গিয়ে দেখি, সেই পরিচিত বন্ধুরা দাঁড়িয়ে, আরেকটি অন্য ছেলে। বন্ধুরা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেনি। হুংকার ছাড়ে অজানা-অচেনা-হৃষ্টপুষ্ট নীল টি-শার্ট গায়ে ছেলেটি। পরে জেনেছি, তার নাম আলম। হেয়ার স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র।

আমাকে একটু উঁচু গলায় হাতের ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলে। নিয়ে যায় উল্টোদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে। ট্রামরাস্তা ক্রস করে প্রেসিডেন্সির গেটে ঢুকি। আমাকে ঘিরে আছে চার-পাঁচজন। নেতৃত্ব দিচ্ছে আলম। নিয়ে যায় প্রেসিডেন্সির মাঠে, মাঝামাঝি সিমেন্ট বাঁধানো টেনিস কোর্টে। প্রায়ান্ধকার মেঝেতে বসতে বলে। সেখানে কুড়ি-বাইশজন সুবেশ অধ্যাপক-শিক্ষক শ্রেণীর মাঝবয়সি মানুষেরা বসে আছেন। হয়তো কেউই আমার পরিচিত নন। আবার হুংকার ছাড়ে আলম, আমার বিষয়ে উগ্র অশ্লীল কিছু কথা বলে। আমার শরীর প্রায় অবশ হয়ে আসে। ইশারায় বসে-থাকা মানুষদের কেউ একজন আমায় বসতে বলেন। আমি বসে পড়ি। টানা আলোচনা চলে। কানের দু'পাশ দিয়ে বয়ে যায় সেই সব শব্দকথা। শুধু মনে আছে নেহরু, গান্ধি বুর্জোয়া আর চিনের ম্যাকমোহন লাইন। ভারত যে চিনের প্রতি অন্যায় করেছে, মাও-সে-তুং যে মানুষের মুক্তির পথ এইসব কথা— ভারত যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে চিনকে আঘাত হানার চেষ্টা করছে— এইসব, এইসব। কখন কেটে যায় দেড়ঘণ্টা। আবার এসে দাঁড়ায় আলম। চিৎকার করে তদ্ভব শব্দে বলে, তাদের যদি ভবিষ্যতে কোনও সমালোচনা করি তাহলে আমার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেবে। একজন বসে-থাকা ভদ্রলোক হাতের ইশারায় থামতে বলেন। আমার উদ্দেশে বলেন, আপনাদের মতো যুবকদের আমরা আহ্বান জানাই। আসুন চেয়ারম্যানের পথে আমরা বুর্জোয়া-সমাজকে বদলে দিই। একাজে আপনাদের সঙ্গী করতে চাই।

মনে হল, ওরা আমায় ছুটি দিলেন। উঠে পড়ি। কেমন যেন ঘোরে আছি। আমার হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছে। কোনওরকমে উঠে পড়ে এগোতে থাকি গেটের দিকে। আলম আমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কোনও কথা হয় না তার সঙ্গে। গেটের কাছে সেই কয়েকজন বন্ধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমি বেরিয়ে এলে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বলে দেয়, খুব সাবধানে আচার-আচরণ করতে। অন্যথা হলে খতম-তালিকায় পাঠিয়ে দেবে। আমি পরিত্রাণ পাই।

ক্রমশ

গত সংখ্যায় 'আমার ছবিজীবন' ধারাবাহিক রচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ছাপা হয়েছে: বিজয় সিং নাহার, অজয় মুখার্জি, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেন, অতুল্যবাবুরা জড়ো হবেন সেখানে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বদলে আশু ঘোষ পড়তে হবে। আশু ঘোষ ছিলেন তৎকালীন বিধান রায় মন্ত্রিসভার একজন ডাকাবুকো মন্ত্রী।

সীতবিতান ছুঁয়ে বলছি

সমরেশ মজুমদার

পূ র্বা নু বৃ ত্তি

পড়াশোনা করার জন্য বাবা-মা পাঠিয়ে দিলেন জলপাইগুড়িতে পিতামহ এবং বিধবা পিসির সংসারে। পাশের বাড়ির কমলা কাকিমার জন্য বই কিনে আনতে গিয়ে স্বপনকুমার ও শশধর দত্তের গোয়েন্দা গল্পের সঙ্গে পরিচয়। পরে ঝুমুরদির কথায় নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'কালো ভ্রমর' পড়া এবং বাবুপাড়া পাঠাগারে নাম লেখানো। সেখানে নীপা নামের এক শ্যামবর্ণা কিশোরীর সঙ্গে আলাপ, 'শেষের কবিতা' পড়ে লাবণ্যের সঙ্গে বন্ধু নিশীথের মায়ের মিল খুঁজে পাওয়া। সন্ধেবেলা তিস্তার পারে বন্ধুদের আড্ডায় নারীকণ্ঠে হাসি শুনে কাশবনের আড়াল থেকে চোখে পড়ল ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করতে বিবস্ত্র হয়ে জলে নেমেছে বেশ কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে। নগ্ন নারী-শরীর দেখা সেই প্রথম। এদিকে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রাতে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে যেতে হয়েছে। এরপর একদিন অসুস্থ নীপাকে 'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' দিতে ওদের বাড়ি গেলে নীপা 'বনলতা সেন' কবিতাটি পড়তে বলল। মনে হল, বনলতা সেন খুবই চেনা। তিনি সিনেমার সেই নায়িকা। এদিকে নিশীথ আর স্বপনের প্রেমপত্র লিখে দিতে হয়। কোটেশনের জন্য নতুন নতুন বই চাই। হাতে এল 'সঞ্চয়িতা'। নীপার কথায় 'চাঁদের পাহাড়' পড়েও মুগ্ধতার শেষ নেই। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ প্রেমপত্রগুলি পড়ে বন্ধুদের প্রেমিকার অভিভাবকদের হাতে। স্কুলের শেষ পরীক্ষা শেষ হল। কলেজে ভর্তি হতে তিনদিন পরেই কলকাতা যেতে হবে। তার আগে লাইব্রেরিতে গিয়ে হাতে এল চিনা উপন্যাসের অনুবাদ 'রিক্সাওয়ালা'। সেখানে বারবণিতা পল্লির কথা পড়ে বন্ধুদের বলতেই তারা একদিন নিয়ে গেল বারবণিতাপল্লির মধ্য দিয়ে। পরিবেশ দেখে মনে হল, যেন উপন্যাসের পটভূমিটাই উঠে এসেছে বাস্তবে।

৯

স্কটিশ চার্চ কলেজের তিন বছর যা পেয়েছি তাই পড়েছি। পড়া না বলে গিলেছি বলাই ভালো। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক জগতের পাশাপাশি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার ভয়ঙ্কর বাস্তবের রস গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। কিন্তু গিললে যে তা হজম হবেই এই ধারণা পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মোরাভিয়ার 'দ্য উইমেন অব রোম' পড়ে যতটা চমকিত হয়েছি ঠিক ততটাই মুগ্ধ হয়েছি সমরেশ বসুর 'শ্রীমতী কাফে' পড়ে। কী করে এটা সম্ভব হয়েছিল জানি না। পরে বুঝেছি, সেটা ছিল আমার জীবনে আয়লার মতো পড়ার নেশা। ফলে যখন জল চলে গেল, সবকিছু ভাঙচুর। বেশিরভাগ নাম স্মৃতিতে থাকলেও বিষয় মনে নেই। গিলেছি কিন্তু হজম করতে পারিনি।

কলেজের তৃতীয় বর্ষে কফি হাউসের বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একটা উপকার হয়েছিল। বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে একটা হালকা আন্দাজ তৈরি করতে পেরেছিলাম। ছোটগল্পের যাদুকর মোপাসাঁ যত ভালোই লিখে থাকুন না কেন, গল্পের শেষে তাঁর ওই চমক তৈরি করে পাঠকদের অবাক করার পদ্ধতিটাকে পছন্দ করেননি বিজ্ঞজনেরা। তাঁদের মনে হয়েছে সাহিত্যের নির্মল আনন্দের বদলে একটু স্থূল উপায়ে পাঠকের চেতনায়

আঘাত দেওয়া হয়েছে।

মোপাসাঁর গল্পগুলো পড়ার সময় আমি সুবোধ ঘোষের গল্প পড়েছি। সেই 'অযান্ত্রিক', 'ফসিল', 'সুন্দরম' পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল মোপাসাঁর স্টাইলের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। সুন্দরম গল্পে মৃতা মহিলার লাশ পোস্টমর্টেম করছেন বৃদ্ধ ডাক্তার। এই অবধি গল্পটি ধীরে ধীরে যেভাবে পাঠকদের সম্মোহিত করছিল তা এক ঝটকায় বদলে গেল পরবর্তী সংলাপে। বন্ধ দরজার বাইরে বসে গল্প করছিল শব-গৃহের দুজন কর্মচারী। একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'বৃদ্ধ ডাক্তার আজ দেরি করছেন কেন?' দ্বিতীয়জন উত্তর দিয়েছিল, 'বুড়া লাতির মুখ দেখছে।' ঝট করে পুরো গল্পটির চেহারা বদলে গেল। একটা ভয়ঙ্কর রসে পাঠক হাবুডুবু খেতে লাগল।

এই যে শেষ লাইনে গল্পের চেহারা বদলে যাওয়া, এদেশে চালু হয়েছিল সেই উনিশশো তেইশ থেকে যখন 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সবাই এই পথ অনুসরণ করেছিলেন। এমনকি ওঁদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখক সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরীও এই ধরণের ছোটগল্প প্রচুর লিখে গিয়েছেন। এর একটা সুবিধে ছিল। ছোটগল্প পড়তে আরম্ভ করে পাঠক নিজে যে জগৎ তৈরি করে নিচ্ছিলেন তা শেষ কয়েকটি লাইনে ভেঙে চুরমার করে অন্য জগতে তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা যদি বাস্তবসম্মত এবং রসগ্রাহী ও সাবলীলভাবে করা যায় তাহলে সেই গল্প ও গল্পকারের নাম পাঠক দীর্ঘকাল মনে রাখতে বাধ্য হবেন। জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠা সম্ভব ছিল এইরকম লুকোচুরি খেলার মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' গল্পটির কথা। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই গল্পটির গোড়া থেকে লেখক পাঠকের সঙ্গে কোনওরকম লুকোচুরি খেলেননি। প্রত্যাশামতো পরিণতির দিকে গল্পটি এগিয়েছে। গল্পের শেষে কোনও মোচড় নয়, পাঠকের ভাবনাকে একটুও আছাড় না মেরে গল্পটিকে অন্যমাত্রা দিয়ে উত্তীর্ণ করেছিলেন লেখক।

পঞ্চাশের মাঝামাঝি থেকে বিদেশের সাহিত্যের নবীন ঢেউ এদেশীয় সাহিত্যে চলে এলেও তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। স্ট্রিম অব কনসাসনেশ আমাদের সাহিত্যকে কতটা প্রভাবিত করেছে সে-ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মনে পড়ছে না, এই কলমে সেই গল্পটির কথা বলেছি কিনা। বললেও আরেকবার বলার বাসনা সামলাতে পারছি না। পাঠক মার্জনা করবেন।

গল্পটি ছিল এইরকম। বাবা রেলে চাকরি করতেন। অবসর নেওয়ার পর প্রতি বিকেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে বের হন। সেই গোধূলিতে একটা ট্রেন যখন পাশের লাইনে ছুটে আসত তখন বাবা দাঁড়িয়ে যেতেন। দেখতাম ট্রেনের ড্রাইভার বাবাকে দেখে হাসিমুখে হাত নাড়ছেন। তৎক্ষণাৎ বাবার মুখে হাসি ফুটত। তিনিও তখন হাত নাড়া শুরু করতেন। পুরো ট্রেনটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় গার্ডের কামরা আসত। দেখতাম গার্ডসাহেব বাবাকে দেখে হাত নাড়ছেন। ট্রেন চলে যাওয়ার পর বাবাকে অত্যন্ত সুখী মানুষ বলে মনে হত। যেন তিনি যে সাম্রাজ্য ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন বয়সের কারণে সেখানে এখনও ঠিকঠাক রয়েছেন। হাঁটতে হাঁটতে বাবা আমাকে কত গল্প

শেষপর্যন্ত সন্তোষকুমার বলেছিলেন, 'মুশকিল হল কোনও কিছুর বিরোধিতা করতে হলে তাকে ভালোভাবে জেনে-বুঝে তবেই বিরোধিতা করতে হয়। ওরা শাস্ত্রটাকে ভালো করে আগে ভাবুক তারপর বিরোধিতা করুক। শাস্ত্রসম্মত একটি ভালো গল্প লেখার পর বিরোধিতার কথা ভাবুক।'

শোনাতেন। সবই তাঁর রেলজীবনের অভিজ্ঞতার গল্প। তারপর সেই দিনটা এল। তখন রোদ মরে যাচ্ছে। তিরতিরে গোধূলির আলোয় আমি আর বাবা রেললাইনের পাশ ধরে হাঁটছি। দূরে ট্রেনের ইঞ্জিন দেখে বাবা দাঁড়িয়ে গেলেন। হাসিমুখে হাত তুললেন ওপরে। কিন্তু দ্রুতগামী ইঞ্জিনটা যখন আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল তখন ড্রাইভার হাত নাড়া দূরের কথা, ভুলেও আমাদের দিকে তাকাল না। বাবা বিড়বিড় করলেন, 'বোধহয় নতুন ড্রাইভার।' তারপর গোটা ট্রেনের শেষে গার্ডসাহেবের কামরা চোখের সামনে চলে এলে বাবা প্রবলভাবে হাত নাড়তে লাগলেন। কিন্তু গার্ডসাহেব উদাসীন মুখে চরাচর দেখতে লাগলেন। ট্রেন চলে গেলে বাবা দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। দেখলাম, তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়েছে। চটজলদি ভেঙে পড়া মানুষটির হাত কাঁপছিল। তাঁর হাত ধরে বললাম, 'বাড়ি চলো।'

কোনও চমক নেই, কোনও ইচ্ছাকৃত মোচড় নেই। একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী যতই নিজেকে তাঁর পূর্ব পেশার অঙ্গ ভাবুন না কেন, নবীন প্রজন্মের কাছে তিনি ধীরে ধীরে এমন প্রাক্তন হয়ে যান যে তারা আর পরিচিত থাকেন না। এই তথ্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও নিষ্ঠুর সত্য। কিন্তু এই সত্য সবাই মেনে নিতে সহজে পারেন না। এই যে জীবনের পরম সত্য আবিষ্কার করার প্রয়াস তা যে-কোনও লেখকের পক্ষে কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। চেষ্টাটা যে কষ্টসাধ্য তা বোঝা যেত অনেকের ক্ষেত্রে। অথবা মনে হতো, লেখক পরিণতিটা চাপিয়ে দিয়েছেন।

অর্থাৎ ছোটগল্পের চেহারা, আঙ্গিক এবং গঠন খুব দ্রুত বদলাতে লাগল। কিন্তু এই বদলানোর সার্থক প্রতিনিধিত্ব খুব স্বল্প গল্পেই পাওয়া গিয়েছে। বরং মোপাসাঁ অথবা ও হেনরির ঘরানার গল্প লিখতেই শক্তিমান লেখকরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। একটু এগিয়ে গিয়ে বলছি, পরবর্তীকালে একটি লেখকগোষ্ঠী শাস্ত্র-বিরোধী গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন। ওঁরা চেয়েছিলেন নতুন সাহিত্য আন্দোলনের চেহারা দিতে। কয়েকবছর বেশ হৈচৈ করার পর তাঁরা মিইয়ে গেলেন যখন পাঠকদের অধিকাংশই ওই নতুনরীতি গ্রহণ করল না। এ প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের কথা মনে পড়ছে। যে-কোনও নতুন কর্মে উৎসাহ যোগাতেন ওই মানুষটি। শাস্ত্র-বিরোধী গল্পকাররাও প্রথমদিকে তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত সন্তোষকুমার বলেছিলেন, 'মুশকিল হল কোনও কিছুর বিরোধিতা করতে হলে তাকে ভালোভাবে জেনে-বুঝে তবেই বিরোধিতা করতে হয়। ওরা শাস্ত্রটাকে ভালো করে আগে ভাবুক তারপর বিরোধিতা করুক। শাস্ত্রসম্মত

একটি ভালো গল্প লেখার পর বিরোধিতার কথা ভাবুক।'

ভাবতে অবাক লাগে, কলেজজীবনে, গল্পগুচ্ছের গল্পগুলোর পাশাপাশি আমি 'পুনশ্চ'র কবিতাগুলোতেই গল্প আবিষ্কার করেছিলাম। করে বুঝেছিলাম যা কবিতায় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব তা ছোটগল্পের গদ্যে একেবারেই নয়। গত সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ক্যামেলিয়া' কবিতার গদ্যরূপটি আবার পড়লাম। তারপর আবার কবিতাটিও। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতায় গল্প লিখেছিলেন তখন রসগ্রহণ করার সময় কি আমি যুক্তি খুঁজেছিলাম? বিন্দুমাত্র নয়। পাঠক, মনে করে দেখুন। ট্রামে যখন কবি সেই মেয়েটিকে দেখলেন তখন কী স্বচ্ছন্দে লিখলেন, 'সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।' যে মেয়েটিকে আমি চিনি না, আগে দেখিনি, উঁকি মেরে দেখে নিয়েছি তার খাতার ওপর কমলা শব্দটি লেখা এবং ধরে নিয়েছি ওটাই তার নাম, কিন্তু পাশে যে বসে আছে সে তার ভাই তা জানব কী করে? ভাইকে নিয়ে সে কলেজের রাস্তায় যাচ্ছে এই অনুমান করার সময় একবারও ভাবব না, ভাইয়ের কি স্কুল নেই?

সেই যে মেয়েটি, যে ট্রাম থেকে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছিল, তাকে আর কখনওই কবি দেখতে পেলেন না নিত্য যাতায়াতের পথে। কিন্তু লিখলেন, 'খবর পেয়েছি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিংয়ে।' খবরটা পেলেন কার কাছে? মেয়েটির বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে হন্যে হয়ে ঘুরেছিলেন? ট্রামে দেখা একটি মেয়ে যে উধাও হয়ে গেল তার খবর পাওয়ার পিছনে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রয়োজন। তা কবি গেলেন দার্জিলিংয়ে। লিখে দিলেন, 'শোনা গেল আসবে না এবার।'

কার কাছে শুনলেন? দার্জিলিংয়ে কবির পরিচিত কেউ নিশ্চয়ই বলেছিল আপনি যাকে খুঁজছেন, সেই কমলা এবার দার্জিলিংয়ে আসবে না। সে কি মোহনলাল? যার বোন তনুকা। কবিতায় সেটা একবারও বলা নেই। আর কী আশ্চর্য, তনুকা ভক্ত হিসেবে কবিকে উপহার দিল যে গাছের চারা তার নাম ক্যামেলিয়া। কমলার সঙ্গে মিলে গেল ফুলগাছের নাম।

আর এই যে বিস্তর ফাঁক, জোর করে মেলাবার চেষ্টা, সাঁওতাল মেয়েটির কানের ওপর ক্যামেলিয়ার ফোটা ফুল গুঁজে দিলে আলো করবে তার গাল, এইটে মাথায় রেখে লিখে যাওয়া, গদ্যে তা সম্ভব নয়। অথচ কবিতা পড়ার সময় একটুও হোঁচট খেতে হয় না, বরং বিষণ্ণ মন একসময় ভোরের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়।

ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই জানতেন। তাঁর নাটক কবিতায় এই ব্যাপারে যা নিবেদন করেছেন তা হল, 'কবিতা হল সমুদ্র, সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি। ...গদ্য এল অনেক পরে। বাঁধা ছন্দের বাইরে জমানো আসর। সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল ঠেলাঠেলি করে। ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা এল জড়িয়ে মিশিয়ে। গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে আকাশে উঠে গড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ। ...এত অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ; পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে এর নানারকম গতি-অবগতি। বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে, অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ, গুরু-লঘু নানা ভঙ্গিতে।

পরিষ্কার হয়ে গেল। ছেঁড়া ছাতা আর রাজছত্র একত্রিত হয়ে যে সবক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠের দিকে যাবে তার বাধ্যবাধকতা নেই। ছোটগল্পকার ঠিক করবেন তার লক্ষ্য কী হবে। বৈকুণ্ঠের বদলে নরকও আসতে পারে স্বাভাবিক হয়ে। তৃতীয় বর্ষে অচিন্ত্যকুমারের লেখা 'কল্লোল যুগ' বইটি পড়লাম। তার আগে গৌরমোহনবাবুর ক্লাসে ভাসা ভাসা শুনেছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের দাদার একটি বড়গল্পকে প্রথম বাংলা ছোটগল্প বলা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস এবং রসরচনায় যতটা ধ্যান দিয়েছেন ছোটগল্পে ততটা নয়। ছোটগল্প তার চেহারা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' থিওরিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের ছোটগল্প অত্যন্ত নিচুমানের বলে আলোচনায় আসে না।

'কল্লোল'-এর লেখকরা গোকুল নাগের নেতৃত্বে সেই তথাকথিত শুদ্ধতার বেড়া ভেঙে নীচের তলার মানুষদের ওপরে তোলার চেষ্টা করলেন। তাঁদের সব গল্পই যে উতরে গেল তা নয়, কিন্তু দাগ রেখে গেল। 'কল্লোল' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রবীন্দ্রনাথ এই তরুণতর লেখক গোষ্ঠীর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আপ্লুত হয়ে স্থির করলেন তাঁকেও সময়ের সঙ্গে পা মেলাতে হবে। লিখলেন 'তিনসঙ্গী'-র গল্পগুলো।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে 'কল্লোল'-এর জন্ম। জন্মানোর অন্যতম উদ্দেশ্য নতুন কথা বলা। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ঘোরাফেরা করেছে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের সমস্যাগুলোর মধ্যে। আর শিলাইদহতে দেখা গ্রামের মানুষের জীবনযাপন যা তাঁর ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু শহরের বিত্তহীন অভাবী মানুষ, বস্তির মানুষ, মানুষের দৈনিক সমস্যা নিয়ে তিনি কিছু লেখেননি। 'কল্লোল'-এর লেখকরা গোকুল নাগের নেতৃত্বে সেই তথাকথিত শুদ্ধতার বেড়া ভেঙে নীচের তলার মানুষদের ওপরে তোলার চেষ্টা করলেন। তাঁদের সব গল্পই যে উতরে গেল তা নয়, কিন্তু দাগ রেখে গেল। অচিন্ত্যকুমারের 'দুইবার রাজা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' বের হওয়া মাত্র 'কল্লোল' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রবীন্দ্রনাথ এই তরুণতর লেখকগোষ্ঠীর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আপ্লুত হয়ে স্থির করলেন তাঁকেও সময়ের সঙ্গে পা মেলাতে হবে। লিখলেন 'তিনসঙ্গী'-র গল্পগুলো। কিন্তু যাঁর হাতে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি'-র মতো কালজয়ী গল্প বেরিয়েছে, তিনি 'রবিবার', 'শেষকথা' লেখার পর বুঝলেন ব্যাপারটা শৌখিন মজদুরি করা হয়ে গিয়েছে। স্বীকারও করেছেন একথা।

কলেজের প্রথম তিন বছরে ক্রমাগত গিলে গিয়েছি বাংলা সাহিত্যের অনেকখানি। এখন বুঝতে পারছি বেশ বদহজম হয়ে গিয়েছে ওইভাবে পড়ে যাওয়া। তাই আবার শুরু করেছি রবীন্দ্রনাথ। 'গীতবিতান' ছুঁয়ে ভাবি, গভীরে যেতে হবে, আরও গভীরে। ওপরের ঢেউ সাময়িক, যা কিছু স্থির তা গভীরেই থাকে।

আমাদের হ্যামলেট

বিভাস চক্রবর্তী

বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'অন্য থিয়েটার'-এর নবতম প্রযোজনা উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট'। নির্দেশনা বিভাস চক্রবর্তী। কিন্তু কেন এই সময় 'হ্যামলেট'? কোনও বিশেষ ব্যাখ্যা বা দৃষ্টিকোণ থাকবে কি?

বিশাল শেক্সপিয়র-সমুদ্রবেলাভূমিতে ছড়িয়ে থাকা অগণিত নুড়ির একটি মাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছি জীবনের সায়াহ্নে। সেই 'হ্যামলেট' নামক নুড়িটির কেমিক্যাল বা রাসায়নিক কম্পোজিশন আবিষ্কার করতে কত রসায়নবিদ বা রসিক হিমসিম খেয়েছেন বহুযুগ ধরে— সেখানে আমি তো ছারমাত্র। তবুও যেহেতু নাট্যরসিকদের মঞ্চ-কলাপাতে 'হ্যামলেট' পরিবেশন করার স্পর্ধা প্রদর্শন করেছি, বৎসরাধিক কাল সদর-মফস্বলের মানুষেরা তার রসাস্বাদন করে আসছেন, এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশেও, তাই নিজের মতো করে কিছু বলার দায় কিংবা হক কোনওটাই এড়িয়ে যেতে পারি না। আলস্যবশে সে চেষ্টা যদি করিও, সম্পাদক মশাইয়ের কাছ থেকে ছাড় পাবে কে?

আমাদের কাছে শেক্সপিয়র মহা গন্ডগোলে, মানে বোঝার ক্ষেত্রে। আর 'আমাদের কাছে' বলতে বোঝাতে চাইছি আমার মতো সেইসব গোলা মানুষ যারা শেক্সপিয়রের মূল রচনায় দন্তস্ফুট করতে পারি না। আবার অন্যদিকে, চার্লস এবং মেরি ল্যাম্বের 'টেলস ফ্রম শেক্সপিয়র' পড়ে কাহিনিগুলি জেনে ফেলেছি কৈশোরকালেই। কিছু অনুবাদ পড়েছি। শেক্সপিয়রের কিছু বিদেশি মঞ্চ-প্রযোজনা দেখার সুযোগও ঘটেছে সেই ছাত্রজীবন থেকেই। তাছাড়া ফিল্ম তো আছেই, এখন তো আবার ডিভিডি জোগাড় করে বাড়িতে বসে যে-কোনও সময়েই দেখা যায়। এইরকমভাবেই একধরণের বিশৃঙ্খল চর্চার মাধ্যমে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে তাঁর নাটক বা নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। সহায়ক পুস্তকাদিরও একটি ভূমিকা রয়েছে। পাখিপড়া করে শেক্সপিয়র পড়াবার এবং বোঝাবার দায় নিয়ে অনেকে অনেকরকম বই বাজারে প্রকাশ করে চলেছেন। প্রথমে অঙ্ক এবং দৃশ্য ধরে ধরে কাহিনিসার, তার সঙ্গে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন বা উপলব্ধিমূলক মূল্যায়ন। পরে বইয়ের বাঁ-ধারের পৃষ্ঠায় মূল নাটকের পাঠ, তার বিপরীতে ডানদিকের পৃষ্ঠায় প্যারাফ্রেজ বা সহজতর শব্দান্তরে, অর্থাৎ সাদামাঠা ইংরিজি গদ্যে সেই অংশটুকুই বলে দেওয়া। একেবারে শেষে আবার 'নোটস'-শীর্ষক অধ্যায়টিতে দৃশ্যগুলির কতকগুলি বাক্য বা বাক্যাংশ বা শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থ, গূঢ়ার্থ বা ব্যাখ্যা। সবটা মিলে গুলে খাওয়ানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা। সম্প্রতি একটি সিরিজ চোখে পড়ল, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'নো ফিয়ার শেক্সপিয়র'। অর্থাৎ 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না' বলে পাঠককে কোলে শুইয়ে ঝিনুকে করে শেক্সপিয়র গেলানো! 'হ্যামলেট'-এর বাংলা অনুবাদ কিছু পড়েছি— সেই অল্প বয়সে 'শনিবারের চিঠি'তে কিস্তিতে কিস্তিতে পড়েছিলাম কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কাব্যানুবাদ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত শেক্সপিয়রের অনেকগুলি নাটকের অনুবাদ

পড়ার সুযোগ হয়েছে, অনুবাদকদের নাম এখন মনে নেই। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি 'হ্যামলেট' অনুবাদ রয়েছে, যেমন আছে বাংলাদেশের বরিষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানের। 'শেক্সপিয়রের সমাজচেতনা' নামক সুবিশাল গ্রন্থটি এবং 'হ্যামলেট' বিষয়ে উৎপল দত্তর লেখাও অবশ্যপাঠ্য। 'এবং মুশায়েরা' প্রকাশিত একটি মূল্যবান আলোচনার সংকলন আছে, যাতে পাওয়া যায় 'হ্যামলেট' প্রসঙ্গে ৪৩ জন বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনের রচনাসমূহ।

দিশি পণ্ডিত এবং অধ্যাপকরা তো কাটাছেঁড়া করে হ্যামলেটকে বোঝার বা বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন বা যাবেন— এটাই তাঁদের কাজ। সেখানেও লক্ষ করা যেতে পারে যে, নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা না-করে তাঁরা বিদেশের কোন সমালোচক কী কথা বলেছেন তাই নিয়েই বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকেন বেশি। আমরা যেমন বিদেশি নাটকের অ্যাডাপ্টেশন করি অনেকটা তেমনই চলছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-আলোচনার অ্যাডাপ্টেশন! আমাদের থিয়েটারে বা তার আশপাশে বেশ কিছু বিদগ্ধ মানুষ কিংবা ইংরিজি ডিগ্রিধারী আছেন যাঁদের ধারণা গড়ে উঠেছে এইগুলিকে সম্বল করে, বা তাঁদের ছাত্রজীবনের কিংবদন্তী অধ্যাপকদের লেকচারকে বেদবাক্য ধরে নিয়ে। আর তাই দিয়েই শেক্সপিয়রের চারপাশে একটা দুর্ভেদ্য লৌহ যবনিকা গড়ে তোলা হয়েছিল, ঠিক যেমনটি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। নিজস্ব বোধে, মননে বা অনুসন্ধানে রবীন্দ্রনাথকে যেমন গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেন শঙ্খ ঘোষ কিংবা শেক্সপিয়রের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত, আমাদের থিয়েটারের তেমন শিক্ষক বা তাত্ত্বিক আর কই! অন্ধের হস্তীদর্শনের মতোই শেক্সপিয়রকে দেখার চেষ্টা করেন কিছু পণ্ডিত, আর বিভ্রান্ত করেন আমাদের। রবীন্দ্রনাট্যকে যেমন আমরা নাট্যজনেরা ঘরের তাকে তুলে রেখে পুজো করতাম, মঞ্চে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে ছিল সংশয়, ভীতি বা দ্বিধা, শেক্সপিয়রের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটেছে। এখন অবশ্য লক্ষ করছি তারুণ্যের স্পর্ধায় রবীন্দ্রনাথকে পুনরাবিষ্কার করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, ঠিক তেমনই শেক্সপিয়রকে মুক্ত করার দায়ও বোধহয় নিতে হবে তাদেরকেই। সুখের কথা, তার লক্ষণ কিছু দেখা যাচ্ছে। আর হঠাৎ আবিষ্কার করি, আমি বোধহয় শিং ভেঙে সেই তরুণদের দলেই ঢুকে পড়েছি।

হ্যামলেট-এর প্রথম দুটি অভিনয় সদ্য সম্পন্ন হয়েছে ২০১১-র ২৯ ও ৩০ মার্চ। তার চার-পাঁচ দিনের মাথায় হঠাৎই একদিন আমাদের সম্পাদক সুজিত মুখোপাধ্যায় ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা কাগজ আবিষ্কার করে

> এক কবি খেপে গিয়ে এলিজাবেথীয় নাটককে খুনোখুনির ধারাবিবরণী বলে নিন্দা করেছিলেন। উৎপল দত্ত বলছেন 'নাট্যকার হলে কবি বুঝতেন— ওটা শুধু বাইরের খোলস— ওটা দরকার, নইলে দর্শক নাটক দেখবেই না'।

উত্তেজিত। ফাইল বলছে ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে 'অন্য থিয়েটার' ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের কাছে প্রযোজনা-সংক্রান্ত অনুদানের জন্য একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী আবেদনের সঙ্গে প্রস্তাবিত নাটকটির কাহিনিসার এবং প্রযোজনা সম্পর্কে নির্দেশকের ভাবনার রূপরেখাও পাঠাতে হয়। সুজিতের উত্তেজনার কারণ, সেদিনকার সেই প্রস্তাবিত নাটকটি ছিল 'হ্যামলেট'। ভুলেই গিয়েছিলাম, তাই এতদিনের পুরনো সেই কাগজটি হাতে নিয়ে বেশ চমকিতই হলাম আমি। দেখা যেতে পারে নির্দেশকের জবানিতে কী লেখা ছিল তাতে, বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়: 'বাংলা মঞ্চে আমরা দেখেছি সোফোক্লেস, ইবসেন, চেখভ, পিরানদেলও, আর্থার মিলার, বের্টোল্ট ব্রেখট, দারিও ফো প্রমুখ বহু বিদেশি নাটককারকে। কিন্তু শেক্সপিয়র প্রযোজনায় কেউ খুব তেমন একটা হাত দেননি। শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার রায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায়, কেউই না। উৎপল দত্ত ছিলেন একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এটাও স্বীকার করতে হবে যে, শেক্সপিয়রের নাটকাবলির ভালো (অভিনয়যোগ্য) অনুবাদও দুর্লভ ছিল। আর যা দুয়েকটি প্রযোজনা দেখার সুযোগ হয়েছে তার বেশির ভাগই সেই সনাতন ব্রিটিশ মডেল অনুসারী 'কপিবুক' উপস্থাপনা— লিখিত নাটকটির দৃশ্যানুবাদ। আমাদের চেষ্টা থাকবে কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হ্যামলেটকে বেঁধে না-রাখা— সেই প্রাচীন ডেনমার্কের রাজপুত্র হ্যামলেটের দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণাই শুধু নয়, আমাদের এই সময়ের যে-কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত যে-কোনও যন্ত্রণার্ত হ্যামলেটই সে হতে পারে। নাটকটি অভিনীত হবে মঞ্চের ওপর নির্মিত একটি পানশালার সেটে। আলো, পোশাক এবং অভিনয়ে থাকবে পাশ্চাত্য, এশীয় এবং ভারতীয় আবহ বা পরিবেশের মিশেল। শেক্সপিয়রের আত্মাকে অক্ষুণ্ণ এবং অবিকৃত রেখে সমসাময়িক অনুষঙ্গে এটি হয়ে উঠবে একটি ষোলো আনা পরীক্ষামূলক উপস্থাপনা। আর নাট্যটি রচিত হবে বাংলাদেশের সুখ্যাত এবং শ্রদ্ধেয় কবি শামসুর রাহমানের বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে।'

শেক্সপিয়রের দুটি নাটক আমার খুবই প্রিয়— 'হ্যামলেট' এবং 'ম্যাকবেথ'। একসময় বাংলাদেশের বন্ধু আলি যাকেরের লেখা হ্যামলেট-আশ্রিত নাটক 'দর্পণ' নিয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলাম। মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পর, সেই বাংলাদেশেরই এক শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানের অনুবাদ আমাকে আকৃষ্ট করল। সম্পাদনা এবং পুনর্লিখনের কাজ খানিকটা এগনোর পর 'অন্য থিয়েটার'-এর বন্ধুদের শুনিয়েছিলাম। পুনর্লিখন কেন, ব্যাখ্যা করে বলি। শামসুর রাহমান একজন বড় মাপের কবি। শেক্সপিয়রের মতো এক মহাকবির রচনার ভাষান্তরিত পাঠ প্রস্তুত করার যোগ্য কবি, রুশ ভাষায় যেমন ছিলেন বরিস পাস্তারনেক। বিখ্যাত রুশ পরিচালক তাঁর 'লিয়ার' এবং 'হ্যামলেট' চলচ্চিত্রে পাস্তারনেকের ভাষান্তরিত পাঠটিকেই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু কবিতার ভাষান্তর এবং নাট্যকাব্যের ভাষান্তরের মধ্যে বোধহয় একটা পার্থক্য থাকে। তাই শামসুর রাহমানের অনুবাদে উচ্চস্তরের কবিতা হয়তো পেলাম, কিন্তু নাটক বোধহয় ততটা পাওয়া গেল না। কবিতার বিন্যাসে নাট্যের বিন্যাস খানিকটা যেন বিপর্যস্ত হয়ে যায়— কাব্যিক বাক্যগঠনের প্যাঁচে কোথাও কোথাও যেন একটা অস্বস্তিকর দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রখ্যাত কবি সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি শেক্সপিয়র অনুবাদেও এরকমটি ঘটেছে বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। সংলাপগুলি অভিনেতাকে বলতে হবে, কাব্যধর্ম বজায় রেখেও কমিউনিকেট করতে হবে— এই ভাবনা মাথায় রেখে অনুবাদকর্মটি করা হলে অভিনেতা-পরিচালক-দর্শক সকলেরই সুখ হয়। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমরা যখন শম্ভু মিত্রের 'অয়দিপাউস' এবং শিশির দাসের 'ঈদিপুস' পাশাপাশি রেখে পড়ব, দেখতে পাব শিশির দাসের অনুবাদটি অসাধারণ কাব্যগুণমণ্ডিত, কিন্তু অভিনয়যোগ্যতার দিক থেকে শম্ভু মিত্রের অনুবাদটি অনেক বেশি

কাজের। তাই খানিকটা এগিয়েও স্থগিত রাখলাম কাজটি, কারণ শামসুর রাহমান একজন কবিতার খোদা, তার ওপর খোদকারি করার পাপের ভয় আমাকে বিরত করল। ২০০৩-এর পর, অতি সম্প্রতি ইচ্ছেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছি শামসুর রাহমানের অনুবাদটি। কাকতালীয়ভাবে ঠিক তখনই 'এবং মুশায়েরা'র দৌলতে পিএলটি-প্রাক্তনী শক্তি বিশ্বাসের অনুবাদ হাতে এল। অনুবাদের তীব্র নাটকীয়তা এবং কাব্যগুণ আমাকে আকর্ষণ করল, মনে হল— এটাই তো আমার মেটিরিয়াল। যাই হোক, নাটকটা কতটা দাঁড়াল, কিংবা মঞ্চায়নই বা কীরকম হল, তার বিচার তো করবেন রসিক দর্শকরা। কাজটা করার সময় আমার মাথায় শুধু কয়েকটি প্রশ্নই ঘোরাফেরা করেছে: কেন এই সময় 'হ্যামলেট'? কোনও বিশেষ ব্যাখ্যা বা দৃষ্টিকোণ থাকবে কি? শেক্সপিয়রের নাটক কি শুধুই গল্প বলা, নাকি তাকে বাহন করে মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাস এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর যে গভীর পর্যবেক্ষণ এবং অনুভব প্রকাশ পেয়েছে তা-ও, কিংবা তাই-ই, সমধিক গুরুত্ব পাবে মঞ্চায়নে? সম্পাদনায় কী, কতটা, কেন বাদ পড়বে? সংলাপোচ্চারণ বা অভিনয়রীতিই বা কেমন হবে? জানি না, এইসব চিন্তা আদৌ ধরা পড়েছে কিনা আমাদের কাজে, পারলেও কতটা সার্থকভাবে? সে বিচারও তো করবেন দর্শক-শ্রোতারাই। আমাদের কাছে কাজটাই বড়।

প্রথম প্রথম ভাবতাম শেক্সপিয়র মানে তার গল্প— কমেডিতে মজার মজার কাহিনি বা প্লট, ট্র্যাজিডিতে খুনখারাবি, ষড়যন্ত্র, প্রতিহিংসা, রক্তারক্তি। নাটক হিসেবে অনেকগুলির গল্প বেশ ছেঁদোই মনে হত। যেমন 'হ্যামলেট'। কী আছে গল্পে? হিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ডেনমার্কের রাজকুমার দেশে ফিরে এল তার পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে। এসে দেখে তার মা রানি গারট্রুড বিয়ে করেছেন তারই কাকা ক্লডিয়াসকে। হ্যামলেট যখন এটা মেনে নিতে পারছে না তখনই এক রাত্রে হ্যামলেটের মৃত পিতার আত্মার আবির্ভাব ঘটে এবং সে জানায় যে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী তারই ভাই ক্লডিয়াস, যে নাকি ঘুমন্ত রাজার কানে গরল ঢেলে তাকে হত্যা করে দখল করেছে তাঁর রাজমুকুট এবং রানিকে। প্রেতাত্মা পুত্রকে বলছে 'প্রতিশোধ নাও'! নাট্য-কৌতূহল তৈরি হল— কাকাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে পারবে কি হ্যামলেট, নিলে কীভাবে নেবে, কখন নেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি— আর এই কৌতূহল এবং তার নিবৃত্তির পথ ধরেই এগোয় নাটক। সেই পথের মাঝেই মারা পড়ে হ্যামলেটের প্রেমিকা ওফেলিয়ার পিতা মন্ত্রী পোলোনিয়াস,

'অন্য থিয়েটার' প্রযোজিত 'হ্যামলেট' নাটকের একটি দৃশ্য

ওফেলিয়া নিজে, রাজার চর এবং হ্যামলেটের বন্ধু রোজেনক্রানজ এবং গিল্ডেনস্টার্ন, ওফেলিয়ার দাদা লেয়ার্টেস, হ্যামলেটের মা রানি গারট্রুড, পিতৃব্য ক্লডিয়াস এবং সবশেষে হ্যামলেট নিজে— অর্থাৎ হ্যামলেটের পিতা ছাড়া আরও আটজন। অতীব ছেঁদো গল্প মনে হত একসময়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছুটা পড়াশুনো করে বুঝতে পারলাম গল্পটা তো উৎপল দত্তর ভাষায় খোলসমাত্র। তিনি বলছেন: 'এতে কী নেই? ভূত আছে, বিষপ্রয়োগে গুপ্তহত্যা আছে, উন্মাদের কার্যকলাপ আছে, পর্দার মধ্যে তলোয়ার চালিয়ে হত্যাকাণ্ড আছে, নায়িকার উন্মাদ হয়ে অশ্লীল গান গাওয়া আছে, বিদ্রোহী জনতার রাজপ্রাসাদ আক্রমণ আছে, নায়িকার শবাধারের পাশে গোরস্থানে নায়ক ও নায়িকার ভ্রাতার মল্লযুদ্ধ আছে, তলোয়ার খেলা আছে, তলোয়ারের ডগায় বিষপ্রয়োগে হত্যা আছে, পানীয়ে বিষ মেশানোয় মৃত্যু আছে— এককথায় মৃতদেহের ছড়াছড়ি!' এক কবি খেপে গিয়ে এলিজাবেথীয় নাটককে খুনোখুনির ধারাবিবরণী বলে নিন্দা করেছিলেন। উৎপল দত্ত বলছেন 'নাট্যকার হলে কবি বুঝতেন— ওটা শুধু বাইরের খোলস— ওটা দরকার, নইলে দর্শক নাটক দেখবেই না'। আমাদের 'হ্যামলেট'-এর একটি দৃশ্য থেকে সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝানো যাবে হয়তো। এখানে গল্পের খোলসটা কী? না, হ্যামলেটের মা চাইছেন পুত্র যেন পিতার মৃত্যুর শোকে দীর্ঘকাল মুহ্যমান না থাকে, তাই বলছেন, *'মৃত্যু যদি নিত্যধর্ম হবে, কেন এত শোকের প্রকাশ তবে?'* হ্যামলেট উত্তর দিচ্ছে: *'প্রকাশ' মহাশয়া! না, এ সত্য। / আমি জানি না 'প্রকাশ' কাকে বলে। / মসিবর্ণ আবরণ এ নয় কেবল, / অথবা বিষাদের কৃষ্ণবেশ ধারণের আচার পালন, / চেষ্টিত দীর্ঘশ্বাসে মিথ্যা হা-হুতাশ, / কিংবা আঁখিতটে অশ্রুর নিরন্তর ধারা, / অথবা শোকতাপে বিষণ্ণ বদন, / তারই সঙ্গে আরও যত রীতি ভঙ্গি আর শোকাচার/ আমার মনস্তাপ প্রকাশে নয় তারা সক্ষম। / এওলোকে বলা যায় 'প্রকাশ'। / কারণ এসব ভাণ লোকে করে অভিনয়কালে। / আমার অন্তরে যে দাহ, তা দেখা যায় না চোখে, / এসব পোশাক তো লোকে পরে কৃত্রিম শোকে।'* আমাদের জীবনে শোক, তার গভীরতা, অগভীরতা, বহিঃপ্রকাশ, প্রথা, আচার, যা কিনা অভিনয়েরই নামান্তর, সেসব নিয়ে কবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং তীব্র স্পষ্ট মন্তব্য অনুধাবনীয়। দৃষ্টান্ত অজস্র, আর একটিমাত্র দিয়েই ক্ষান্ত হব। হ্যামলেটেরই আমন্ত্রণে অভিনেতারা এসেছেন রাজপ্রাসাদে। যুবরাজের অনুরোধে তাঁরা পীরহুস ও প্রায়ামের নাটকটির খানিকটা অংশ অভিনয় করে দেখান। সে অভিনয়ের তারিফ করে পোলোনিয়াস হ্যামলেটকে: 'দেখুন, ওর মুখ কেমন কালো হয়ে গিয়েছে, আর চোখে জল এসেছে।' সবাই চলে গেলে হ্যামলেট আবারও স্বগত উচ্চারণে বলেন, এই অভিনেতারা যেখানে সাজানো কাহিনি নিয়ে, কল্পিত আবেগে, মিথ্যার

অভিনয়ে আলোড়িত করেন দর্শকমনকে, সেইখানে তিনি পিতৃহন্তারক বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেওয়ার জন্যও হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারছেন না, তিনি কি এমনই কাপুরুষ! পরবর্তী দৃশ্যে আমরা শুনব সেই বিখ্যাত *'টু বি, অর নট টু বি'* স্বগতোক্তি: *'নির্মম ভাগ্যের অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত হৃদয়ে/ যন্ত্রণা সহা মহত্তর, নাকি সংকট-সমুদ্রের মাঝে/ ঝাঁপ দিয়ে প্রতিরোধে যন্ত্রণার অবসান?'* তার পরের উপলব্ধি— মৃত্যু শুধু নিদ্রা যাওয়া। এবং নিদ্রা যাওয়া সম্ভবত স্বপ্ন দেখা। *'তখন সেই মরণঘুমে দেখা দেবে কেমন স্বপ্ন সব, / ভেবে দ্বিধা জাগে মনে— / এই সংশয়ের ফলে দুর্দশা বহন করে মানুষ দীর্ঘ জীবন ধরে। / নয়তো কে আর সহ্য করে কালের বিদ্রূপ, কশাঘাত, / অত্যাচারীর পীড়ন, দর্পিতের অবজ্ঞা, / উপেক্ষিত প্রেমের যন্ত্রণা, আইনের শম্বুক গতি, / রাজকর্মচারীর ঔদ্ধত্য, আর অযোগ্য শাসকের হাতে/ গুণীর নীরব লাঞ্ছনা, কে সয়, / যখন এক ক্ষুদ্র ছোরার আঘাতে/ নিজেই চুকোনো যায় যত হিসাব নিকাশ?... যদি না মৃত্যুপারের কোনও অজানা আশঙ্কা জাগে—/ সেই অজানা দেশ, যার সীমানা থেকে/ যাত্রী ফেরে না আর, সেই ধাঁধা মনে লাগে, / আর বাধ্য করে জীবনের যত গ্লানি সয়ে যেতে, / পারি না পাড়ি দিতে অজানা ওপারে—। এই পরিণাম-চিন্তা আমাদের কাপুরুষ করে।'* মনুষ্যজাতির জীবনযাপনের সামূহিক যন্ত্রণা এবং তা সহ্য করা বা মেনে নেওয়ার কারণ বা ব্যাখ্যাসমূহ হ্যামলেটের এই দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্যে আমরা পেয়ে যাই। প্রতিশোধ নেওয়া হবে কি হবে না— নাট্যকাহিনির এই সামান্য কৌতূহলের খোলস ফেটে বেরিয়ে আসে এক চিরকালীন চিন্তাস্রোত যা মানুষকে সচরাচর চালিত করে।

এইভাবে নাটকের কাহিনির খোলসের ভেতরেই আমরা পেয়ে যাই কাব্য, দর্শন, মনস্তত্ত্ব এবং মনুষ্যচরিত্রের চিরকালীন কিংবা ব্যক্তিবিশেষের তাৎক্ষণিক গভীর অনুভূতিসমূহ। বয়সকালে বুঝতে পারি, এই হচ্ছেন মহাকবি শেক্সপিয়র! আর এই গুণেই তিনি চারশত বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত বেঁচে রইলেন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাটককার রূপে। নিজেল আলেকজান্ডার নামক জনৈক আলোচক বলছেন: 'In a remarkable series of speeches and soliloquies Hamlet, torn by conflicting emotions, and divided against himself, asks the tormented and tormenting questions which create the special quality of the play. It is necessary, however, for the critic and director to observe that the difficulties and doubts experienced by his protagonist are only of the dramatic methods used by Shakespeare to draw the necessary questions of the play to attention of his audience, There is a distinction between Hamlet's problems and the problem of *Hamlet*.'

> ব্রেখটের নাটক করা মানে তো তাঁর নাট্যতত্ত্বের ওপর পরীক্ষায় বসা নয়।... জার্মানির ব্রেখটকে আমি কত বুঝি তার প্রমাণ দিতে গিয়ে আমার বাঙালি দর্শকদের সঙ্গে অকারণ দূরত্ব তৈরি করতে আমি রাজি নই।

সাধারণত ছোট-বড়-মাঝারি যে-কোনও নাটককারের নাটকই যখন প্রযোজনার জন্য বেছে নিই, কমবেশি কোনও বাড়তি চাপ না নেওয়ারই চেষ্টা করি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, নির্দেশক হিসেবে পদ্ধতিগতভাবে আমার কাছে মোহিত চট্টোপাধ্যায়-মনোজ মিত্র, শেখর সমাদ্দার-হর ভট্টাচার্য যতটা গুরুত্ব পান, ব্রেখট, রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়র ঠিক ততটাই। কথাটা স্পর্ধা শোনাতে পারে, আমি কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলছি। এখানে পদ্ধতির কথা বলেছি। মনোজ-মোহিতের নাটক আমাকেই বুঝে নিতে হবে, কারণ আমরা সমসময়েরই মানুষ, পরস্পরকে বুঝতে বুঝতে একই সঙ্গে চলেছি। রবীন্দ্রনাথ বা ব্রেখট বা চারশ' বছর আগেকার শেক্সপিয়রকে নিয়ে দেশে-বিদেশে এতটাই বিস্তৃত এবং গভীর চর্চা হয়েছে যে, নাটকগুলি সম্পর্কে সেইসব অসংখ্য পণ্ডিতি আলোচনার কিংবা সেগুলির মঞ্চায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি এবং সমালোচনার খানিকটা অন্তত পড়ে নিয়ে, জেনে নিয়ে, একটা ধারণার জগৎ তো তৈরি করে নিতেই হয়। জগৎ-সংসার সম্পর্কে যেমন একজন শিল্পস্রষ্টার ধারণা থাকতেই হয়, থাকেও, ঠিক সেরকমটাই আরকি। কিন্তু যে নাটকটি আমি মঞ্চে নিয়ে আসব, তাকে বুঝতে হবে আমার মতো করেই, শুধুমাত্র আমারই মতো করে, যাতে মঞ্চে সেটা আমার হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, দর্শকদের কথাও আমি ভাবি, ভাবি যে আমারকালের দর্শকদের ভাবনা বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাকে মিলিত হতেই হবে। তাই ব্রেখট সম্পর্কে যা কিছু পড়েছি বা শুনেছি সেটা মাথায় রেখেই শোয়াইককে করে তুলতে হয়েছে আমার শোয়াইক, যাকে বুঝতে পারেন আমার দর্শকরা। ব্রেখটের নাটক করা মানে তো তাঁর নাট্যতত্ত্বের ওপর পরীক্ষায় বসা নয়। তাই তাঁর থিওরিকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা না করে আমার মতো করে উপস্থাপনা করেছি। উনি আবেগ বর্জন করতে বলেছেন, কিংবা সঙ্গীতে প্রবল বেহালা-বিরোধী ছিলেন, তৎসত্ত্বেও আমার প্রযোজনায় আবেগও আছে, বেহালাও আছে। জার্মানির ব্রেখটকে আমি কত বুঝি তার প্রমাণ দিতে গিয়ে আমার বাঙালি দর্শকদের সঙ্গে অকারণ দূরত্ব তৈরি করতে আমি রাজি নই। এই দূরত্ব আরও নানাভাবে তৈরি করে ফেলি আমরা। উৎপল দত্ত প্রশ্ন করতেন, একটা বাংলা নাটকে একজন ইংরেজ চরিত্র কেন বলবে, 'হামি ঠোমাকে বন্ডি করিলাম'? তাঁর যুক্তি, ওরিজিনাল শাজাহান তো বাংলায় কথা বলতেন না, অথচ নাটকে কী সুন্দর গড়গড় করে ডি এল রায়ের বাংলা বলে যান! তাহলে রবার্ট ক্লাইভই বা কেন বলবে না? সত্যিই তো, ওইরকম বিকৃত বাংলা বলিয়ে চরিত্রটিকে বেশ খানিকটা দূরে ঠেলে দেওয়া হয় না কি? নাট্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয় না কি? আবার সেই উৎপলদাকে দেখেছি বিদেশি চরিত্রকে লাল বা সোনালি পরচুলা পরিয়ে বা আমাদের অপরিচিত জবরজং পোশাক পরিয়ে মঞ্চে হাজির করছেন। তাতে চরিত্রের বহিরঙ্গটা যেন অন্তরঙ্গের বাধা হয়ে দাঁড়াত। আসলে এজাতীয় বাস্তবধর্মিতার তো কোনও শেষ নেই। ব্যয়বহুল কমার্শিয়াল যাত্রা বা ব্যবসায়িক থিয়েটারের আম-দর্শকদের মন বা চক্ষু রঞ্জনের জন্য হয়তো এই বাস্তবতার মায়া সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা থাকে, কিন্তু আমাদের পরিসরে এটা বাহুল্য বলেই মনে হয়। তাই আমার শোয়াইক বিদেশি হলেও দর্শক তাকে আমাদের ঘরের শোয়াইক বলেই মনে করেন, যেমন চ্যাপলিনকে করে থাকেন, এবং তার নানাবিধ চতুর কার্যকলাপ কিংবা তীক্ষ্ণ রসালো সংলাপ বাঙালি দর্শক চুটিয়ে উপভোগ করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন হিটলার-অধিকৃত চেকোস্লোভাকিয়ার পটভূমি কিংবা ঐতিহাসিকতা মাথায় রেখেই। আমার মনে হয়, বিদেশি নাটকের ক্ষেত্রে এই রসায়নটা খুবই জরুরি। তাই আমি চাই না ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদ, তার সভাকক্ষ, অলিন্দ, রানির শয্যাকক্ষ, প্রার্থনাস্থল, দুর্গপ্রাকার, বা চত্বর মঞ্চে নির্মাণ করতে, যা কিনা কার্যত অসম্ভব, এবং অপ্রয়োজনীয়ও বটে। চাইনি সেই বহুব্যবহৃত

এবং অতি-পরিচিত রাজকীয় পোশাক-আশাক, অস্ত্রশস্ত্র, সান্ত্রি-প্রহরী বা শিরস্ত্রাণের আড়ম্বর— সব মিলিয়ে এমন এক অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করার চেষ্টা করেছে, যাতে মনে হয় হ্যামলেট এই সময়ের, তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত এই সময়কার, হিংসা-প্রতিহিংসা এই সময়ের, চিন্তার জগৎ এই সময়ের, পরিণতিও এই সময়ের। নাটককার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ভাবনাটি সঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন, তাই তাঁর একটি মন্তব্য উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না: 'এটি মঞ্চ নয়, পানশালা, এই কনস্ট্রাকটি তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে বারান্দা বাগান ওফেলিয়ার ঘর রাজসভা কোনও কিছুকেই আলাদা করে কোনও কিছু দিয়ে চিহ্নিত করার প্রয়োজন রইল না। পোশাকে এখনকার এখানকার চালু পোশাকের সঙ্গে একটা ভিনদেশি জামা মিশিয়ে দেওয়া, ডেনমার্কের ইতিহাস মেনে এইরকম ছিল— এইরকম তর্কের কোনও সুযোগ নেই। মোদ্দা কথা এই যে, এইভাবেই প্রযোজনাটি বানানো, ডেনমার্ক ভাবলেই ডেনমার্ক, না ভাবা গেলে ভাববে না, তুমি যা ভাববে তা-ই সত্য। এর মধ্যে দাগ-দেওয়া আধুনিকতা নেই, অথচ আলতো আধুনিকতার স্পর্শ প্রত্যেক কিছুতে— অভিনয়ে, পোশাকে, মঞ্চে ও সঙ্গীতে।

হঠাৎ 'বিসজন' কেন? হঠাৎ 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কেন? হঠাৎ এটা কেন, ওটা কেন— এজাতীয় প্রশ্ন আমাদের প্রায়ই শুনতে হয়। মাঝে মাঝে রেগেমেগে বলতে ইচ্ছে যায়, বেশ করেছি, তাতে আপনার কী? 'হ্যামলেট' নিয়েও এমন প্রশ্ন শুনতে হয়েছে। সেইসব প্রশ্নকর্তারা নাটকের হাঁড়ির চারটিমাত্র ভাত টিপে দেখলেই উত্তর পেয়ে যাবেন।

১) থাকব কি থাকব না (অথবা বাঁচব, না মরব?), প্রশ্ন হল তাই— বিরূপ ভাগ্যের শরাঘাত সয়ে যাওয়া, নাকি দুঃখ সমুদ্রের বিদ্রোহ কিংবা বিরোধিতা করে ওদের বিলীন করা, কোনটা মহত্তর?

২) ডেনমার্ক তো কারাগারই। বেশ খাসা বড় এক কয়েদখানা— যেখানে আছে ঢের খুপরি, কারাকুঠরি আর তয়খানা। ডেনমার্ক সবচেয়ে জঘন্য কারাগার।

৩) ডেনমার্ক রাজ্যে কোথায় কীসে যেন খুব পচন ধরেছে।

৪) গত তিন বছর, আমি লক্ষ করে দেখছি, যুগটার সবকিছুই এমন তীক্ষ্ণাগ্র হয়ে উঠেছে যে, কৃষকের পায়ের ছুঁচলো জুতো গিয়ে রাজসভাসদের পায়ের গোড়ালিতে লাথি মারছে।

সর্বকালের কথা, সমকালের কথা, এই মুহূর্তের কথা এমনই ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে 'হ্যামলেট'-এ যেমন দেখা যায় শেক্সপিয়রের আর পাঁচটা নাটকেও। তা স্বাভাবিকভাবেই এই

'অন্য থিয়েটার' প্রযোজিত 'হ্যামলেট' নাটকের একটি দৃশ্য

কথাগুলো তো খেলা করতে থাকে একজন সময়-সচেতন পাঠকের অন্তর্গত রক্তের ভেতর। আর একজন নাট্য-নির্দেশক তো এই সময়েরই মানুষ, যার দিকে তাকিয়ে থাকে সমসময়ের মঞ্চ, আর দর্শকরা।

এবার প্রশ্ন ধেয়ে আসতে পারে: আপনাদের 'হ্যামলেট' প্রযোজনাটির চিত্রপট অর্থাৎ সেটটি পানশালা কেন? তাহলে একটু বিশদে বলতে হয়। সরাসরি 'বিসর্জন' না করে রবীন্দ্রনাথেরই 'রাজর্ষি' উপন্যাস, তাঁর নিজের করা ইংরিজি অনুবাদ, এবং মূল নাটকটা নিয়ে একটি নতুন নাট্যপাঠ আমরা প্রস্তুত করেছিলাম সেই ১৯৮৪ সালে। শঙ্খ ঘোষ মহাশয়ের ছাড়পত্রের জোরে বিশ্বভারতী কোনও ঝামেলা না করেই অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু অনেকে মৌলবাদী হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। একটি নাট্যদল সেইসময় তাঁদের 'বিসর্জন'-প্রযোজনার বিজ্ঞাপনে আমাদের ঠেস দিয়ে লিখলেন— 'না, কোনও পরীক্ষানিরীক্ষা নয়'। যেন পরীক্ষানিরীক্ষা করাটা একটি গর্হিত অপরাধ। এইসব সনাতনপন্থীদের দলে ছিলেন একজন বিখ্যাত নাটককার-পরিচালক এবং নাট্যবিদও। ওঁর ধাতে আবার এসব সইত না। তাঁর বেশ কয়েকটি সাড়ম্বর শেক্সপিয়র-প্রযোজনা দেখে মনে হত ব্রিটিশ স্কুল-কলেজ মডেলের ছাঁচে তৈরি। কলকাতার ইংরিজি ভাষার থিয়েটার সম্পর্কেও সেই একই অভিজ্ঞতা। এই শহরে অসিত বসুর 'কলকাতার হ্যামলেট', অঞ্জন দত্ত'র 'পাতি প্রেমের গপ্প' (রোমিও জুলিয়েট/ ওয়েস্টসাইড স্টোরি অবলম্বনে) এবং ব্রাত্য বসুর 'হেমলাট' আমাকে অবশ্যই আকর্ষণ করেছিল। তেমন দেখার সুযোগ না থাকলেও আমরা বইপত্র পড়ে কিংবা অন্যান্য সূত্রে জানতে পারি শেক্সপিয়রকে নিয়ে বিদেশে আজকাল কত না আকছার ভাঙচুর হচ্ছে। মারোভিৎসের 'হ্যামলেট' তেমনই একটি নাটক। রোজেনক্রান্টজ-গিল্ডেনস্টার্নকে নিয়ে একটা গোটা নাটকই লিখে ফেললেন টম স্টপার্ড। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় লেখা হয়েছিল 'লেডি ম্যাকবার্ড'। সম্প্রতি শুনলাম একটা নাটক লেখা হয়েছে গারট্রুড ও ক্লডিয়াসকে নিয়েও। সিনেমাতেও ঘটছে এজাতীয় 'কালোপাহাড়ি' কাণ্ডকারখানা— 'রোমিও-জুলিয়েট ইন ডার্কনেস', থেকে শুরু করে জিয়াফ্রেলির ছবি, কিংবা বিলি ওয়াইলারের সেই বিখ্যাত মিউজিকাল 'ওয়েস্টসাইড স্টোরি'। কুরোশোয়ার 'দ্য থ্রোন অব ব্লাড' বা 'রান' তো এই গোত্রেরই অসাধারণ দুটি চলচ্চিত্র। অতি সম্প্রতি 'হ্যামলেট' এবং 'ম্যাকবেথ' অনুসরণে সমকালের পটভূমিতে নির্মিত দুটি আধুনিক বিদেশি ছবিও দেখেছি ছোট পর্দায়। মুম্বইয়ের উপকূলেও এজাতীয় অন্তর্ঘাতমূলক চলচ্চিত্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে— তাই 'মকবুল' কিংবা 'ওমকারা'-র মতো ছবি এখানে তৈরি হয়, প্রশংসাও পায়। আর সেটের কথা? নিউইয়র্কের একটি থিয়েটারে আর্থার মিলারের 'আফটার দ্য ফল' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল নিউ জার্সি-নিবাসী কবি-বন্ধু গৌতম দত্ত। গোটা নাটকটাই অভিনীত হয় মঞ্চে নির্মিত একটি এয়ারপোর্ট লাউঞ্জের সেটে। সে যাত্রায়ই দেখার সুযোগ ঘটেছিল ওভিদের 'মেটামরফোসেস'— অভিনয়-স্পেস প্রেক্ষাগৃহে নির্মিত একটি জলাশয়, তার তিনপাশ ঘিরে দর্শকাসন। শুনেছিলাম, বিদেশের কোথায় নাকি চেখভের 'দ্য চেরি অর্চার্ড' প্রযোজনার মঞ্চপটভূমি ছিল একটি সার্কাস এরিনা। অন্যদিকে 'হ্যামলেট ও জনপ্রিয়তা' শীর্ষক নিবন্ধে উৎপল দত্ত-র

আলোচনাও আমাকে কম প্রভাবিত করেনি: 'প্রগতিশীল বণিকশ্রেণি ও তাদের সমর্থক নবজাগ্রত মেহনতি মানুষ তখন সদ্যলব্ধ ক্ষমতা ও অধিকারে উদ্দীপ্ত। অন্যদিকে ভগ্নমনোরথ, পচনশীল অভিজাতদের ছিল এদের প্রতি বিষম ঘৃণা। এই দুই শ্রেণিই ছিল শেক্সপিয়রের দর্শক। এদেরকে শেক্সপিয়র গভীরভাবে চিনতেন— গজদন্তমিনারে তিনি থাকেননি। টমাস ফুলার স্বচক্ষে দেখেছিলেন বেন জনসন ও শেক্সপিয়রকে মারমেড ট্যাভার্ন নামক শুঁড়িখানায়। এত নিকটভাবে যাদের সঙ্গে মিশেছিলেন মহাকবি, তাদের খুশি করতেই 'হ্যামলেট' নাটক রচনা করেছিলেন।'

আমাদের 'হ্যামলেট'-এ পর্দা খুললেই একেবারে সামনে দেখা যাবে কালো টি-শার্ট পরা একজন সূত্রধর-অভিনেতা, তার টি-শার্টের বুকে লেখা আছে প্রযোজক নাট্যদলটির নাম— 'অন্য থিয়েটার'। সে এই পানশালা প্রসঙ্গে দুটি গল্প বলে। (১) কানাডার স্ট্রাটফোর্ড নামক একটি শহরের গল্প। ওখানে বেড়াতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল শহরটি যেন শেক্সপিয়রের রচনাসমগ্র। শহরভর্তি প্রচুর নাট্য-প্রেক্ষাগৃহ। আর দোকান হোটেল সব শেক্সপিয়রের নাটকের একেকটি চরিত্রের বা বিখ্যাত শেক্সপিরীয় অভিনেতার নামে— কোনওটা ফলস্টাফ, কোনওটা ওথেলো, কোনওটা বা লরেন্স ওলিভিয়েরের নামে। হঠাৎই চোখে পড়েছিল 'হ্যামলেট ইন' নামের এক সরাইখানা। (২) পার্ক স্ট্রিটের একটি পানশালায় বছরদশেক আগে একটি এনকাউন্টার হয়েছিল, তাতে পুলিশের নিশানায় মারা যায় তার এক বন্ধু। দশ বছর বন্ধ থাকার পর নতুন মালিকানায় পানশালাটি আবার চালু হওয়ার কথা আজ। নাট্যদলটির বিশেষ অনুরোধে মালিক পানশালাটির নাম দিয়েছেন 'হ্যামলেট ইন', এবং সেইসঙ্গে প্রথম সন্ধ্যায় সেখানে 'হ্যামলেট' নাটকটি অভিনয়ের অনুমতিও। প্রথম গল্পটির একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। কোনও একবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র ও আমি কানাডা সফরে যাই। স্ট্রাটফোর্ড শহরটি দেখে সত্যি সত্যিই আমরা বিস্মিত এবং চমৎকৃত হয়েছিলাম। ব্যাপারটা কেমন জানি আমার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। 'হ্যামলেট' করার কথা যখন ভাবছি তখন থেকেই স্থির করেছিলাম নাটকটা ওই নামের একটি পানশালাতেই স্থাপনা করতে হবে। দ্বিতীয় গল্পটি অবশ্যই কাল্পনিক, কিন্তু দশ বছর আগেকার এনকাউন্টারের ঘটনাটি অনেকে সত্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। শুরুতে এই গল্পটি বলে না নিলে দর্শকদের মনে একটা খচখচানি থেকে যেত— এলসিনোর প্রাসাদের জায়গায় পানশালা কেন রে বাবা! নাটকটির মাঝখানে অবশ্য পুরোটাই খাঁটি শেক্সপিয়র, কোনও ভেজালের কারবার সেখানে নেই। একেবারে শেষে যখন হ্যামলেট আর লেয়ার্টেসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হবে, ঠিক সেই সময়টাতে দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে গুলির আওয়াজ, আর সেই গুলিতে লুটিয়ে পড়েন রাজা-রানি-লেয়ার্টেস-হ্যামলেট— দ্বিতীয় গল্পের সেই এনকাউন্টারের অ্যাকশন-রিপ্লে যেন। শুধু কে কাকে কখন কেন কীভাবে হত্যা করছে তার হিসেব আর মেলানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে নাটকের সাধারণ চরিত্রগুলি, অর্থাৎ Commoners যারা, তারা নীরব দর্শক, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ লাল এবং হয়তো বা দীপেন্দু চক্রবর্তীও পানশালা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের জন্য যুক্তি শানানো আছে: প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য— এলসিনোর দুর্গপ্রাসাদের সম্মুখে প্রহরামঞ্চ। প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় সেখানে উপস্থিত হ্যামলেট, হোরেশিও এবং মার্সেলাস। প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে শোনা যাচ্ছে উল্লাসধ্বনি। তার সঙ্গে তূর্যনিনাদ এবং তোপধ্বনিও। হোরেশিও প্রশ্ন করে: এর অর্থ কী প্রভু?

হ্যামলেট। *বিনিদ্র রজনী কাটাবেন রাজা নৈশভোজে/মদ্যপান উৎসবে, / মত্ত মাতালের হুল্লোড়ে স্বাস্থ্য কামনা করে, / আর উদ্দাম বন্যনৃত্যের আত্মপ্রসাদে। / আর যখনই রাইন মদের পেয়ালা/ নিঃশেষ করে পানে, / বেজে ওঠে তুরী ভেরী কাড়া-নাকাড়া, / মদ্যপের বীরত্বের সহর্ষ ঘোষণা করে।*

হোরেশিও। *এটা প্রথা নাকি?*

হ্যামলেট। *প্রথাই বটে। / যদিও আমি এদেশের অধিবাসী, / আর এ প্রথার সঙ্গে জন্মগত যোগ, / তবু আমার বিচারে এ প্রথা পালনের চেয়ে / ভাঙাই ছিল বেশি কাম্য। / এই লাগামছাড়া ইতর পানোচ্ছ্বাস / আমাদের মুখে লেপন করেছে কালিমা/ প্রাচ্য প্রতীচ্যের যত জাতির কাছে, / করেছে ঘৃণিত, নিন্দিত। / তাদের শূকরাদি গালিতে আমাদের মান খ্যাতি / লুটায় ধূলাতে। আর বাস্তবিক, / আমাদের সুকীর্তি যত, / অর্জিত যদিও চূড়ান্ত বীরত্ব আর সাহসের ফলে, / সে খ্যাতির গরিমা লুপ্ত এই মদ্যপানে।*

সুমন (মুখোপাধ্যায়) প্রশ্ন করেছিল: ফর্টিনব্রাসের ব্যাপারটা একেবারে বাদই দিয়ে দিলেন? নাটকের শুরুতেই ডেনমার্ক ও নরওয়ের সম্পর্কে কথা বলা আছে। নরওয়েরাজের কাছে ক্লডিয়াস প্রথমেই দু'জন দূত পাঠান, তাঁরা ফিরে এসে রিপোর্টও করেন। একেবারে শেষের দিকে পোলান্ড অভিযানের সময় ফর্টিনব্রাস ডেনমার্কের মধ্য দিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাওয়ার আগাম অনুমতি চেয়ে নেয়। এসব কূট (নৈতিক) কচালির কোনও প্রাসঙ্গিকতা আমাদের দর্শকদের কাছে নেই বলেই আমার মনে হয়েছে। তাঁদের কাছে হ্যামলেট চরিত্রের এবং সর্বব্যাপী একটি ট্রাজিডিই আসল। তাই ফর্টিনব্রাস প্রসঙ্গ সম্পূর্ণতই বাদ দিয়েছি। নাটকটিকে কেন্দ্রচ্যুত করতে বা দর্শককে অকারণে ভারাক্রান্ত করে দূরত্ব রচনা করতে চাইনি। বরঞ্চ যুদ্ধপ্রস্তুতি বা অস্ত্রসজ্জাকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার। তাই প্রেতাত্মার দৃশ্যের সেই অংশটুকু রেখে দিয়েছি, যেখানে হোরেশিও হ্যামলেটকে প্রশ্ন করছে—

হোরেশিও। *অন্যদিকে প্রতিরাত্রে কেন এই কঠোর সতর্ক পাহারা, / কেন রাত জেগে প্রজাদের এত মেহনত; / প্রতিদিন কেন এত পিতলের কামান ঢালাই, / বিদেশি বাজারে এত সমরাস্ত্র ক্রয়;/রণতরী নির্মাতা কেন বাধ্য/দুঃসাধ্য শ্রমদানে আদি অন্তহীন সপ্তাহের প্রতিদিন,/রবিবার শনিবার নেই কোনও ভেদ! /কী দিন আসন্ন, / যাতে ঘামঝরা ক্ষিপ্র বেগে/ রাত্রি খেটে যায় দিনের সঙ্গে দুই মজুরের মতো!*

আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইতি টানব এই নির্মাণ-কাহিনির। কেউ একজন বলেছেন— হ্যামলেট চরিত্রের দার্শনিকতা বোধহয় তেমনভাবে ধরা পড়ল না। বড় বেশি চঞ্চল, ছটফটে মনে হয়েছে তাকে। আমার আবার মনে হয়েছে যে, হ্যামলেট আদৌ দার্শনিক ছিলই না। সে অবশ্যই পড়াশুনো করা উচ্চমেধাসম্পন্ন আধুনিক এক যুবক। তার নিজস্ব কোনও দর্শন গড়ে ওঠার ইঙ্গিত নাটকে নেই। দার্শনিক হলে সে ধীরস্থিরভাবে সমস্ত কিছুই তার দর্শনের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারত। কিন্তু আজকের যুগের একটি আধুনিক যুবকের মতোই সে ছিল বিভ্রান্ত, যন্ত্রণাক্ষুব্ধ, দ্বিধাদ্বন্দ্বে দীর্ণ। সে ঘটনা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী রি-অ্যাক্ট করে শুধু। শেক্সপিয়র হ্যামলেটকে দিয়ে অনেক গভীর গম্ভীর কথা বলিয়েছেন, তাই এই ভ্রমের উৎপত্তি। নিজেল হাওয়ার্ড বলছেন: 'The play's major conflict takes place in Hamlet's mind, but more espicially in soliloquies which vary according to Hamlet's contradictory moods and warring passions.' নাটকের প্রধান সংকটের উৎপত্তিস্থল তার মন, বিশেষ করে তার স্বগতোক্তিগুলিতে বিপরীত মানসিক অবস্থা কিংবা পরস্পর বিবদমান আবেগের প্রকাশ ঘটে। তাই বুঝতে হবে যে, হ্যামলেট কখনও একটি স্থির বিশ্বাস বা আদর্শ বা দর্শন থেকে কথা বলে না। আগেই বলা হয়েছে he is divided in himself।

প্রশ্ন আরও অনেকেই আছে নিশ্চয়। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো তো জানা নেই, তাই উত্তর দেওয়ার দায়ও নেই।

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

আট

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

১১ মে, মঙ্গলবার ১৯৭১

দুপুরে ভাত খেতে বসেছি, হঠাৎ জোরে কলিংবেল বাজল। বাজল তো বাজল আর থামে না। কে রে কলিংবেলে আঙুল চেপে দাঁড়িয়ে আছে? আমি রেগে হাঁক দিলাম, 'এ্যাই বারেক, দেখ ত' কোন বেয়াদব এরকম বেল টিপে ধরে রেখেছে।'

বারেক দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকল রুমী। চমকে দেবার দুষ্টু চাপা হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত। আমি খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'রুমী তুই?'

রুমী কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে টেবিলে বসল, 'হ্যাঁ আম্মা, ফিরে আসতে হল।'

বারেক ইতোমধ্যেই একটা প্লেট এনে রুমীর সামনে রেখেছে, তাকে বলতেও হয়নি। রুমী প্লেটে ভাত তুলতে তুলতে বারেকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বারেক রান্নাঘর থেকে দুটো শুকনো মরিচ পুড়িয়ে আনতো। দেখবি বেশি পুড়ে যায় না যেন। সাবধানে অল্প আঁচে সেঁকবি আস্তে আস্তে বুঝলি?'

বারেক চলে গেলে রুমী নিচু গলায় বলল, 'আমাদের যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে ঘাপলা হয়েছে। আমার কনট্যাক্ট অন্য রাস্তা জানে না। তাই ক'টা দিন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।'

রুমীর মুখে হাসি নেই, কিন্তু আমার হাসি আর ধরে না।

খাওয়ার পর সবাই বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুনলাম রুমীদের যেতে না পারার কাহিনী। মবু আর শিরাতের আসল নামও রুমী আজ বলতে আপত্তি করল না। মবু অর্থাৎ মনিরুল আলম, সংক্ষেপে মনু আর ইশরাক। ইশরাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের ছাত্র, মনু এম এ'র। দু'জনেই বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। মনু আবার গানও গায়।

মুন-ইশরাকের দলে রুমী ছাড়াও ছিলেন কামাল লোহানী, প্রতাপ হাজরা, বাফার কিছু হিন্দু কর্মচারী ও শিল্পী— তাঁদের পরিবার-পরিজন, আর একজন আহত হাবিলদার। রুমীরা সদরঘাট দিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে প্রায় সাত-আট মাইল পথ হেঁটে যায়। আহত হাবিলদারটিকে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিতে হয়েছিল। কিছুদূর এগিয়ে তাকে তার জানা এক গ্রামে পৌঁছে দেয়। বিকেলের দিকে ঝড়বৃষ্টি হয়, ফলে গ্রামের কাঁচা রাস্তা কাদায় প্যাচপেচে হয়ে যায়। এভাবে অনেক কষ্টে ওরা ধলেশ্বরীর পাড়ে পৌঁছয়। ধলেশ্বরী পার হয়েই সৈয়দপুর। সেখান থেকে আট মাইল দূরে শ্রীনগর। শ্রীনগর থানা তখনও মুক্তাঞ্চল। সেখানে প্রতিদিন ঢাকা থেকে বহুলোকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ছুটে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। মনুরা স্পিডবোটে করে সৈয়দপুর থেকে শ্রীনগর পৌঁছয় সন্ধ্যারাতে। ওখান থেকে আধমাইল দূরে নাগরভাগ গ্রামে ডাঃ সুকুমার বর্ধনের বাড়ি। রুমীদের দল সে রাতটা ডাঃ বর্ধনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরদিন যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়। শ্রীনগর থেকেই নৌকো ভাড়া করে বর্ডারের উদ্দেশে রওনা দিতে হবে। কিন্তু নানা লোকের মুখে খবর পেতে থাকে যে, পাক আর্মি ধলেশ্বরী পার হয়ে সৈয়দপুর দিয়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবেশ করছে। তখন সবাই

অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা

মিলে চিন্তাভাবনা করতে বসে কী করা যায়। নাগরভাগ থেকে সিকিমাইল দূরে আরেকটা গ্রাম—বাসাইল ভোগ, সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের বাড়ি। ২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় প্রেসক্লাবে পাক আর্মির শেলের ঘায়ে তিনি বাম উরুতে আঘাত পান। এখনও ভালো করে সেরে ওঠেননি। কামাল লোহানীসহ কয়েকজন ফয়েজ আহমদের বাড়িতে যান পরামর্শের জন্য। নানারকম চিন্তাভাবনা-সলাপরামর্শের পর ঠিক হয়— পাক আর্মি পুরো অঞ্চল ঘেরাও করে ফেলার আগেই ওদের দলকে যে করেই হোক, ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সে অনুযায়ী ১০ তারিখ ভোররাতে ওরা ফয়েজ আহমদসহ তাঁর বাড়ি থেকে রওয়ানা দেয় কুমিল্লার শ্রীরামপুরের পথে। ওইদিক দিয়ে বর্ডার ক্রস করতে হবে। কিন্তু পথে জানা গেল শ্রীরামপুরে ইতোমধ্যেই পাক আর্মি এসে গিয়েছে। তখন ওরা দিক পরিবর্তন করে ঢাকার দিকে আসা সাব্যস্ত করে। এই আসাটা খুব বিপদসঙ্কুল ছিল। কারণ সৈয়দপুর তখন মিলিটারিকবলিত। সেদিন বিকেলে ঝড়বৃষ্টিও প্রচুর হয়েছিল। রুমীরা অনেক ঘুরপথে একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে, কখনও স্পিডবোটে, কখনও ভাঙা বাসে, কখনও কাদাভরা পথে পায়ে হেঁটে প্রাণ হাতে নিয়ে ঢাকা পৌঁছয় রাত নটার দিকে। রাতটা সবাই কামাল লোহানীর বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকে। আজ সকালে সবাই একসঙ্গে ও বাড়ি থেকে বেরয়নি। দু'তিনজন করে খানিক পর পর বেরিয়েছে যাতে পাড়ার লোকে সন্দেহ করতে না পারে।

সেদিন বিকেলে ঝড়বৃষ্টিও প্রচুর হয়েছিল। রুমীরা অনেক ঘুরপথে একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে, কখনও স্পিডবোটে, কখনও ভাঙা বাসে, কখনও কাদাভরা পথে পায়ে হেঁটে প্রাণ হাতে নিয়ে ঢাকা পৌঁছয় রাত নটার দিকে।

তাও রুমী সোজা বাড়ি আসেনি। দুপুর পর্যন্ত ইশরাকের সঙ্গে থেকে তারপর এসেছে।

১২ মে, বুধবার ১৯৭১

জামীর স্কুল খুলেছে দিন দুই হল। সরকার এখন স্কুল-কলেজ জোর করে খোলার ব্যবস্থা করছে। এক তারিখে প্রাইমারি স্কুল খোলার হুকুম হয়েছে, নয় তারিখে মাধ্যমিক স্কুল।

জামী স্কুলে যাচ্ছে না। যাবে না। শরীফ, আমি, রুমী, জামী— চারজনে বসে আলাপ-আলোচনা করে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম স্কুল খুললেও স্কুলে যাওয়া হবে না। দেশে কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না, দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা। দেশবাসীর ওপর হানাদার পাকিস্তানি জানোয়ারদের চলছে নির্মম নিষ্পেষণের স্টিমরোলার। এই অবস্থায় কোনও ছাত্রের উচিত নয় বই-খাতা বগলে স্কুলে যাওয়া।

জামী অবশ্য বাড়িতে পড়াশোনা করছে। এবার ও দশম শ্রেণীর ছাত্র। রুমী যতদিন আছে, ওকে সাহায্য করবে। তারপর শরীফ আর আমি— যে যতটা পারি।

জামী তার দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে ঠিক করেছে— ওরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে পড়াশুনো করবে। এটা বেশ ভালো ব্যবস্থা, পড়াও হবে, সময়টাও ভালো কাটবে। অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায় ওঁরা হাঁপিয়ে উঠবে না।

১৬ মে, রবিবার ১৯৭১

রোজ তিন-চারটে খবরের কাগজ না দেখলে আমার ভালো লাগে না। ওদের মিথ্যে বানোয়াট খবরের ভেতর থেকে আসল খবর বের করে আনতে আমার খুব মজা লাগে। যেমন গত পরশুর কাগজে দেখলাম: 'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম এ জি ওসমানিকে ২০ মে'র মধ্যে এক নম্বর সেক্টরের উপসামরিক শাসনকর্তার সমীপে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

তার মানে, কিছুদিন থেকে যে স্বাধীন বাংলা বেতারে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানীর নাম শোনা যাচ্ছে, তারই সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তান কাগজে এই খবর!

'কাজে যোগদান সংক্রান্ত সামরিক

টাইম নিউজউইক-এর কয়েকটা কপি নাকি কোন বিদেশির ব্রিফকেসে আত্মগোপন করে, ঢাকা এসেছে। তাতে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক জান্তার বর্বরতা সম্বন্ধে অনেক খবর উঠেছে। আমরাও সবাই উদগ্রীব হয়ে আছি একনজর দেখার জন্য।

সঙ্গের ছবিতে 'টাইম' পত্রিকাটি অবশ্য বাংলাদেশ-জন্মের পরে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত।

আদেশের ব্যাখ্যা' এখনও কাগজে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 'পূর্ব পাকিস্তানের' সর্বত্র অফিস-আদালতে, কলে-কারখানায় নাকি সব দলে দলে যোগ দিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সে সবের ছবিসহ খবরও অনেক ছাপা হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যে। তাহলে এখনও কাজে যোগদান সংক্রান্ত বিষয়ে এত আদেশ— আবার সে আদেশের ব্যাখ্যা এসব কেন? বোঝাই যাচ্ছে সিকিভাগ লোক ওরা মেরে ফেলেছে, সিকিভাগ বর্ডার পেরিয়ে গিয়েছে, আরেক সিকিভাগ গ্রামেগঞ্জে লুকিয়ে আছে, বাকি সিকিভাগ লোক নিয়ে অফিস-আদালত কল-কারখানা ভরাতে ওদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে।

সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও হ্রাস করা হয়েছে। এখন রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত।

ক'দিন আগে শরীফ খবর এনেছে টাইম নিউজউইক-এর কয়েকটা কপি নাকি কোন বিদেশির ব্রিফকেসে আত্মগোপন করে, এয়ারপোর্টে কাস্টমসের শকুনদৃষ্টি এড়িয়ে ঢাকা এসেছে। তাতে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক জান্তার বর্বরতা সম্বন্ধে অনেক খবর উঠেছে। শরীফ চেষ্টা করছে কপিগুলো জোগাড় করার। আমরাও সবাই উদগ্রীব হয়ে আছি একনজর দেখার জন্য। খুব গোপনে, খুব সাবধানতার সঙ্গে কপিগুলো হাতে হাতে ঘুরছে। আমাদের হাতে আসতে কতদিন লাগবে, কে জানে!

১৭ মে, সোমবার ১৯৭১

রেডিও-টিভিতে বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েও 'কর্তাদের' তেমন সুবিধা হচ্ছে না বোধহয়! তাই এখন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ধরে ধরে তাদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল শুরু হয়েছে। আজকের কাগজে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নাম দিয়ে এক বিবৃতি বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও টিচার, রেডিও-টিভির কোনও কর্মকর্তা ও শিল্পীর নাম বাদ গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দে এবং সাগ্রহে সই দিলেও বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী যে বেয়নেটের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আর যে বিবৃতি তাদের নামে বেরিয়েছে, সেটা যে তাঁরা অনেকে না দেখেই সই করতে বাধ্য হয়েছেন, তাতেও আমার সন্দেহ নেই। আজ সকালের কাগজে বিবৃতিটি প্রথমবারের মতো পড়ে তাঁরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইবেন খানিকক্ষণ! এবং বলবেন, ধরণী দ্বিধা হও! এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ভরা বিবৃতি স্বয়ং গোয়েবলসও লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই পূর্ব বাংলার কোন প্রতিভাধর বিবৃতিটি তৈরি করেছেন, জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

২২ মে, শনিবার ১৯৭১

আজ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মেহমানের যা ভিড়। ভাগ্যিস দু'দিন আগে কাসেম ফিরে এসেছে। চারদিনের ছুটিতে, ছাব্বিশ দিন কাটিয়ে এসেছে। তবু তো এসেছে।

সকালে পাশের বাড়ির হেশামউদ্দিন খান সাহেবের বড় দুই মেয়ে খুকী ও খুকুমণি বেড়াতে এসেছিল। ওরাও গ্রামের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের কারও কোনওরকম ক্ষতি হয়নি। ওদের কপাল ভালো— মিলিটারির তাড়া খেয়ে দৌড়তে হয়নি, সম্পূর্ণ অচেনা গ্রামের লোকেরা খুব যত্ন করেছে ওদের। গ্রামের লোকজনের মানসিকতা এইরকম: শহরের লোকজন গ্রামে তো আসে না বেশি, বিপদে পড়ে এসেছেন, তাদের ঠিকমতো খাতির-যত্ন করা উচিত। খুকী আরও বলল, 'কী বলব খালাম্মা অনেক গ্রামে বুড়ো মানুষরা পথের ধারে খানিক দূরে দূরে গুড় আর মটকাভর্তি পানি নিয়ে বসে থেকেছে। লোকজন হেঁটে যেতে যেতে যাতে মাঝে-মাঝে পানি খেয়ে নিতে পারে। অনেক বাড়িতে রাতদুপুরে মুরগি জবাই করে রেঁধে খাইয়েছে। মাচায় তোলা ভালো কাঁথা-বালিশ পেড়ে শুতে দিয়েছে।'

সত্যিই ওদের কপাল ভালো। সকলের বেলায় এরকম আতিথেয়তা জোটে না। আতিথেয়তা জুটলেও মিলিটারির গুলি থেকে রেহাই মেলে না।

খুকুমণিরা থাকতে থাকতেই রেবা এল। ঘণ্টাখানেক গল্প করে তারপর গেল।

মেয়েদের অপমান ও অত্যাচারের কথা, বিশেষ করে বাপ, ভাই, স্বামী বা ছেলের সামনে তাদের বেইজ্জতি করে মেরে ফেলার কথা প্রায়ই কানে আসত। এখন আরও বেশি করে তাদের অপহরণের কথা শোনা যাচ্ছে।

রেবা চলে যাওয়ার পর গোসল করবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি রেণু আর চাম্মু এসে হাজির। ওরা রইল আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত। শরীফ দুটোয় অফিস থেকে ফিরলে সবাই খেতে বসলাম। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর রেণু আমাদের সঙ্গে খেতে বসল, কিন্তু চাম্মুকে কিছুতেই বসাতে পারলাম না। সে শুধু দু'বার দু'কাপ চা খেল, ব্যস।

ওরা যেতে, সাড়ে তিনটেয় আবু আর নজু এল। গতকাল বিকেলে নিউ মার্কেটে আবুর সঙ্গে দেখা— সে রাজশাহী থেকে ঢাকা ট্যুরে এসেছে। তখনই তাকে বাসায় আসতে বলেছিলাম। উদ্দেশ্য: রাজশাহীর খবর জানা। কেন-না এ মাসের প্রথমদিকে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের কাছে গিয়ে রাজশাহী সম্বন্ধে জানতে চেয়ে প্রায় কিছুই জানতে পারিনি। ওসমান গণি স্যার একদিন ফোন করে বললেন, 'ডঃ সাজ্জাদ হোসেন রাজশাহী থেকে ঢাকা এসেছেন।' ডঃ হোসেন বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প, তবু গনি স্যারকে বললাম, 'স্যার ওঁর ঠিকানাটা বলুন, আমি যাব ওঁর কাছে।' ওসমান গনি স্যার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'যেতে চাচ্ছ, যাও। তবে বেশি খোঁচাখুচি কোরো না।'

বুঝলাম। তবে রাজশাহীতে আমাদের আত্মীয়বন্ধু অনেক রয়েছে, রাজশাহীর খবর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু ডঃ হোসেন গম্ভীর গলায় সংক্ষিপ্ত বাক্যে বললেন, রাজশাহীতে সবকিছু ঠিকঠাক আছে, প্রথমদিকে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির কিছু লোকজন জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে তুললেও এখন সব শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। ওসমান গনি স্যারের উপদেশ মনে করে ডঃ হোসেনকে বেশি প্রশ্ন করিনি।

এখন আবুকে পেয়ে ওকে মনের সুখে জেরা করতে শুরু করলাম।

'রাজশাহী তো প্রথমদিকে জয় বাংলার দখলে ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে মার্চের শেষ কয়দিন ই বি আর, ই পি আর ও পুলিশদের সঙ্গে পাক আর্মির খুব যুদ্ধ হয়। তাদের সঙ্গে যোগ হয় স্থানীয় অনেক লোকজন। তারপর পাক আর্মি ক্যান্টনমেন্টে ঘেরাও হয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ক্যান্টনমেন্টের চারপাশ দিয়ে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ওদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে রাখে যে ওরা খাবার কেনার জন্যও বেরতে পারত না। মুক্তিবাহিনীর প্ল্যান ছিল না-খাইয়ে পাক আর্মিকে ঘায়েল করা।'

'পাক আর্মি এমনি চুপচাপ বসে থাকত? গোলাগুলি ছুঁড়ত না?'

'হ্যাঁ ছুঁড়ত। কিন্তু তাতে মুক্তিবাহিনীর বিশেষ ক্ষতি হত না। তারপর ঢাকা থেকে প্লেন এসে মুক্তিবাহিনীর ওপর যখন বম্বিং শুরু করল, তখন একটু বেকায়দা হয়ে গেল।'

'কত তারিখে বম্বিং শুরু হয়?'

'তারিখ তো মনে নেই মামী। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হবে।'

'তোমাদের পাড়ায় বোমা পড়েছিল?'

'না, আমরা ছিলাম মালোপাড়ায়। সেটা শহরের মাঝখানে। প্রথমে ক্যান্টনমেন্টের দিকে বম্বিং হয়, সেটা শহর থেকে তিন মাইল দূরে। প্রথম দিন বম্বিংয়ের খবর পেয়েই আমরা শহর ছেড়ে ১২/১৪ মাইল দূরে একটা গ্রামে চলে যাই আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। ওই গ্রামে তার বাড়ি।'

'গ্রামে কতদিন ছিলে?'

'তা প্রায় মাসখানেক। অনেকে নদী পেরিয়ে বর্ডার ক্রস করে যাচ্ছিল। কিন্তু মামী, আমার ছোট বাচ্চাটা তখন মাত্র দু'মাসের। ওকে নিয়ে নদী পার হওয়া যেত না। তাই বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে গেলাম। পরে শুনেছি, ক্যান্টনমেন্টের চারপাশে মুক্তিবাহিনীর ওপর বম্বিং করে পাক আর্মি হেলিকপ্টারে করে সৈন্যদের জন্য খাবার নামিয়ে দেয়। আর দু'একদিন দেরি হলে সৈন্যগুলো না খেয়ে মারা যেত। তারপর শোনা গেল ঢাকা থেকে আর্মি আসছে রাজশাহী দখল করতে। তখন আরও বহু লোক শহর ছেড়ে পালাল।'

'রাজশাহীতে আর্মি কবে ঢোকে?'

'সঠিক বলতে পারব না— খুব সম্ভব ১২/১৩ তারিখে।'

'তোমরা রাজশাহী ফিরে কী দেখলে?'

'দেখলাম, সারা শহর লণ্ডভণ্ড। বহু জায়গা আগুনে পোড়া। শুনলাম, বহু লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

'শহরে ফিরে এসে অফিসে যোগ দিলে?'

'আমার অফিস আর বাড়ি একই বিল্ডিংয়ে। একতলায় অফিস, দোতলায় বাসা। কী আর করব?'

'সে তো বটেই। তা অফিসে জয়েন করার পর তোমার ওপর কোনও ঝামেলা করেনি?'

'না, আসলে গভর্নমেন্ট অফিস নয় বলেই বোধহয় কোনও ঝামেলা হয়নি।'

আবু জীবন বীমা কোম্পানিতে চাকরি করে।

'ঢাকা এলে কিসে করে?'

শহরে যেসব গেরিলা আসবে, তাদের বাড়িতে লুকিয়ে আশ্রয় দেবে, তাদের খাওয়াবে। একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় খবর পৌঁছে দেবে। পারলে টাকা-পয়সা জোগাড় করে তাদের সাহায্য করবে।

'কোচে।'

'রাস্তায় কী দেখলে?'

'রাজশাহী থেকে ঢাকা পর্যন্ত পুরো রাস্তার দু'পাশে সমস্ত গ্রাম পোড়া। ঢাকা থেকে রাজশাহী যাবার সময় সৈন্যরা রাস্তার দু'পাশের সমস্ত গ্রাম জ্বালাতে জ্বালাতে গিয়েছে। লোকজন যারা পালাতে পারেনি, তারা গুলি খেয়ে মরেছে। গরু-ছাগল মরে প্রায় সাফ হয়ে গিয়েছে।'

শরীফ বলল, 'রাজশাহী বর্ডারে মুক্তিযুদ্ধ কীরকম হচ্ছে, খবর-টবর পাও?'

'পাই মামা। শুধু রাজশাহী বর্ডারে নয় দেশের চারদিকেই বর্ডার ধরে যুদ্ধ হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'দেশের ভেতরেও কিন্তু গেরিলা তৎপরতা শুরু হয়েছে।'

শরীফ বলল, 'আমরা যারা বর্ডার ক্রস করে যুদ্ধে অংশ নিতে পারিনি, তাদের কিন্তু দেশে বসেও অনেক কিছু করার আছে। তুমি ছোট বাচ্চা নিয়ে নদী পেরিয়ে যেতে পারনি বলে আফসোস করছিলে। আফসোস করার কিছু নেই। তুমি রাজশাহীতে ঘরে বসেই যুদ্ধে অংশ নিতে পার।'

আবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল, বললাম, 'শহরে যেসব গেরিলা আসবে, তাদের বাড়িতে লুকিয়ে আশ্রয় দেবে, তাদের খাওয়াবে। একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় খবর পৌঁছে দেবে। পারলে টাকা-পয়সা জোগাড় করে তাদের সাহায্য করবে।'

আবু খুব ধীর নম্রস্বরে বলল, 'আপনাদের কথা আমি মেনে চলব। যতটা সাধ্যে কুলায়।'

২৩ মে, রবিবার ১৯৭১

দেশের অন্যান্য জেলা থেকে ঢাকায় আসা লোকদের সঙ্গে যত বেশি দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে, তত বেশি বেশি খারাপ খবর শুনতে পাচ্ছি। মেয়েদের অপমান ও অত্যাচারের কথা, বিশেষ করে বাপ, ভাই, স্বামী বা ছেলের সামনে তাদের বেইজ্জতি করে মেরে ফেলার কথা প্রায়ই কানে আসত। এখন আরও বেশি করে তাদের অপহরণের কথা শোনা যাচ্ছে।

এখন আরও বেশি পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারি তাঁবেদাররা যখন-তখন লোকের বাড়িতে ঢুকে টাকা-পয়সা, সোনাদানা লুটেপুটে নিচ্ছে। দোকানপাটে ঢুকেও যেটা খুশি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কাজগুলো, লোকমা তুলে ভাত মুখে দেওয়ার চেয়েও সহজ। যে-কোনও বাড়িতে ঢুকে রাইফেল উঁচিয়ে সবাইকে সার বেঁধে দাঁড় করালেই হল। গুলি খরচ না করলেও চলে, মারারও দরকার হয় না। ভয়ের চোটেই টাকা-পয়সা, সোনাদানা সবাই বের করে দেয়। অনেক বাড়িতে গৃহস্থ নিজেই টাকা-পয়সা, সোনাদানা আগ বাড়িয়ে বের করে দেয়—এই নাও সব দিচ্ছি, জানে মেরো না। আজকাল ওরা নিজেরাও একটু কম জানে মারছে, টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঢাকাতেও কোনও কোনও অঞ্চলে এগুলো নাকি হচ্ছে। যদিও আমাদের চেনাজানার মধ্যে কারও এখনও হয়নি।

আমার গহনাগাটি বেশি নেই কিন্তু যেটুকু আছে, সেটুকু গেলে আর তো কোনওদিন করতে পারব না। মা'ও উদ্বিগ্ন, তাঁর গহনাপত্রগুলো রেখেছেন দুই ছেলে বউকে দেওয়ার জন্য। ছেলেরা বিদেশে— কবে দেশে আসবে আর বিয়ে করবে, তার ঠিক নেই। তবু গহনাগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা তো করা দরকার।

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম উঠোনে গর্ত করে পুঁতে রাখব। তবে শুনেছি— ওরা অনেক বাড়ির উঠোন খুঁড়ে দেখে। গ্রামে নাকি কাঁচাঘরের মেঝে পর্যন্ত খুঁড়ে দেখে। তাহলে?

রুমী বলল, 'জিনিসগুলো পুঁতে তার ওপর একটা লেবুগাছ লাগিয়ে দাও। তবে ছোট গাছ লাগালে ওরা সন্দেহ করতে পারে। বেশ একটা বড় গাছ আনতে হবে। দেখে যেন মনে হয় দু'তিন বছরের পুরনো গাছ।'

'বড় গাছ তুলে আনলে কি বাঁচবে?'

'চারপাশে অনেক বেশি মাটি নিয়ে খুঁড়ে তুলতে হবে যাতে শেকড় কাটা না যায়।'

তাই ঠিক হল। শরীফের জানাশোনা এক নার্সারি থেকে বড় একটা লেবুগাছ আনানোর ব্যবস্থা করা হল।

আমি বললাম, 'চল, মা'র বাসায় যাই। গহনা রাখার বন্দোবস্ত হয়েছে, বলে আসি।'

মা'র বাসা যেতেই দেখি উনি বাইরে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছেন। কী ব্যাপার? খবর এসেছে রাজশাহীতে তারার ভাইকে বিহারিরা মেরে ফেলেছে। তারা মায়ের মামাতো ভাইয়ের মেয়ে, আসাদ গেটের কাছে নিউ কলোনিতে থাকে। বললাম, 'চলুন আপনাকে তারার বাসায় নামিয়ে দিই। আমরাও একটু দেখা করে আসি ওদের সঙ্গে।'

নিউ কলোনিতে আমরা একটুক্ষণ বসে রইলাম। মা এখন খানিকক্ষণ ও বাড়িতে থাকবেন। ওখান থেকে গেলাম রাজারবাগ এলাকায় আউটার সার্কুলার রোডে মান্নান ও নূরজাহানের বাড়ি। ইঞ্জিনিয়ার মান্নান শরীফের বন্ধু ও সহকর্মী। ক্র্যাকডাউনের আগে মান্নানের চাচাতো ভাইয়ের বিয়েতে চাটগাঁ গিয়ে ওরা ছেলেমেয়েসুদ্ধ সবাই আটকা পড়েছিল। সপ্তাহখানেক হল ঢাকা ফিরেছে। ওদের বাসায় গিয়ে নূরজাহান আর মান্নানের মুখে শুনলাম ওদের জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু লোমহর্ষক কাহিনী।

চাটগাঁর ও আর নিজাম রোডে ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অফিস ও রেস্টহাউস। মান্নানরা সপরিবারে ওখানেই ছিলেন। ২৬ মার্চ সকালে বাই রোডে গাড়িতে ওদের ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার কথা। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে মান্নানের বন্ধু আরেক ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেব ফোনে ঢাকায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ঢাকার গোলমালের কথা জানতে পারেন। পরে আরও এঁর-ওঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে ওরা ক্র্যাকডাউনের ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। ফলে ওরা চাটগাঁতেই থেকে যেতে বাধ্য হলেন। ২৬ ও ২৭ মার্চ অবশ্য মান্নানরা চাটগাঁতে রাস্তায় বেরতে পেরেছিলেন, যদিও ২৬ মার্চ রাতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছোড়া ট্রেসার হাউইয়ের আলো দেখতে পেয়েছিলেন এবং গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। ক্যান্টনমেন্টটা ওদের রেস্টহাউস থেকে বেশিদূরে ছিল না। ২৮ তারিখ সকালে বাধল বিপত্তি। রেস্টহাউসের পিছনে প্রবর্তক সংঘের পাহাড়, সামনে পুলিশ লাইনের পাহাড়। ওইদিন সকালে হঠাৎ প্রবর্তক সংঘের পাহাড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা পজিশন নিয়ে পুলিশ লাইনের দিকে গুলিগোলা ছুড়তে শুরু করে। পুলিশরাও ওদের দিকে গুলিগোলা ছুড়তে থাকে। নূরজাহান বলল, 'সে যে কী অবস্থা আপা। রেস্টহাউসের মাথার ওপর দিয়ে সমানে গুলিগোলা ছুটে যাচ্ছে। ভাবলাম, আর রক্ষে নেই। এইবার শেষ। ছুটে সবাই দোতলা থেকে নেমে নীচের অফিস ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে উঠে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। বেলা দুটো পর্যন্ত এইরকম চলল। দুটোর পর মাথার ওপর দিয়ে গুলি করছে। তখন মনে হল, আমাদের বাড়িতে নিশ্চয় আসবে, আর গুলি ছোটা বন্ধ হল। তারপর শব্দ শুনে মনে হল খানসেনারা পাহাড় থেকে নেমে বাড়ি বাড়ি ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে সব গুলি করে মারবে। শেষপর্যন্ত কপাল ভালো, ওরা আর আসেনি। তিনটের দিকে সব শান্ত হতে আমরা ঠিক করলাম, এখানে আর নয়। যে করেই হোক, নন্দনকাননে বাঁকা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে। সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়া রিস্কি, তাই ঠিক করলাম ডানদিকে এলিট পেইন্টের মালিকের বাড়ির পাশ দিয়ে যে গলি রাস্তা আছে, ওইদিক দিয়ে লুকিয়ে-ছাপিয়ে যেতে হবে। খানিক দূরে যেতেই একটা বাড়িতে দেখি এক দম্পতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে দেখে গলিতে নেমে এলেন। আমরা এদিক দিয়ে নন্দনকানন যাওয়ার চেষ্টা করছি শুনে বললেন, পাগল হয়েছেন! নন্দনকানন পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবেন না। পাকসেনারা সব জায়গায় টহল দিচ্ছে।

রেস্টহাউসের মাথার ওপর দিয়ে সমানে গুলিগোলা ছুটে যাচ্ছে। ভাবলাম, আর রক্ষে নেই। এইবার শেষ। ছুটে সবাই দোতলা থেকে নেমে নীচের অফিস ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে উঠে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। বেলা দুটো পর্যন্ত এইরকম চলল।

একবার দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। তার চেয়ে আমাদের বাসায় থাকুন। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দম্পতির এইরকম আন্তরিক ব্যবহারে খুব মুগ্ধ হলাম। পরে জেনেছিলাম ভদ্রলোকের নাম আবদুল হাই। আমাদের জোবেদা খানম আপার ভাই।

'ওদের বাসা ৪/৫ দিন ছিলাম। তারপর ৩০ তারিখ দুপুরের পর বম্বিং হল— আমরাও বাসার জানালা দিয়ে দূরের আকাশে পরিষ্কার প্লেনগুলো দেখতে পেলাম। ওঁদের বাসায় ৪/৫ দিন থাকার পর আবার আমরা রেস্টহাউসেই ফিরে গেলাম।'

'স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে পেয়েছিলে? প্রথম কবে শুনেছিলে?'

'২৬ তারিখ রাতেই। জামান সাহেবের রেডিও ছিল, উনি ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ পেয়ে যান। তারপর রোজই শুনতাম। আমাদের ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর তো কোনও কাজ ছিল না, তাই রেডিওটাই শোনা হত বেশি। আকাশবাণী, বিবিসি, রেডিও অস্ট্রেলিয়া, স্বাধীন বাংলা বেতার— সবই শুনতাম। তবে ৩০ তারিখে বম্বিংয়ের পর তিন-চারদিন স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে পাইনি। তারপর যখন চাটগাঁ-ঢাকা প্লেন সার্ভিস শুরু হল, তখন প্লেনে সিট পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। দু'সপ্তাহ পরে সিট পেয়ে এইতো গেল সপ্তাহে ঢাকা এসেছি। এই দু'সপ্তাহ কী করতাম জানেন? সকালে কারফিউ উঠলে নাশতা খেয়েই ছেলেমেয়ে, বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে এয়ারপোর্ট যেতাম, ফিরতাম বিকেলে কারফিউ শুরু হওয়ার আগ দিয়ে।'

'বল কী? দুপুরের খাওয়া-দাওয়া?'

'প্রথম দিনের পর থেকে স্যান্ডউইচ, ফ্লাস্কে চা, পানি এসব নিয়ে যেতাম।'

'কেন সারাদিন বসে থাকতে হত কেন?'

'প্লেনে মিলিটারির লোকজন আগে সিট পেত। অল্প কটা সিট সিভিলিয়ানদের দেওয়া হত। এয়ারপোর্টে গিয়ে লাইন করে দাঁড়াতে হত। কবে কটা সিট সিভিলিয়ানদের দেবে, তার কোনও স্থিরতা ছিল না। আর লাইন ছিল লম্বা।'

পতেঙ্গা এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বসে অপেক্ষা করার সময় একটা সাংঘাতিক দৃশ্য নূরজাহান এবং নিশ্চয় বাকি সবারও চোখে পড়ত। সবাই সেটা না দেখারই ভান করত। এখন বলতে নূরজাহান শিউরে উঠল, 'একদিন হঠাৎ দেখি কী বেশ দূরে একটা দোতলা বিল্ডিংয়ের সামনে ট্রাক থেকে লোক নেমে লাইন করে ভেতরে ঢুকছে। ট্রাকের সামনে মেশিনগান হাতে মিলিটারি দাঁড়িয়ে। দোতলার জানালা খোলা ছিল। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম ঘরের ভেতরে খানসেনারা চাবুক দিয়ে লোকগুলোকে মারছে।'

'বল কী! চিৎকার শুনতে পেতে?'

'না, বিল্ডিংগুলো বেশ দূরে ছিল। তবে মাঝখানটা ফাঁকা মাঠ বলে দেখা যেত। ঘরের মধ্যে জানালাগুলো ওরা বন্ধ করে নেওয়াও দরকার মনে করত না। দিনেরবেলা রোদের আলোতে এত দূর থেকেও ঘরের ভেতরের সব দেখা যেত। দূর বলে চিৎকার শুনতে পাইনি, তবে চাবুকের ওঠানামা বুঝতে পারতাম।'

'রোজ রোজ ট্রাকে করে লোক নিয়ে আসত?'

'যে কদিন এয়ারপোর্টে বসে থেকেছি, প্রায় রোজই দেখেছি। যা ভয় লাগত আপা, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত ভয়ে। কিন্তু কী করব, না দেখার ভান করে বসে থাকতাম। আবার ওদিকে না তাকিয়েও পারতাম না।' (ক্রমশ)

কবিতা-পরিচয়

‘নৌকাডুবি’: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বুদ্ধদেব বসু

শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে:
চক্রবালে শুভ্র মেষপাল
নিশ্চিন্তে বেড়ায় চরে। কদাচিৎ খোঁড়ায় রাখাল
স্নিগ্ধ বনান্তরে।।

খালি গোলাঘরে সারা, ভাঙা হাটে শুরু,
পায়ে চলা পথে কে একাকী?
দু চোখে সোনার স্বপ্ন; পসরায় ফাঁকি আর বাকী
সহসা অগুরু।।

কিন্তু বেলা পড়ে আসে: দ্রুত উবে যায়
মহাশূন্যে মাঠের হরিৎ;
নির্ভার আবহে স্ফূর্ত অন্তর্ভৌম অমার সরিৎ
পৃথিবী ডোবায়।।

নৌজীবী অগত্যা পান্থ; অনন্য সম্বল
মজ্জমান সাধের তরণী:
উত্তরঙ্গ জলোচ্ছ্বাসে তাই তার সমগ্র ধরণী,
উদ্ধৃত্ত মঙ্গল।।

অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক:
অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা;
বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক।

তথাচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আদিভূতে
হবে স্বাভাবিক।।

‘বন্ধু সব মৃত— আর নামে না উদার সন্ধ্যা বারান্দায়
হালকা ভেলা দোলে না উতলঢেউ কথোপকথনে—
খেলা, কিন্তু পরিণামে সামুদ্রিক যান।’

‘শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে: — পাঠকের মনে একটি গতানুগতিক ছবি জেগে ওঠে— উজ্জ্বলতা, নীলিমা, তৃপ্তি ও সফলতা, এইসব নিয়ে ‘শরতের সমারোহ; কোলন চিহ্নের দ্বারা ছবিটিকে ফ্রেমে আটকে দেওয়া হল। ‘চক্রবালে শুভ্র মেষপাল/ নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ’রে’;— এই মেষপাল কি বীতবৃষ্টি শাদা মেঘ না কি সত্যিকার চতুষ্পদ প্রাণী? দু-ই সম্ভব, কিন্তু পরবর্তী অংশের সঙ্গে সংগতিরক্ষার জন্য প্রাণী বলে ধরে নেওয়াই ভালো। এর পরেই অনেকগুলি প্রশ্ন জাগে: রাখাল ‘বনান্তরে’ কী করছে (সে কি তবে প্রান্তরবিহারী মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণ করছে না?); সেই ‘বনান্তর’ স্নিগ্ধ কেন (তাহলে প্রান্তরটি কি রুক্ষ?); সে খুঁড়িয়ে চলে কেন? আর, ‘কদাচিৎ শব্দটি কি বিশেষ্যপদের বিশেষণ, না কি ক্রিয়ার— অর্থাৎ, রাখাল কি আসলে সুস্থ পদের অধিকারী কিন্তু ক্বচিৎ কখনও, কোনও বিশেষ কারণে খুঁড়িয়ে চলে, না কি ওই ‘স্নিগ্ধ বনান্তরে’ (যেহেতু বাংলায় একবচন শব্দও বহুবচনের অর্থ ধারণ করে) কদাচিৎ রাখাল দেখা যায় এবং সেই ক্বচিৎদৃষ্ট রাখালেরা সকলেই খঞ্জ?

সবগুলি প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনি; তবে এ-মুহূর্তে আমার যা মনে হচ্ছে তা এই। দ্বিতীয় স্তবকে উল্লিখিত পথিকটি ‘ভাঙা হাটে’ যাত্রা শুরু করে ‘খালি গোলাঘরে’ তা সমাপ্ত করছে; এর সঙ্গে অন্য, কৃতী ব্যক্তিদের অবস্থার প্রতি-তুলনা প্রচ্ছন্ন আছে বলে ধরে নেওয়া যায়; অতএব অনুমেয় যে প্রথম স্তবকের প্রান্তরটি রুক্ষ নয়, বরং পক্বপ্রায় শস্যে আকীর্ণ (‘প্রকাণ্ড’ বিশেষণ ও ‘সমারোহ’ শব্দেও তার ইঙ্গিত আছে), মেষপাল ‘নিশ্চিন্তে’ চরে বেড়াচ্ছে; ঋতু এখন শমিত ও নির্বিঘ্ন বলে রাখালের কর্তব্য বিশেষ কিছু নেই, তাই সে বা তারা (একাধিক রাখালই সংগত) উন্মুক্ত ও রৌদ্রতাপিত প্রান্তর ছেড়ে ‘স্নিগ্ধ’ (বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন) কোনও বনে সরে পড়েছে, তাদের ‘খঞ্জতা’ তাদের কর্মহীনতা বা আলস্যেরই নির্দেশক। ‘কদাচিৎ’ শব্দটিকে আমি ‘রাখাল’-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করছি, ‘খোঁড়ায়’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে নয়; অর্থাৎ, বনে রাখালেরা বিরল, এবং যারা আছে তারা বিশ্রান্ত— অনেকেই হয়তো ছুটি পেয়ে বাড়ি চলে গিয়েছে। নিশ্চিন্ত মেষপাল ও কর্মহীন রাখালের উল্লেখ তৃপ্তি ও সফলতার ছবি আরও উজ্জ্বল হল।

'খোঁড়ায়' শব্দের অন্য একটি ব্যাখ্যাও সম্ভব। কবিতাটিতে পর্যায়বদ্ধভাবে: অনেকগুলি প্রতি-তুলনা ব্যবহৃত হয়েছে; প্রথম স্তবকেই পাচ্ছি 'প্রান্তরে'র সঙ্গে বনের, এবং মেষপালের স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে ('নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে') মেষপালকের খঞ্জতার প্রতি-তুলনা। পশু নিশ্চিন্ত, কিন্তু মানুষ খঞ্জ; আশ্রিতেরা (অজ্ঞতাবশত) নিশ্চিন্ত, কিন্তু আশ্রয়দাতা (অক্ষমতাবশত) খঞ্জ (ও পলাতক) ; পরবর্তী স্তবকগুলিতে যে-বৈশ্বিক সর্বনাশ ঘটল এখানে তারই পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে; রাখালের 'খঞ্জতা'র (বা বিকলতার) দ্বারাই পরে আরও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হল কবিতার নায়ক; রাখালদের 'বনান্তরে' (বনের অভ্যন্তরে, অন্তরালে) অবস্থান যেন বিশ্বের প্রতিপালকের অভাব সূচনা করছে। এই লেখাটির পাণ্ডুলিপির একজন পাঠক আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে কৃষ্ণও রাখাল, সেই সূত্র অনুধাবন করে এমন অর্থ করা অসম্ভব নয় যে ভগবান সম্প্রতি খঞ্জ হয়ে বনের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছেন; বিশ্ব অনাথ, এবং শরতের এই 'সমারোহ' প্রতারণামাত্র। (প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় যে মহাভারতের কৃষ্ণ একটি বনমধ্যে ব্যাধের তিরে নিহত হন, সেই তির তাঁর চরণে বিদ্ধ হয়েছিল।) শ্রীনরেশ গুহ মৌখিক আলোচনা প্রসঙ্গে আর-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন: রবীন্দ্রনাথের রাখালের সঙ্গে এই রাখালের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। 'ক্ষণিকা'য় রবীন্দ্রনাথ 'ব্রজের রাখাল বালক' হতে চেয়েছিলেন; 'পূরবী'তে ('তপোভঙ্গ') তিনি মহাদেবকে বলেছেন 'কালের রাখাল', কিন্তু 'রাখাল' শব্দের সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যবহার তাঁর সর্বজনপ্রিয় গানটিতে:

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি;
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।।
শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে
মধুরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আখি।
— 'গীতবিতান', ২য় সংস্করণের পাঠ

রবীন্দ্রনাথের এই স্তবকে আছে 'প্রান্তর', সেই প্রান্তর 'শান্ত', (ঋতুর পার্থক্য সত্ত্বেও 'নৌকাডুবি'র প্রথম দুই পংক্তির আবহ একই ধরণের), রাখাল এখানে স্বস্থ ও বংশীবাদক, এবং ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত 'রুদ্র' (প্রাকৃত আদিম দেবতা) তুচ্ছ রাখালের বংশীধ্বনিতে মনোযোগী। অসম্ভব নয়, যে 'নৌকাডুবি' রচনাকালে এই ঈশ্বরপালিত রাবীন্দ্রিক রাখাল সুধীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল, বৈষ্ণব কাব্যেও রবীন্দ্রনাথের বহুল ব্যবহারের ফলে বাংলা

এই আলোচনা আমি এত দূর পর্যন্ত টেনে আনছি এইজন্য যে 'খোঁড়ায়' শব্দটি বিস্তর ভাবিয়েছে আমাকে; এবং এখন আমার মনে হচ্ছে যে বনান্তরে প্রচ্ছন্ন খঞ্জ রাখালকে অক্ষমতাপ্রাপ্ত অপসৃত ভগবানের চিত্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করাটা অযৌক্তিক নয়...

কবিতায় 'রাখাল' এখন 'খঞ্জ' (অচল) হয়ে গিয়েছে, (যযাতি'তে 'রেণু, বেণু, ধেনু' বিষয়ে মন্তব্য স্মরণীয়) কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এই রাখালটিকে কবিপ্রসিদ্ধির জীর্ণতা থেকে ছাড়িয়ে এনে একটি নতুন ও বিপরীত অর্থে কাজে লাগালেন। এই আলোচনা আমি এত দূর পর্যন্ত টেনে আনছি এইজন্য যে 'খোঁড়ায়' শব্দটি বিস্তর ভাবিয়েছে আমাকে; এবং এখন আমার মনে হচ্ছে যে বনান্তরে প্রচ্ছন্ন খঞ্জ রাখালকে অক্ষমতাপ্রাপ্ত অপসৃত ভগবানের চিত্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করাটা অযৌক্তিক নয়, কেননা 'নৌকাডুবি'র পরবর্তী অংশের সঙ্গে, এবং সুধীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সংগতি রয়েছে। এভাবে দেখলে, আমরা আলোচ্য কবিতার শুধু প্রথম দুই পংক্তিতে শারদীয় (প্রতারক) প্রসন্নতার ছবি পাব, কবিতার তৃতীয় পংক্তি থেকেই সূচিত হবে আসন্ন ট্র্যাজেডি।

দ্বিতীয় স্তবকে প্রবেশ করল কবিতার নায়ক বা অনায়ক; সে নিঃসঙ্গ, তাকে আমরা প্রথম দেখলাম 'পায়ে চলা পথে' (খেতের আলও হতে পারে); বুঝে নিতে হবে সে হাঁটছে, 'ভাঙা হাটে' যাত্রা শুরু করে তা শেষ করবে 'খালি গোলাঘরে'। অর্থাৎ, সে কিছুই সঞ্চয় করেনি, এখন পর্যন্ত কিছু উপার্জন করেছে কিনা তাও জানা যায় না; অথচ তার আশা বিরাট ('দু-চোখে সোনার স্বপ্ন'— সোনা: পাকা ধান, প্রভূত ধন, স্বর্ণমৃগ, 'সোনার তরী', সৌন্দর্যের, আনন্দের অলীকের প্রতীক); এবং সে একেবারে নিঃসম্বল বা নিশ্চেষ্টও নয়; কেননা তেমন সারবান না-হলেও কিছু 'পসরা' তার আছে, এবং হাঁটতে হলেও কিছুটা চেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু অকস্মাৎ, বিনা ভূমিকায়, বিনা আয়োজনে, এবং আপাতত বিনা চেষ্টায় 'পসরার ফাঁকি আর বাকী' হালকা ('তা-গুরু') হয়ে গেল লোকটির কাছে, অন্তর্হিত হল ব্যর্থতাবোধ, কবি যদিও ওখানেই কথাটা শেষ করে দিলেন, তবু সহজেই অনুমেয় যে সে-মুহূর্তে লোকটিকে অধিকার করলে এক দৈব প্রেরণা, সত্তার বিস্তারবোধ, তার পথ-চলার এক সার্থক লক্ষ্য যেন প্রতিভাত হল তার সামনে— কবিতা রচনাকালে, বা রচনার আরম্ভকালে কবির মন থেকে যেমন 'প্রত্যহের ভার' ক্ষণিকের জন্য নেমে যায়, অনেকটা সেই রকম। ('ভাঙা হাট' ও 'পসরা'র পিছনে হয়তো বা ছিল 'ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস/পসরা লয়ে?' ('ক্ষণিকা': 'অকালে') এই পংক্তিটির স্মৃতি; কিন্তু, না-বললেও চলে, এই কবিতার সঙ্গে 'নৌকাডুবি'র কোথাও কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই।

তৃতীয় স্তবকের প্রথম শব্দ হিসেবে 'কিন্তু' আমরা সুধীন্দ্রনাথের কাছে আশাই করেছিলাম। 'কিন্তু বেলা প'ড়ে আসে': 'সমারোহ' শব্দটির ওপর নির্ভর করে ধরে নিতে দোষ নেই যে কবিতাটির আরম্ভ মধ্যাহ্নে ('ম ধ্য দি নে' যবে গান বন্ধ করে পাখি'), 'দিন যখন উজ্জ্বলতম; তৃতীয় স্তবকে সন্ধ্যা পেরিয়ে দ্রুত নেমে এল রাত্রি ('অমার সরিৎ'); অবশ্য এই সন্ধ্যা ও রাত্রির সাংকেতিক অর্থ খুবই স্পষ্ট। 'দ্রুত উবে যায়/মহাশূন্যে মাঠের হরিৎ': 'উবে' শব্দটি লক্ষ করুন; উবে গেল, শূন্যে মিলিয়ে গেল, একটি বায়বীয় ঊর্ধ্বারোহণের ভাব পাচ্ছি এখানে; কিন্তু এই স্তবকেরই শেষ শব্দ হল 'ডোবায়'; দ্রুত পারম্পর্যে দুটি বিপরীত ক্রিয়া সম্পন্ন হল এখানে; আমাদের চেতনায় প্রতিভাত হল 'আরোহণের পরমুহূর্তেই নিমজ্জনের ছবি; একই ক্রিয়ার দুই অংশ, এবং এই দুই অংশ বিপরীত বলে কবিতার কঠিন ক্লাসিক বাঁধুনির মধ্য থেকে আমাদের মনে সঞ্চারিত হল অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। 'নির্ভার আবহে স্ফূর্ত অন্তর্ভৌম অমার সরিৎ/পৃথিবী ডোবায়।।': এই অংশের প্রতিটি শব্দ লক্ষণীয়; 'নির্ভার'-এ পূর্ববর্তী 'অগুরু'র ধারণা ফিরে এল, কিন্তু এবারে তাতে কিছুটা শ্লেষ ধ্বনিত হচ্ছে; যে-নির্ভার আবহে (বাতাসে আর জলকণা নেই, সেই অর্থেও শারদীয় আবহ নির্ভার) লুপ্ত হয়েছিল অকৃতার্থতার চেতনা ('পসরায় ফাঁকি আর বাকী/সহসা অগুরু'),

তাতেই এখন 'স্ফূর্ত' (বিকশিত) হল 'অন্তর্ভৌম অমার সরিৎ'। অন্ধকার নয়, অন্ধকারের নদী;— স্থাণু ও নির্বস্তুক অন্ধকার গতিশীল ও তরল হয়ে উঠল (রবীন্দ্রনাথের 'যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়/করি আঁধারের অনুসরণ' তুলনীয়), এবং এই তিমিরবন্যা 'অন্তর্ভৌম', ভূতলবর্তী, অর্থাৎ প্রথম স্তবকে বর্ণিত প্রান্তরের তলে তা আবহমান প্রচ্ছন্ন ছিল, তার উত্থান ও স্ফূর্তিও অবশ্যম্ভাবী, সেটাই চরম, 'শরতের সমারোহ' ক্ষণকালীন উদ্ভাসমাত্র (এখন বোঝা যাচ্ছে 'সমারোহ' শব্দটি নিতান্ত নিরীহ নয়, তাতে ঈষৎ ব্যঙ্গ ও বেদনা লুকিয়ে ছিল)। 'স্ফূর্ত' শব্দটি সাধারণত আনন্দদ্যোতক, কিন্তু তার নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর পাচ্ছি 'ডোবায়' শব্দে; যা 'স্ফূর্ত' হল তা-ই প্রলয়ের দূত, যা সৃষ্টিসূচক তা-ই কালান্তক;— এই প্রতি-তুলনাগুলি এই অংশের অভিঘাত তীব্র করে তুলছে। অগত্যা পদাতিককে হতে হল এক মজ্জমান তরণীর নাবিক ('যযাতি'র 'মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে' স্মর্তব্য); এই নৌকোই 'অনন্য সম্বল' তার, এটাই সেই মিল্টন-কথিত 'one talent' ; ফুটো হোক, ভাঙা হোক, তলিয়ে যাক, এর কোনও বিকল্প নেই।

চতুর্থ স্তবকের শেষ দুই পংক্তিতে একটি সমস্যা দেখা দেয়। 'দশমী'তে ও 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ' বইটিতে যদি কোনও ছাপার ভুল বা অশুদ্ধ পাঠ না-থেকে থাকে, তাহলে তৃতীয় পংক্তির 'উত্তরঙ্গ'কে 'জলোচ্ছ্বাস'-এর বিশেষণরূপে গ্রহণ করতে আমি রাজি নই। (কেননা ক্রিয়াপদের অভাবে পংক্তিটিকে অন্বয়দুষ্ট মনে হয়, আর সুধীন্দ্রনাথের কবিতা কখনও ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে না।) আমার মতে পংক্তিটির অন্বয়: 'তাই তার সমগ্র ধরণী জলোচ্ছ্বাসে উত্তরঙ্গ (বিক্ষুব্ধ, উল্লোল, তরলতাপ্রাপ্ত) [হ'লো]।' অথবা, যদি 'জলোচ্ছ্বাসে'-র বদলে 'জলোচ্ছ্বাস' পড়া যায়, তাহলে: 'তাই তার সমগ্র ধরণী উত্তরঙ্গ জলোচ্ছ্বাস [-এ পরিণত হ'লো]।' এই পংক্তির শেষে সেমিকোলন থাকলে ভালো হত, কেননা 'উদ্বৃত্ত মঙ্গল' একটি সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র বাক্য। 'উদ্বৃত্ত' অর্থ এখানে 'অবশিষ্ট' নয়, এই প্রসঙ্গে তা হতেই পারে না; এখানে 'উদ্বৃত্ত' অর্থ 'উৎক্ষিপ্ত' উদ্‌ঘূর্ণিত;— এই বন্যায় মঙ্গলের সম্ভাবনা সুদ্ধ বিপর্যস্ত হল। অথবা, শ্রীনরেশ গুহর পরামর্শ অনুসারে বলছি, তৃতীয় পংক্তির শেষে কমা যদি শুদ্ধ পাঠ হয়, তাহলে 'তার' শব্দের সঙ্গে 'উদ্বৃত্ত মঙ্গল'কে অন্বিত করা সম্ভব; অর্থাৎ, যেমন তার (কবিতার নায়কের) সমগ্র ধরণী এখন উত্তরঙ্গ, তেমনি (সেই ব্যক্তির) মঙ্গলও বিনষ্ট। কিন্তু এই অন্বয় মেনে নিয়েও বলা যায় যে এই সর্বনাশ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বৈশ্বিক; 'উদ্বৃত্ত মঙ্গল'কে স্বতন্ত্র বাক্য ধরলে সেই অর্থ জোরালো হয়, এবং পঞ্চম স্তবকের করাল চিত্রের সঙ্গে চতুর্থ স্তবকের শেষ পংক্তিটিকে দৃঢ়তরভাবে সম্পৃক্ত করা যায়। (লক্ষণীয়, পঞ্চম স্তবকে কোনও ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখ নেই।)

মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে সে হবে 'স্বাভাবিক'— স্বাভাবিক, প্রাকৃত, আদিম, মনোহীন, জড়। 'স্বাভাবিক'-এর এই বিশেষ বোদলেয়ারীয় অর্থ মনে না-রাখলে এই কবিতা পড়া ব্যর্থ হবে।

পঞ্চম স্তবকে নৈরাশ্য আরও গাঢ়, বিলয় আরও আসন্ন। যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত একটি নিঃশ্বাসরোধক ব্যায়ামের নাম 'কুম্ভক', এখানে অবশ্য মৃত্যুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই না 'অন্তিম' ও 'অপ্রতিকার্য', এবং 'নাস্তির কিনারা'ও (সীমা, তীর) অনুত্তরণীয়। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন 'হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়/বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি রয়', তখন একটা 'বিরাট বিশ্ব'কে মঙ্গলময় বলে ভেবেছিলেন ('বাহু' শব্দে অভ্যর্থনাসূচক আলিঙ্গনের ইঙ্গিত আছে), কিন্তু তুলনীয় অবস্থায় সুধীন্দ্রনাথের পদাতিক নাবিকটি অসীম শূন্যে মজ্জমান; 'মর্ত্যের বন্ধনে' সে আশ্রয় পায়নি, অমর্ত্যও তার পক্ষে অস্তিত্বহীন; তার বৈকল্য এমন ব্যাপক যে জলমগ্ন চুম্বকশৈল, ও ধ্রুবতারা— অর্ণবপোতের এই গুপ্ত শত্রু ও প্রকাশ্য বন্ধুও এখন তার কাছে নির্ভেদ— অর্থাৎ, ধ্বংসের হাতে আত্মসমর্পণ ভিন্ন তার উপায় নেই। 'তুঙ্গী' শব্দটি 'তুঙ্গে'র বিকল্প নয়, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের একটি পরিভাষা; বিশেষ-বিশেষ রাশিতে বিশেষ বিশেষ গ্রহ অবস্থিত থাকলে তাকে 'তুঙ্গী' বলা হয়; অর্থাৎ, 'মগ্ন চুম্বক'-এর সঙ্গে যার প্রতি-তুলনা করা হচ্ছে তা ধ্রুবতারার সেই অবস্থা, যখন তা সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও কল্যাণপ্রসূ। কিন্তু 'তুঙ্গী ধ্রুবতারা'ও নাবিকটিকে বাঁচাতে পারবে না।

ষষ্ঠ স্তবকের আরম্ভে 'তথাচ' শব্দও আমাদের প্রায় প্রত্যাশিত ছিল, যেহেতু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় 'কিন্তু'র পরে 'তবু' আমরা বহুবার পেয়েছি। (একটি প্রস্তাব, তার উত্তর, সেই উত্তরের প্রত্যুত্তর, অবশেষে মীমাংসা): তাঁর কবিতায় এই জ্যামিতিক গঠন আমাদের সুপরিচিত। 'অভাবে যবে তলাবে নাবিক': ক্ষমতার অভাবে, আশ্রয়ের অভাবে, ভগবানের অভাবে, নাস্তির গর্ভে, কিন্তু 'অভাব' শব্দের অন্য একটি অর্থ, 'ধ্বংস' বা 'মৃত্যু'ও এখানে ধ্বনিত হচ্ছে; 'দশমী'র প্রথম কবিতা 'প্রতীক্ষা'র চতুর্থ স্তবকে এই অর্থেই 'অভাব' পাওয়া যায় ('অভাব হয়তো স্বভাবেরই অগ্রজ:/নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ— '); এ-দুটি কবিতা একই বৎসরে রচিত, এদের মূল বক্তব্যও এক। 'নৌকাডুবি'র ষষ্ঠ স্তবকে ব্যবহৃত হয়েছে এই সনাতন সংস্কার যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের মনে তার সমগ্র জীবন প্রতিভাত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার ইঙ্গিতটি নতুন ও বিষয়োপযোগী। 'স্মৃতির বিদ্যুৎ' একটি ছবি দিচ্ছে, যেন অকূল অন্ধকারে হঠাৎ ঝলক দিল বিদ্যুৎ, সংবর্তে (প্রলয়ে) মগ্ন হওয়ার আগে শেষবার ক্রন্দসী (স্বর্গ ও মর্ত্য) উদ্ভাসিত হল ('প্রত্যুত্তর': 'দশমী', পংক্তি ১৮ ও ১৯ দ্রষ্টব্য); যেন কাফকার য়োসেফ কা, 'কুকুরের মতো' মরার আগে উচ্চচূড়া থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্মি দেখতে পেলে। 'পাবে সে নিজের দেখা': 'নিজের' শব্দটি ইঙ্গিতময়; 'ক্রন্দসী'র 'সন্ধান' কবিতার সঙ্গে ('আপনারে অহরহ খুঁজি') এর সম্বন্ধ স্পষ্ট; 'নিজের'— অর্থাৎ, যেটা তার সত্তার সারাংশ বা আদর্শরূপ, যেখানে সে নির্ভেদ, নির্দ্বন্দ্ব, দেহে ও বুদ্ধিতে একান্ত ('সন্ধান' দ্রষ্টব্য), সেই তার নিহিত এবং হয়তো অব্যক্ত ও অচরিতার্থ সত্তার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার সাক্ষাৎ হবে। (পূর্বোল্লিখিত 'প্রতীক্ষা'র শেষ পংক্তিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়— 'তথাপি পাব না আমি আপনার দেখা কি?' 'প্রতীক্ষা'র শেষ স্তবকে দার্শনিক উক্তির ভাষায় যা বলা হয়েছে, 'নৌকাডুবি'তে তা-ই অনূদিত হল চিত্রকল্পে।) মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে সে হবে 'স্বাভাবিক'— স্বাভাবিক, প্রাকৃত, আদিম, মনোহীন, জড়। 'স্বাভাবিক'-এর এই বিশেষ বোদলেয়ারীয় অর্থ মনে না-রাখলে এই কবিতা পড়া ব্যর্থ হবে।

'নৌকাডুবি'র গূঢ় অর্থ আমার কাছে খুব স্পষ্ট; কবির অন্তর্জীবনের একটি নাটক এটি। শুধু কবিরই বা কেন, যে-কোনও চৈতন্যবান; মননশীল মানুষের। চৈতন্য জড়ের বিরোধী, এবং বিশ্ব জড়; অতএব বিশ্বের সঙ্গে অবিরল যুদ্ধচালনাই সচেতন মানুষের জীবন। এই যুদ্ধের চিত্রকল্পস্বরূপ সুধীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন সাঁতার ও নৌচালনা ('সংবর্তে'র 'জেসন' কবিতার প্রথম পংক্তি: 'বহু কষ্টে শিখেছি সাঁতার' স্মর্তব্য); ভূপৃষ্ঠচারী প্রকৃতিচ্যুত মানুষের পক্ষে দুটো কাজই দুরূহ, শিক্ষাসাপেক্ষ, বিপজ্জনক (ভালেরির 'Le Rameur' বা 'নৌচালক' কবিতা স্মর্তব্য)। 'নৌকাডুবি'তে এমন একজনের কথা বলা হয়েছে যে কোনও আকস্মিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কিছুদিনের জন্য কোনও সৃষ্টিকর্মে (সম্ভবত কবিতা লেখায়) সাবলীলভাবে ব্যাপৃত ছিল (হাঁটার জন্য ন্যূনতম চেষ্টা শুধু প্রয়োজন, তাই তার পদাতিক অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সাবলীলতা ব্যজিত হচ্ছে); কিন্তু যখন বেলা পড়ে এল (বার্ধক্য? ক্ষমতার অবক্ষয়? তীব্রতর আত্মচেতনা প্রসূত বন্ধ্যাত্ব?), তখন সে দেখলে যে 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর'; তার অনুভূতি হল সমুদ্র, পাল্থ নৌজীবী, আর তরণীটিও মজ্জমান, কেননা বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য; জড় জগৎ কঠিন প্রতিশোধ নিয়ে এবার তাকে প্রলয়তিমিরে ডুবিয়ে দেবে। অথবা এও ভাবা যায় যে পদাতিক অবস্থায় সে অকৃতী হলেও সুস্থভাবে বেঁচে ছিল, যখন কবিতা লেখা শুরু করল, বা চৈতন্যের দ্বারা অধিকৃত হল, তখনই তাকে নৌকো ভাসাতে হল মারাত্মক জলে। ('ভাঙা হাটে শুরু'-তে এই আত্মজৈবনিক ইঙ্গিত থাকতে পারে যে সুধীন্দ্রনাথ কিছুটা অধিক বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন— 'তন্বী' প্রকাশকালে তাঁর বয়স ছিল উনত্রিশ, আর 'অর্কেস্ট্রা' প্রকাশকালে চৌত্রিশ— আর কৈশোর পর্যন্ত ভালো বাংলা জানতেন না বলে প্রথম থেকেই কবিতা লেখার কাজটি ছিল তাঁর পক্ষে বিশেষভাবে আয়াসসাধ্য। 'খালি গোলাঘরে সারা'-কে স্বীয় রচনা বিষয়ে কবিদের সাধারণ ও স্বাভাবিক অতৃপ্তির অর্থে গ্রহণ করতে দোষ নেই। কিংবা, 'খালি গোলাঘরে সারা, ভাঙা হাটে শুরু'-কে সুধীন্দ্রনাথের সাধারণ জীবনদর্শনের একটি উক্তি রূপেও ধরে নেওয়া যায়; 'প্রতীক্ষা'র 'অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে' পংক্তিটিতে একই ধারণা ভিন্নভাবে বলা হয়েছিল।)— কিন্তু শেষ মুহূর্তেও তার মানবিক মর্যাদা সে হারাবে না, 'স্মৃতির বিদ্যুতে' দেখবে সে নিজেকে একবার মুখোমুখি;— সে যা হতে চেয়েছিল তা-ই, যা সম্ভাব্য ছিল তা-ই, হতে পারত কিন্তু হল না তা-ই (ব্যাপ্ত হতাশা সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথের আদর্শ জগতে ব্রাউনিঙের চিহ্ন দেখা যায়: 'সেখানে সম্পূর্ণ বৃত্ত, শুধু ভগ্ন কুটিলতা নয়'— 'ক্রন্দসী': 'পরাবর্ত')— সেটাই অন্তিম মূল্য তার সত্তার, যদিও বিশ্বের কাছে, 'জীবনের কাছে তা কখনওই স্বীকার্য হবে না। চৈতন্যসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই আত্মধ্বংসী, তার চেতনাই তাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনে। সুধীন্দ্রনাথের সার্বিক বিশ্ববীক্ষা— তার নাম ক্ষণবাদ বা ধ্বংসবাদ বা নাস্তিবাদ যা-ই হোক না— তারও একটি সাংকেতিক ইস্তাহার এই কবিতা। (আমার এক-এক সময় সন্দেহ হয় যে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রচ্ছন্ন ও প্রতিহত বৈদান্তিক; বুদ্ধির কাছে যা অগ্রাহ্য তাঁর স্বজ্ঞার টান ছিল সেদিকে; 'দশমী'র 'প্রতীক্ষা'য় উল্লিখিত 'সোহংবাদীর আর্তি' তাঁরই নিজের; ওই কবিতার শেষ পংক্তিতে দুটি অর্থ লুকিয়ে আছে কিনা তা-ই বা কে জানে। 'আপনার' শব্দটি মধ্যম পুরুষেও গ্রাহ্য; ভগবানকে ঈষৎ শ্লেষের সুরে 'আপনি' বলতে বাধা নেই; এই অর্থ যুগপৎ মেনে নিলে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ভগবানের ও নিজের দেখা পাওয়া একই কথা। অন্তত এটা স্পষ্ট যে তাঁর সমগ্র কাব্য জুড়ে রয়েছে ভগবানের বা পরমের অভাবজনিত এক বিরাট মনোবেদনা)।

নৌকো, নদী, ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা: উনিশ-শতকী য়োরোপীয় রোমান্টিকদের কবিতায়, এবং রবীন্দ্রনাথে, এই চিত্রকল্পগুলি নিরন্তর পুনরাবৃত্ত। তাঁদেরই বিনীত ও যোগ্য উত্তরাধিকারী সুধীন্দ্রনাথ; তাঁর কবিতা পড়ার অন্যতম প্রধান সুখ এই যে তিনি অনবরত আমাদের অন্যান্য প্রিয় কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর উত্তরজীবনের বহু কবিতার অন্তরালে কাজ করে যাচ্ছে দুই পূর্বসূরির দুটি কবিতা: রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ও র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী'। 'যযাতি'তে এই দুটি কবিতার স্পষ্ট সন্নিপাত ঘটিয়ে তিনি ভাবী গবেষকদের জন্য উদার ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন; সেই সূত্র অনুসরণ করলে তাঁর জন্য অনেক কবিতায় এই একই নৌযাত্রার চিত্রকল্প আমরা খুঁজে পাব। এর প্রথম ক্ষীণ উল্লেখ পাই 'অর্কেস্ট্রা'র 'বিকলতা' নামক চতুর্দশপদীর উপান্ত্য পংক্তিতে ('তাই আজি তব স্মৃতি, মগ্নতরী জঞ্জালের মতো'); ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ও অর্থ নিয়ে তা ফিরে-ফিরে এসেছে 'মরণতরণী' ('উত্তরফাল্গুনী'), পূর্বোক্ত 'জেসন' ও ''যযাতি'' ('সংবর্তে'র 'উন্মার্গ' ও 'প্রত্যাবর্তন'-এ, এবং 'দশমী'র দশটির মধ্যে পাঁচটি কবিতায় ('নৌকাডুবি', 'ভ্রষ্ট তরী', 'উপস্থাপনা', 'প্রত্যুত্তর' ও 'অসংগতি')। 'উন্মার্গ', 'প্রত্যাবর্তন', ''ভ্রষ্ট তরী'' ও ''অসংগতি''তে 'নিরুদ্দেশ' শব্দটিও সচেতনভাবে, এবং ঈষৎ বক্রভাবে উপস্থিত;— সুধীন্দ্রনাথ আমাদের বার-বার আহ্বান করেছেন রবীন্দ্রনাথের সুন্দরীচালিত সম্ভাবনাময় কনকপোতের সঙ্গে তাঁর নিরলম্ব ধ্বংসোন্মুখ নৌকোর প্রতি-তুলনা করতে। 'যযাতি'তে, এবং 'দশমী'র পূর্বোক্ত পাঁচটি কবিতাতেই, নৌকোটি 'বানচাল' হয়ে গেল— তা হয় মগ্ন, নয় মগ্নপ্রায়, নয় আশাহীনভাবে বিপন্ন। 'সংবর্ত' ও 'যযাতি'র পরে 'দশমী'তে সুধীন্দ্রনাথ আবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর জীবনদর্শনের একটি পরিচ্ছন্ন বিবৃতি দিতে; কিন্তু 'নৌকাডুবি'র মতো কবিতাকে তাঁর আকস্মিক অকালমৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণীরূপেও বিবেচনা করতে আমরা স্বভাবতই লুব্ধ হই।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

শ্রীবুদ্ধদেব বসু কৃত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নৌকাডুবি'র ব্যাখ্যা আরও অনেকের মতো আমার কাছেও খুব শ্লাঘনীয় মনে হয়েছে, কিন্তু কবিতাটির প্রথম স্তবকের 'কদাচিৎ খোঁড়ায়' শব্দ দুটিকে আমি কথঞ্চিৎ অন্যভাবে গ্রহণ করতে চাই। কবিতাটি শুরু হচ্ছে একটি স্থির, এবং অক্ষুব্ধ গাম্ভীর্যের অনুষঙ্গ নিয়ে: 'শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে:/ চক্রবালে শুভ্র মেষপাল/ নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে।' এই শান্ত পরিবেশে এবং প্রকৃতই 'স্নিগ্ধ বনান্তরে' রাখালের খোঁড়ানো কি একটু বিসদৃশ নয়? কিন্তু 'কদাচিৎ খোঁড়ায়' তো 'খোঁড়ায় না' বা 'খুব কম সময়েই খোঁড়ায়'— এই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। স্নিগ্ধ বনান্তরে; নরম ঘাসের ওপরে, রাখালেরা 'কদাচিৎ'ই 'খোঁড়ায়'।

নাকি, 'কদাচিৎ' বলতে সুধীন্দ্রনাথ এখানে 'কখনো কখনো' বুঝিয়েছেন। লেখা বাহুল্য, আমি এ-বিষয়ে খুব নিশ্চিত নই।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, চতুর্থ সংকলন, শ্রাবণ ১৩৭৩
থেকে পুনর্মুদ্রিত

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন। **—সম্পাদক**

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

কবির উত্তর

একটি খোলা চিঠি: বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু

'কবিতা-পরিচয়'-সম্পাদক—

কল্যাণীয়েষু,

তুমি এক ঝুড়ি প্রশ্ন করে পাঠিয়েছ— সেগুলোর উত্তর দেওয়ার সাধ্য আমার নেই, কিংবা যদি সাধ্য আছে বলে কল্পনাও করি, তবু আমার অনিচ্ছা হবে অন্তরায়। নন্দনতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব বা দর্শন কবির পক্ষে প্রবেশ্য বলে আমার মনে হয় না; আমার ধারণা, তাত্ত্বিক আলোচনায় কবির কোনও অধিকার নেই, এবং তা করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হননি, এমন কোনও কবির কথা আমি জানি না। কবি তাঁর নিজের কথা বলতে পারেন শুধু তির্যকভাবে, শুধু অন্য কোনও শিল্পীকে অবলম্বন করে— কোনও ভাষাশিল্পী বা চিত্রকর, সুরকার বা অভিনেতা, যা-ই হোক না। কবির কোনও 'মতামত' নেই, আছে শুধু অনুভূতি— সেগুলিও অস্পষ্ট ও পরিবর্তমান; তাঁর কোনও গদ্য উক্তি শুধু অনুভূত বলেই শ্রদ্ধেয় হতে পারে— অন্য কোনও কারণে নয়। কোনও সূচীমুখ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব। বহুকাল আগে, বন্ধুদের প্ররোচনায়, এবং যৌবনের দম্ভ এড়াতে না-পেরে, 'কবিতা কী' বা 'কেন লিখি' ধরণের অবান্তর ও অবাস্তব প্রশ্নেরও আমি উত্তর লিখেছিলাম (যেমন কলেজের 'ভালো' ছাত্র যে-কোনও বিষয়ে চিন্তাহীনভাবে লিখে যায়, তেমনি); আমার বর্তমান বয়সে সেই ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি কোনও সম্পাদকের কাম্য বা পাঠকের পক্ষে আদরণীয় হতে পারে না।

শুধু তোমার তিন নম্বর প্রশ্নটিকে স্পর্শ করতে আমি সাহস পাচ্ছি; কিন্তু সেখানেও আমার অতীতের দ্বারা আমি সতর্কিত ও তিরস্কৃত। আমার 'দময়ন্তী' কবিতার বইয়ের প্রথম সংস্করণে যে-দর্পিত ইস্তাহারটি ছেপেছিলুম (যাতে ঘোষিত ছিল এই পুস্তকে কবিতার ভাষাকে কথ্যভাষার অনুরূপ করে তোলা হয়েছে, এমনকি কয়েকটি ব্যবহার্য অনুশাসনও লিপিবদ্ধ ছিল), সেই ইস্তাহার বই বেরবার অনতিকাল পরেই আমাকে লজ্জা দিয়েছিল। প্রথমে, 'দময়ন্তী'র অন্তর্ভূত কবিতা থেকেই কয়েকটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, পরে আমি নিজেই আরও অনেক বিচ্যুতি দেখতে পেয়েছিলুম। আমার তখনকার সেই সাধের ইস্তাহারটি পরে আমি কী চোখে দেখেছিলুম তা এতেই বোঝা যাবে যে 'দময়ন্তী'র পরবর্তী সংস্করণ থেকে সেটি বর্জিত হয়, এবং আমার কোনও প্রবন্ধ-গ্রন্থেও সেটিকে আমি স্থান দিইনি। আর এখন— আরও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন ও আত্মশোধনের পর, এখন কথ্যভাষার সঙ্গে কবিতার ভাষার কী-ধরণের সম্পর্ক আমার অভিপ্রেত, তার পরিচয় আমার সাম্প্রতিক কাব্যপ্রয়াসেই বিধৃত আছে, আমার পক্ষে উপরন্তু বাকবিস্তার করা বাহুল্য।

শুধু একটি কথা মনে পড়ছে, যার প্রতিবাদ আমি পর-মুহূর্তেই হয়তো করতে চাইব না: কবিতার ভাষা (এমনকি রসাত্মক গদ্যের ভাষা) কখনও অবিকল সাধারণ বাস্তব মানুষের মুখের ভাষার মতো হতে পারে না (এখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থও ভুল করেছিলেন, এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ ওয়ার্ডসওয়ার্থও-ভক্ত কোলরিজের তা দৃষ্টি এড়ায়নি); শুধু এমন একটি মোহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যে এই ভাষায় কোনও বিশেষ মানুষ কোনও বিশেষ অবস্থায় হয়তো বা কথা বলতে পারে, অন্তত বললে অসংগত হবে না স্বাভাবিক শোনাবে। কবি যদি পাঠকের মনে এই সম্মোহ সৃষ্টি করতে পারেন যে তাঁর ভাষা স্বাভাবিক ও সপ্রাণ, তাহলেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল— তিনি তৎসম না দৈশিক শব্দ বেশি ব্যবহার করেছেন, তাঁর ছন্দপ্রকরণ হালকা না গুরুগম্ভীর, এ-সব প্রশ্ন অবান্তর। এবং এই অর্থে লাতিন-ভারাক্রান্ত 'প্যারাডাইস লস্ট'-ও স্বাভাবিক, 'হনু', 'গেনু', 'মম', 'তব' ইত্যাদির প্রাচুর্য সত্ত্বেও 'ক্ষণিকা' বা রবীন্দ্রনাথের বহু গানের ভাষাও স্বাভাবিক।

তার মানে এ-কথা বলা নয় যে আজকের

দিনের কোনও ইংরেজ কবির পক্ষে মিল্টনী ভাষায়, বা বাঙালির পক্ষে 'ক্ষণিকা' বা 'নৈবেদ্য' বা 'বলাকা'র ভাষায় কবিতা লেখা সম্ভব। তা সম্ভব নয় (চেষ্টা করলে কেউ সফল হবে না, এবং ছিটেফোঁটা প্রতিভা থাকলেও কেউ তা চেষ্টাও করবে না কখনও)— সম্ভব নয়, কেননা কবিতা ও সমগ্র শিল্পকলার অন্তরালে অনবরত কাজ করে যাচ্ছে একটি প্রভাব, একটি অলক্ষ্য ও ব্যাপক সত্তা, এক অলঙ্ঘ্য ও রহস্যময় বিধান— যার নাম সময়। কেন আমরা এখনও 'ক্ষণিকা' বা 'সোনার তরী'র লাইন আউড়ে অনির্বচনীয় আনন্দ পাই, অথচ 'সোনার তরী' বা 'ক্ষণিকা'র ধরণে আজকের দিনে কেউ 'ভালো' কবিতা লিখলেও তা অপাঠ্য মনে হয়, এই প্রশ্ন আমাকে বহুদিন ভাবিয়েছে, এখনও মাঝে-মাঝে ভাবায়, কিন্তু এর কোনও উত্তর আমি খুঁজে পাইনি, পেলে নিজের জন্য দুঃখিত হতাম। এমনি হয়ে থাকে— এছাড়া কিছু বলার নেই, এই রহস্যকে রহস্য-রূপেই মেনে নিতে আমরা বাধ্য, কবিতার লেখক হলে তার দ্বারা— চেতন বা অচেতনভাবে— আদিষ্ট হতেও বাধ্য। কোনও বিশেষ সময়ে যে-কবিতা প্রাণবন্ত হয়ে জন্মায়, বহুযুগ পেরিয়ে এসেও তার হৃৎস্পন্দন তেমনি শোনা যায়, কিন্তু যুগান্তরে সেই রীতি আর অন্যদের পক্ষে ব্যবহার্য থাকে না। সময় এক বহুরূপী সত্তা— জীবিতের কাছে সে অবিরাম দাবি করে পরিবর্তন, আবার অতীতের সঙ্গে এমন সূক্ষ্মভাবে সে বর্তমানকে মিলিয়ে দেয়, যেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মৌলিকভাবে সহবাসী।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ্য: বাংলার তথাকথিত 'সাধু-ভাষা'। আমার বিশ্বাস, স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা ইত্যাদি— এবং দু-একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের রচনায় এখনও ওই ভাষা প্রচারিত নাহলে এতদিনে সেটি প্রায় 'অচলিত' বলে চিহ্নিত হয়ে যেত; এর প্রাণশক্তি যে কতটা ক্ষয়প্রাপ্ত তার প্রমাণ আজকালকার বাংলা কবিতা থেকে তার প্রায় সম্পূর্ণ অন্তর্ধান। স্মর্তব্য, জীবনানন্দ শেষপর্যন্ত 'সাধুভাষা' ও 'কাব্যিক' ভাষা ব্যবহার করেছেন; সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে ও আমার পূর্ব-রচনাতেও তার অভাব নেই; আশা করি কোনও উন্মাদ কথ্যভাষাপ্রেমিক সেই সব রচনার 'সংস্কারসাধনে'র জন্য কখনও দাবি তুলবেন না। এখানেও সেই সময়ের হাত দেখতে পাচ্ছি আমরা; চল্লিশের দশকে লেখা 'সে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে/আমি ভুলিবো না, আমি

কবিতা বা যে-কোনও শিল্পকলা হল তা-ই, যা সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম, কিন্তু স্বাভাবিকতা বা সাধারণত্বের অভিনয়ে যা সুদক্ষ। এই অভিনয়কেই সমালোচকেরা নাম দিয়ে থাকেন স্বাচ্ছন্দ্য, বা মনোজ্ঞতা, বা শৈলী।

কভু ভুলিবো না' বা 'ভুলিবো না'— এত বড় স্পর্ধিত শপথে/জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক'— এ-সব পংক্তি ঠিক আছে, ঠিক-ঠাক কবিতাই শোনাচ্ছে; কিন্তু আজকের দিনে, আমার মনে হয় যে-কোনও কৌশলে 'ভুলবো' লেখাই আমাদের কর্তব্য, বা তা সম্ভব নাহলে অন্যভাবে বলতে হবে। 'কর্তব্য' মানে— আবার বলছি— সময়ের নির্দেশ। 'ভুলিবো' শব্দটি এখনকার লেখকদের পক্ষে আর বিশ্বাসযোগ্য নেই— অন্তবর্তী সময় তার অনুরণন হরণ করেছে।

আমার প্রায় আশা হচ্ছিল তোমার প্রশ্নপত্রে 'জনসাধারণ' শব্দটি দেখতে পাবো না, কিন্তু সম্ভাব্য উত্তরদাতাদের 'জব্দ করা'র মাস্টারমশাই-সুলভ মনোভাব তুমি যখন কাটাতে পারোনি, তখন আমিও উল্টে প্রশ্ন করতে পারি: 'জনসাধারণ' কে— বা কারা? আমরাই তো— তুমি আমি, আমরা সবাই। আমি তো জানি সমাজের সব শ্রেণীতেই— আক্ষরিক অর্থে সব শ্রেণীতেই— কবিতার ভোক্তা পাওয়া যায়; তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী বা বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হতে হয় না;— কবিতার পাঠক বা শ্রোতাদের 'জনসাধারণ' ও 'অ-জনসাধারণ' বলে বিভক্ত করতে আমি কিছুতেই সম্মত নই। 'সাধারণ মানুষ' নামে একটা কল্পনা চিরকাল প্রচলিত আছে (যদিও কেউ জানে না সেই 'সাধারণত্বে'র লক্ষণ কী), এবং সেই কল্পনা মেনে নিয়ে কবিতাও কখনও-কখনও এমন ভান করে থাকে যেন তা 'সর্বসাধারণে'র ভাষার বাইরে পদক্ষেপ করেনি। এর পরিচয় পাই এলিয়ট, পাউন্ড ও পরবর্তী মার্কিনি কবিদের কোনও-কোনও রচনায় বা রচনার অংশে, পাশ্চাত্য ম্যুজিক-হল বা টেলিভিশনে প্রচারিত গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত সুরসমন্বিত হাস্যরসোজ্জ্বল কথকতায় (সেগুলোকেও এক ধরণের কবিতা বলে আমি স্বীকার করি);— আর আমাদের যাত্রাগানের পালায়, কীর্তনে, চিরাচরিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও। কৃত্তিবাসের এখনও অনেক মুগ্ধ ও নিরক্ষর শ্রোতা আছে বলে আমার বিশ্বাস, কিন্তু তাতে কি এই প্রমাণ হল যে কৃত্তিবাস 'সাধারণে'র ভাষায় লিখেছিলেন? 'সাধারণ'— বা 'অ-সাধারণ' মানুষেরাও— কি চোদ্দো অক্ষরের মিলবদ্ধ দ্বিপদীতে কথা বলে? না কি 'মাই ফেয়ার লেডি'র সংলাপ ও গানের ভাষা আমরা লন্ডনে পদার্পণমাত্র ককনি ফুলওয়ালির মুখে শুনতে পাব? আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো সবই রচিত, অর্থাৎ কোনও-না-কোনওভাবে শিল্পিত; এখানেও— আর কিছু নয়— শুধু একটি ভান বজায় রাখা হচ্ছে, সেই একই মোহ সৃষ্টি করা হচ্ছে ভোক্তার মনে—যেন এই ভাষা হাটবাজার ফুটপাত সরাইখানা থেকে ছিটকে সোজা কবির কলমে চলে এসেছে! এতে ভোক্তারা প্রতারিত হতে পারেন, কিন্তু সাধারণত অন্য কবিরা হন না; তাঁরা জানেন কোনও মানুষেরই মুখের ভাষায় ছন্দোবদ্ধ পংক্তি নেই, গুঞ্জনকারী গদ্যও নেই; এই সবই এক চেষ্টাপরায়ণ সৃষ্টিশীল চাতুরীর ফলাফল। কবিতা বা যে-কোনও শিল্পকলা হল তা-ই, যা সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম, কিন্তু স্বাভাবিকতা বা সাধারণত্বের অভিনয়ে যা সুদক্ষ। এই অভিনয়কেই সমালোচকেরা নাম দিয়ে থাকেন স্বাচ্ছন্দ্য, বা মনোজ্ঞতা, বা শৈলী।

এবং যাত্রাগানের ভোক্তার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের যদি অর্ধেক পাঠকও না জোটে, এবং ম্যুজিক-হলের দরদির তুলনায় ইয়েটস-এর ভক্তসংখ্যা হয় অকিঞ্চিৎকর, তাহলেও আমাদের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই; কবিতা এক ও অবিভাজ্য হলেও তার প্রকাশের রূপ অসংখ্য, তার আবেদনের পথ অতি বিচিত্র; এবং মানুষ যতদিন রক্তমাংস-, ইন্দ্রিয়-, ও স্মৃতি-সমন্বিত জীব থাকবে, ততদিন সব ভিন্ন-ভিন্ন কবিতাই ভিন্ন-ভিন্ন ভোক্তার কাছে (বা বিভিন্ন সময়ে একই ভোক্তার কাছে) পৌঁছবে বলে ধরে নেওয়া যায়;— আর আমরা যদি আমাদের কল্পনাকে দূর ভবিষ্যতের কোনও বিন্দুতে নিবদ্ধ করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে এক লক্ষ ও একশত ভোক্তায় বস্তুত কোনও প্রভেদ ভবিষ্যতে লুপ্ত হতে পারে, বা উল্টে যেতে পারে, অন্তত কখনও-কখনও, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে। অতীতে তার উদাহরণ নেই এমন নয়।

রবীন্দ্রনাথ পড়ার সময়

১৯৬৪ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি চিঠিতে শঙ্খ ঘোষকে লিখেছিলেন, 'কলকাতার জনদশেক বন্ধু ও শত্রুর মুখ চেয়ে কবিতা লেখা ছাড়া ইহজীবনে আর কোনও বড় আনন্দের কাজ নেই বুঝতে পারলুম।' সারা জীবন অফুরন্ত লেখা তিনি লিখেছেন, নিয়েছেন একজন ইতিহাসকথকের ভূমিকা। কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেননি তিনি। বহু গ্রন্থ পাঠ করে হয়ে উঠেছেন একজন উত্তরীয়হীন জ্ঞানী যাযাবর। তবু হয়তো কবিতা লেখাই সব থেকে আনন্দের কাজ ছিল তাঁর কাছে। তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'কবরখানার কুলিচোর, বাঁচো।' একজন নাস্তিক হিসেবে তাঁর কাছে এ জীবনে বাঁচাটাই ছিল সব থেকে বড় কথা। ওই ১৯৬৪ সালেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীলকে লিখেছিলেন, 'আমি কী লিখছি কে জানে! লিখে যাচ্ছি যেন একটা আনত অবস্থা অস্বীকার করার জন্য।' একটা আনত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার ভয়াবহ সময় প্রত্যেককেই পার হতে হয় যৌবনে, যখন জীবনে চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নের চারপাশে উড়তে থাকে কত-না কালো পতাকা— যখন তাকে ভাবতে হয় কীভাবে জীবন কাটবে বা কীভাবে সে চিনে নেবে জৈবিকতার পরিসরের মধ্যে এক অকথিত বিমূর্তকে, আদি-অন্তহীন আকাশ আর অন্ধকার রাত্রিগুলিকে, সূর্যপ্রণামকে, মানববন্ধন আর সপ্তর্ষিমণ্ডলকে। সম্প্রতি প্রয়াত এই সময়ের একজন প্রধান কবি বীতশোক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'করুণা ও প্রজ্ঞার উপরে নির্ভর করে যেভাবে একজন বৌদ্ধ সঙ্ঘে ফিরে যান, আমার কবিতা সেভাবে সমাজ ও মানুষের দিকে ফিরে যাক, আমি এটা চাই।' একজন প্রজ্ঞাবানের এই চাওয়া নিয়ে আজ নতুন করে ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে। একসময় কবিদের গায়ত্রীমন্ত্র ছিল 'যা-কিছু পবিত্র তা-ই ব্যক্তিগত'। এই মন্ত্রটি আজ আর আওড়াতে ইচ্ছে করে না। এখন মনে হয় কবি-ব্যক্তি একজন সময় আর মানবসমাজের প্রতিনিধি। সে, রবীন্দ্রনাথের কথনে, 'কোনের একা নহে, বিশ্বব্যাপী এক।'

উল্লিখিত এই তিনজন প্রয়াত কবির কথাগুলি মনে হয় নিজেরই কথা যা বলিনি অবশ্য। নিজের কথা, নিজের লেখার কথা কখনও বলতে ইচ্ছে হয়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবশ্য কিছু-কিছু বলেছি। বলেছি, লিখতে পারি, এই মনোভাব নিয়ে কখনও লিখিনি কিছু, লিখতে পারি-না, এই মনোভাব নিয়ে লিখেছি যা-কিছু লেখার।

পূর্ববঙ্গের রাজবাড়ি জেলার ছাইবাড়িয়া নামের একটা গণ্ডগ্রামে ১৯৪৩ সালের ঘোর

১৯৫৭ সালে, কলকাতা শহরের মালিন্যের মধ্যে মিশে যাই। পিছনে পড়ে-থাকে বিপুল একটা শূন্যতা জুড়ে ধানখেত পুকুর গাছপালা, প্রতিদিনের সত্যিকারের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, সত্যিকারের অন্ধকার রাত্রি, নক্ষত্রলোক...

আকালের মধ্যে জন্মেছিলাম। সেখানেই শৈশব কাটিয়ে একসময়, ১৯৫৭ সালে, কলকাতা শহরের মালিন্যের মধ্যে মিশে যাই। পিছনে পড়ে-থাকে বিপুল একটা শূন্যতা জুড়ে ধানখেত পুকুর গাছপালা, প্রতিদিনের সত্যিকারের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, সত্যিকারের অন্ধকার রাত্রি, নক্ষত্রলোক, শাস্ত্র-বলা, ঠাকুরদার ধরাগলায় বিমূঢ়ের চণ্ডীপাঠ, মেজঠাকুরদার অমৃতকণ্ঠে কীর্তন গাইতে গাইতে অশ্রুবিসর্জন, মা-র নীরবতা, বাবাকে পোড়ানোর জন্য শ্রাবণসন্ধ্যায় আমগাছ কাটা— কত কত কান্না আর চিৎকার আর যাত্রাপালার আসরের অট্টহাসি। স্কুলজীবন থেকেই কবিতালেখার শুরু অনেকটা খেলার ছলে। আস্তে আস্তে সেই খেলাটাই যেন অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, যতই তুচ্ছ হোক তা! এই শহরে এসে ১৪ বছরের বালকের যে অন্নবস্ত্রবাসস্থানের কষ্ট ছিল তাকে বাস্তবিক কোনও কষ্ট মনে হয়নি। আসলে সেটা কোনও কষ্ট পাওয়ার বয়স ছিল না। টিকে থাকতে পারাটাই ছিল একটা জয়। সেই বাঁচার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল চিন্তা বা ভাবজগতের কিছু-কিছু আলো, অনুভূতিদেশের আলো। একসময় কবিতা পড়তে পড়তে হাতে এল জীবনানন্দের কবিতা 'অন্ধকার' আর 'হাওয়ার রাত'। পড়ে মনে হল পৃথিবীটা সত্যিই একটা মায়া। যা সত্য বা বাস্তব তাই মায়া; এ শংকরাচার্যের মায়া নয়। একটা বড় স্থানকালের ওপর মন বিছিয়ে রাখার পরিসর পাওয়া গেল। ভাষা পাওয়া গেল। তারপর তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের কবিদের অজস্র আশ্চর্য কবিতার পাশে মাথা পেতে দাঁড়ানো! পাশাপাশি পশ্চিম পৃথিবীর কবি-লেখকদের লেখাতেও তৈরি হল ঘোর। টলস্টয়-দস্তয়ভস্কি-কাফকা-কামু-এলিয়ট-পাউন্ড-র‍্যাঁবো-বোদলেয়ার-মালার্মে-ভালেরি-সাঁ জাঁ পের্স নিয়ে ঘোর। এইরকম ঘোরের মধ্যে বসবাস করতে করতে কবিতালেখার চেষ্টা করে যাওয়া। সমকালীন কবিদের কলহ-আত্মপ্রচার-আন্দোলন থেকে পালিয়ে বেড়ানোও যেন একটা কাজ। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে জীবন কাটানো। আর নিজের পয়সায় একের পর এক বই ছাপিয়ে কিছু বন্ধুর হাতে দেওয়া, বাকিটা বইপোকার জন্য যত্ন করে রাখা। ভাগ্যিস বই খাওয়ার পোকা আছে, না-হলে বইয়ের স্থূলত্ব কী যে ভয়াবহ রূপ নিত!

কৈশোরেই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। মার্কসবাদকে পরিত্রাণের রাস্তা ভেবে জড়বাদ বা নাস্তিকতায় তথা যুক্তিবাদে দীক্ষাগ্রহণ ঘটে যায়। কিন্তু কলেজের পাঠ শেষ করার পরেই মার্কসবাদের মোহ কেটে যায়; মনে হয় ওই হিংসার দর্শন পরিত্যাজ্য। কিন্তু নাস্তিকতা বা যুক্তিবাদ ত্যাগ করিনি। গান্ধির সত্যের ও অহিংসার পথকেই সংগ্রামের একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ মনে হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে রামধুনের কোনও স্থান রাখতে পারিনি। নিজেকে একজন প্রকৃতিবাদী হিসেবে ভাবতে চাই। রবীন্দ্রনাথও কি শেষ জীবনে পৌঁছে ঈশ্বরের আসনে প্রকৃতিকে বসাননি, যখন তাঁকে বলতে হয়েছিল, 'তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে?'

একসময় অন্নবস্ত্রের কষ্ট ছিল যাকে কষ্ট বলে মনে হয়নি। এখন আকাশ থেকে টাকা পড়ে যা অন্নবস্ত্রওষুধের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখন একটা অনুচ্চারিত বেদনাপ্রবাহের মধ্যে বসবাস। এখন এই প্রবাহের মধ্যে বসবাস করতে করতে শুধু বইপড়া আর গানশোনা— শুধু রবীন্দ্রগান আর মার্গসঙ্গীত। এখন প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের ভাষায় বলি, 'জন্মেছিলাম—/জন্ম হয়েছিল/আর তো সকলই রৌদ্র সকলই তুষার।'

এখন শুধু রবীন্দ্রনাথ পড়ার সময়। শুনছি, 'কোন আদি কাল হতে...'

কালীকৃষ্ণ গুহ

কালীকৃষ্ণ গুহর স্বনির্বাচিত ছয়টি কবিতা

স্মৃ তি র উ দ্দে শে

'মনে হয় তুমি আমাদের সবই দেখতে পাও'
স্মৃতির উদ্দেশে এই কথা বলা হয়েছে।

আমরা সারাদিন ঘুরে ঘুরে কুসুমের মাস অনুভব করি,
চারদিকের নগ্নতা অনুভব করি।

যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে তাকে অনুভব করি।
কিন্তু সে কি আমাদের সবকিছু দেখতে পায়? তবে কেন এরকম মনে হয়?

স্মৃতির উদ্দেশে আমরা যা-কিছু বলেছি তা আমাদের
অসামান্য পবিত্রতা দিয়েছে—

শীর্ণতা এবং পরিণতি দিয়েছে।
একদিন আমরা অন্ধকার আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছি

'মনে হয় তুমি আমাদের সবই দেখতে পাও।'

সা ক্ষা ৎ কা র

অনেকদিন পর আমাদের দেখা হলো।

'কবিতা লিখে কিছুই হয় নি আমাদের' এইকথা বলে তুমি
কুঁজো হয়ে হেঁটে যেতে লাগলে।
'কবিতা লিখে কিছুই হয় নি আমাদের' এইকথা বলে আমি
পাশাপাশি কুঁজো হয়ে হেঁটে যেতে লাগলুম।

চারদিক তখন চৈত্রমাস সূচিত হয়েছে— অন্য কোন ভাষ্য নেই—
স্মৃতিহীনতার মতো চৈত্রমাস।

ন ব জা ত ক

শরৎকালের ভিতর দিয়ে নবজাতক আসে।

আমাদের ক্লান্তি এবং অন্ধকার স্মৃতির পাশাপাশি আসে
নবজাতক।
ক্লান্তির ভিতর থেকেও আমরা বুঝতে পারি কোথাও জয়ধ্বনি রয়েছে তার—
সমস্ত শরৎকাল জুড়ে তার জয়ধ্বনি।

পি তা ম হ

তোমার ছবির দিকে বারবার তাকিয়েছি
পিতামহ, সে কি শুধু অভ্যাসবশত, নাকি
ঋণ মাথায় রক্তের প্রান্তে ছড়িয়েছে ব'লে
যেমন অন্ধের থাকে চরাচর-বোধ, সেই
বোধে, প্রজনন-প্রেক্ষাপট গড়ার নিয়মে
কিংবা প্রশ্নহীনতার দিকে যাবে সাম্প্রতিক
কোলাহলরাশি, এই জেনে, বিশ্রাম চেয়েছি!
কালগর্ভে তোমার ছবিটি আছে, টের পাই।

তোমার জীবন ছিল সামন্তের, ছিল ঘোর
বিবেচনা, যুদ্ধজয়, পুত্র-বিসর্জন, আর
প্রথার দাসত্ব, তবু অসম্মত স্থির নারী
আন্দোলিত রেখেছে তোমাকে, যদিও বাগান
পুকুর ধানের খেত আরও নিস্তব্ধ থেকেছে;
তোমার ছবির শূন্যতা দেখেছি, পিতামহ।

বৈ শা খ মা স ২

বৈশাখমাস জুড়ে
পুন্যিপুকুর ব্রত
পুকুরে জল নেই
আকাশ সংহত

অবাক বোশেখমাস
পলাশ কৃষ্ণচূড়ায়
ঢাকা চতুর্দিক
পাগল দৌড়ে যায়

কুমারী কন্যারা
কান্না নিয়ে জাগে
উঠোন জুড়ে বেদি
শরীরে ধুলো লাগে

শস্যখেতের পাশে
এ-এক বিপুল খেলা
পলাশ কৃষ্ণচূড়ায়
ঘনাচ্ছে অবেলা

এ ক টি প্রে মে র গ ল্প

দুজন প্রেমিক
একটি মেয়ে
দিন কাটে, দিন
বৃষ্টিধারায়।

দিনগুলি সব
রৌদ্রে মেশে
রাত্রি হলে
শুধুই আকাশ।

দিন কাটে কোন
মন্ত্রবলে
কেউ জানে না—
দুই চোখে জল।

মেয়েটি খুব
কান্না ভোলে
শুদ্ধতা নেয়
শূন্য ডালায়।

ছেলে দুজন
পরস্পরের
বন্ধুতা চায়
সর্বহারার।

অস্ট্রেলিয়ার ঝোপে-সৈকতে কবিদল

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ওলঙ্গংয়ের সমুদ্র সৈকতের ঘাটে আমরা কবিতা পড়েছি, শ্রোতাও কবিরাই, সঙ্গে সিগালের ঝাঁক
ছবি: লেখক

দূর দেশ থেকে আমাকে কেউ কবিতা পড়বার নিমন্ত্রণ পাঠাবেন, কখনও ভাবিনি।

সেইজন্যই সিডনিতে বিশ্ব কবিসম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেয়ে খুবই অবাক হয়েছিলাম। হয়তো কোথাও কোনও ভুল হয়েছে ভেবে প্রথমে চিঠির উত্তরও দিইনি, পরে ক্রমশ কর্মচক্রে ব্যাপারটা ভুলে যাই। এতটা নিরাসক্তির হয়তো আরও একটা কারণ ছিল। সারা পৃথিবী থেকে প্রায় দেড়শো কবিকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে, কাউকেই যাতায়াতের বিমানভাড়া বা থাকার খরচ দেওয়া হবে না, সেটা উদ্যোক্তাদের সাধ্যের বাইরে। যদিও কম খরচে নিমন্ত্রিত কবিদের থাকা-খাওয়া ঘোরাঘুরির ব্যবস্থা থাকবে।

এরপর মাস দুয়েকের মধ্যেই আমার দক্ষিণ নিউজিল্যান্ড সফর পাকা হওয়া মাত্র মনের সব দ্বিধা-সংকোচ ছেড়ে সিডনিতে ই-মেলে আমার সম্মতি জানিয়ে দিলাম। ভাবলাম, নিউজিল্যান্ড যাবার পথে অস্ট্রেলিয়ায় নেমে পড়লেই হল। মহাসাগরের বুকে এই দুই দ্বীপদেশের মধ্যে কতটুকুই বা দূরত্ব! আরেকটা কথা ভেবেও ভারি আনন্দ হল। এঁদের নিমন্ত্রণে গেলে ঘোরাঘুরির অনেক বেশি সুযোগ পাব। তখনও অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা—এই দুটি মহাদেশের এক ইঞ্চি মাটিও আমার স্পর্শ করা হয়নি, এই

কল্পনায় দেখি ওলঙ্গং, ব্লু মাউন্টেনের নিসর্গসৌন্দর্য। তখনও জানি না, এইসব আনন্দও ছাপিয়ে উঠবে নানা দেশের কবিসঙ্গ। জানতামই না, পোল্যান্ডের কবি যোসেফ বারান আর ইরাকের আরবি কবি গাইলান হয়ে উঠবেন আমার গভীর বন্ধু।

সিডনির গভর্নমেন্ট হাউস

সুযোগে অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এলে মহাদেশ হিসেবে আমার অদেখা থাকবে শুধু আফ্রিকা। কবিসম্মেলন ছাড়াও নতুন দেশ দেখার লোভ আমাকে খুবই পেয়ে বসল।

সিডনির নিমন্ত্রণকর্তৃপক্ষকে ই-মেলে আমার সম্মতি জানিয়েছিলেন আমার সহকর্মী, ১৩ এপ্রিল দুপুরে, সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁর নামে সিডনি থেকে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব পোয়েটস-এর ডেপুটি চেয়ারপারসন অ্যান ডেভিসের উত্তর এল—'আপনার ই-মেলের জন্য ধন্যবাদ। অনুগ্রহ করে অবিলম্বে শ্রী চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা, ফটো ও জীবনী পাঠান। অক্টোবরে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার অপেক্ষায় রইলাম।'

এরপর অ্যানের সঙ্গে আমার সরাসরি বহু বার্তাবিনিময় হল। তাঁর চিঠিতেই জানলাম, বিশ্ব কবিসম্মেলনে নানা দেশের কবিরা কবিতা পড়বেন, কবিতা নিয়ে আলোচনা করবেন। শুধু সিডনিতেই নয়, সিডনির বাইরে ওলঙ্গং, ব্লু মাউন্টেন, ক্যানবেরাতেও। কবিতা পড়া হবে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সমুদ্রসৈকতে, জগদ্বিখ্যাত বুশ বা জঙ্গলে, পাহাড়ের কোলে।

অ্যানের চিঠিতেই জানলাম, কবিসম্মেলন শুরু হবার আগের দিন সন্ধ্যায় কবিদের স্বাগত অনুষ্ঠানের আগে, অপরাহ্নে সিডনির গভর্নমেন্ট হাউসে ন-জন নির্বাচিত কবির কবিতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে, সেই ন-জনের একজন এই অখ্যাতজন, বেলা ১টায় আমাকে হোটেল থেকে গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। অ্যান লিখেছেন, 'সন্ধ্যার অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের কিছু আগেই আপনাকে হোটেলে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সেখানে অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আগে দীর্ঘ উড়ানের ক্লান্তি কাটাতে আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারবেন।'

ইতিমধ্যে ২০০১-এর ২১তম এই আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনের চেয়ারপারসন রবিন আয়ানসেনের চিঠিও পৌঁছে গেছে, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় তাঁর আনন্দ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ জানিয়ে যোগ করেছেন, বিমানবন্দর থেকে কেবলমাত্র হলুদরঙা বাস আপনাকে সোজা হোটেলে নামিয়ে দেবে, ভাড়া ৭ ডলার, হোটেলে পৌঁছেই আমাদের কাউন্টার থেকে টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে।

অ্যানের চিঠিতে জানলাম, ওলঙ্গং, ব্লু মাউন্টেন, ক্যানবেরা ছাড়াও দুপুরে সিডনির বিখ্যাত অপেরা হাউসে, সন্ধ্যায় রেডিও স্টেশনে চা পানের আসরে, রাতে প্রাচীন চিনে রেস্তোরাঁয় নৈশভোজে, নানান প্রহরে, নানা স্থানে কবিতা পাঠের নানা আয়োজন। মূল অধিবেশন স্থল সিডনির ল্যান্ডমার্ক পার্ক রয়্যাল হোটেলে কবিতা পাঠ, আলোচনাচক্র, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি তো আছেই। সেখানে আমাকে একদিন ছোটদের কবিতা লেখার বিষয়েও বলতে হবে।

অ্যানের ব্যস্ত-সমস্ত চিঠি থেকে কবিতাপাঠ বা আলোচনাচক্রের ভিড়ের মধ্যেও দেশ দেখার আনন্দবার্তা শুষে নিই। কল্পনায় দেখি ওলঙ্গং, ব্লু মাউন্টেনের নিসর্গসৌন্দর্য। তখনও জানি না, এইসব আনন্দও ছাপিয়ে উঠবে নানা দেশের কবিসঙ্গ। জানতামই না, পোল্যান্ডের কবি যোসেফ বারান আর ইরাকের আরবি কবি গাইলান হয়ে উঠবেন আমার গভীর বন্ধু। বন্ধু পাব জাপানের গোরো ইহারা আর রিৎসুকো কাওয়াবাতাকে। তাছাড়া ইস্রায়েলের আদা আহারোনি, প্যালেস্টাইনের হানান আওয়াদ, বলিভিয়ার লিডিয়া ব্রাউন, চিনের লি কিং, কোরিয়ার ইয়ুং ইয়া পার্ক— এক দেশেই পাব নানা দেশের নানা ভাষার কবিকে। অস্ট্রেলিয়ার রবিন আয়ানসেন, অ্যান ডেভিস, ক্রিস্টিন শ্যানন, ডেভিড মরিস, বিয়াত্রিস কপেলো — এঁরা তো থাকছেনই।

সিডনি পৌঁছে হলদে-রঙা বাসের চালক-কাম-পরিচালককে আমেরিকান ৭ ডলার দিতে গেলাম, এক পলক দেখেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমেরিকান ডলার নেবেন না, বাসভাড়া ৭ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ৭ আমেরিকান ডলারে সাড়ে দশ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। আমার কাছে অস্ট্রেলিয়ান ডলার নেই, অগত্যা তিনি আমেরিকান ডলারই নিতে বাধ্য হলেন, টিকিট দিলেন কিন্তু ৭ অস্ট্রেলিয়ান ডলারের। কেননা মার্কিন ডলারের টিকিট পাবেন কোথায়?

হোটেলের কংগ্রেস-কাউন্টারের মহিলাকে আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার গোলমালের কথাটা বোঝানো খুবই কঠিন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রবিন আয়ানসেন সবটা শুনে পরম বিস্ময়ে আমাকে দেখে নিয়ে সেই মহিলাকে বললেন, সাড়ে দশ অস্ট্রেলিয়ান ডলার দিয়ে দাও।

দুপুরে অ্যান ডেভিস নিজেই এলেন আমাকে গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে যেতে। তাতে আমার বাড়তি লাভ হল, গাড়ি চালাতে চালাতে অ্যান সিডনির কথা, অস্ট্রেলিয়ান সাহিত্যের কথা, সেখানকার সৈকতের কথা শোনাতে লাগলেন। ব্লু মাউন্টেন অঞ্চলে কবিতাপাঠ ও ভ্রমণের বিষয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস রবিবারের ফাঁকা রাস্তায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে-চালাতেও আমার মনে সঞ্চারিত করে দিলেন।

যোসেফ বারান শুধু কবিই নয়, পোল্যান্ডের একটি দৈনিক কাগজের সাংবাদিকও। তিনি তাঁর কাগজের জন্য একদিন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমার সাক্ষাৎকার নিলেন। এখনকার বাংলা কবিতা, বাংলাভাগ ও দুই বাংলার বাংলা ভাষা, কবিদের জীবিকা ও আর্থিক অবস্থা, কবিতার সমাদর ও পাঠকসংখ্যা —ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমাকে সাধ্যমতো এই সহৃদয় কবির সব

প্রশ্নের উত্তর দিতে হল।

ইংরিজিতে তাঁর দখল প্রায় নেই বললেই হয়, ফলে তিনি প্রথম থেকেই একজন দোভাষীর ব্যবস্থা করেছিলেন। যোসেফ বারান থাকেন পোল্যান্ডের CRACOW শহরে। আমাকে বারবার সেখানে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, আমাদের ওই শহরটা আপনার ভালো লাগবেই, কেননা সেই শহরে থাকেন পোল্যান্ডের দুজন নোবেলজয়ী কবি। একজনের নাম চেশওয়াফ মিওয়াশ (CZESLAW MILOSZ), আরেকজন ভিসওয়াভা সিমবরস্কা (WISLWA SZYMBORSKA)। আমি খুব মন দিয়ে সব শুনে বললাম, তার চেয়েও বড় কথা, সেখানে আমার বন্ধু যোসেফ বারানের বাড়ি।

আমার ক্র্যাকাও যাবার ব্যাপারে বারানের উৎসাহ দেখার মতো। বললেন, ওখানে আমার কবিতাপাঠের আয়োজন করা হবে। আমি পড়ব বাংলায়, বারান ও আরও কয়েকজন কবি তার পোলিশ তর্জমা শ্রোতাদের পড়ে শোনাবেন। বারান প্রথমে ঠিক করেছিলেন আমাকে আমার কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পাঠাতে হবে, তার থেকে কয়েকজন ইংরিজি জানা পোলিশ কবি পোলিশে অনুবাদ করবেন। পরে কী ভেবে বললেন, 'খুব সম্ভব আপনার কবিতা বাংলা থেকেই পোলিশে অনুবাদ করাতে পারব, আমাদের এরকম আছেন একজন।'

বারান নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত তাঁর কবিতার বই IN A FLASH আমাকে এক কপি উপহার দেবার সময় লিখে দিলেন— 'অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে, আমার হৃদয় থেকে।' বইটির বাঁদিকের পাতায় মূল পোলিশ কবিতা, ডানদিকে ইংরিজি অনুবাদ। পঞ্চান্ন বছর বয়সী এই কবির এপর্যন্ত পঁচিশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

গাইলানের কবিতার বই লন্ডন প্যারিস সহ পৃথিবীর নানা দেশ থেকেই প্রকাশিত হয়। জন্ম ইরাকে, এখন থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়, সেখানে তাঁর সম্পাদিত 'JOUSSOUR'S' নামে পত্রিকাটির মলাটে লেখা থাকে— 'স্বাধীনতা আর সৃষ্টিশীলতার মধ্যেকার সেতু' এই পত্রিকা। সিডনির সম্মেলনের পরেও নিউ সাউথ ওয়েলসের কবিতাপাঠের আসরে গাইলানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এতই গভীর হয়ে উঠেছিল যে নিউ সাউথ ওয়েলসে তার স্ত্রীর রান্না বিরিয়ানি ও কাবাব তার পীড়াপীড়িতে অত্যধিক খেতে হয়েছিল। আমাদের দুজনের দীর্ঘ কাব্য-আলোচনা ও আমার কবিতাপাঠ তার ছেলে মুভি ক্যামেরায় ধরে রেখেছে।

বারানের সঙ্গে রোজই দেখা হয়, একই আসরে কবিতা পড়ি। বারান পড়েন তাঁর মাতৃভাষায়, ডেভিড মরিস সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরিজি অনুবাদ পড়ে শোনান। আমি প্রথম দিকের কয়েকটি আসরে আমার কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছি, শেষে একদিন কবিতাপাঠের বড় একটা আসরে বললাম, বিশ্বে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ২০ কোটি ৭০ লক্ষ, বাংলা সম্ভবত পৃথিবীর পঞ্চম সর্বাধিক মানুষের মাতৃভাষা। বাংলাদেশে মাতৃভাষার জন্য মৃত্যুবরণের পুণ্য দিন একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। অতএব, আমিও আমার মাতৃভাষা বাংলায় আমার কবিতা পড়তে চাই।

অ্যান ডেভিস এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি বাংলা পড়ুন, আমি ইংরিজি অনুবাদ পড়ে দেব।'

সেই থেকে এভাবেই চলল। অন্য সকলের মতো আমিও মাতৃভাষায় কবিতা পড়ি। অ্যান পড়ে দেন তার ইংরিজি অনুবাদ। মাতৃভাষা সর্বত্রই সুন্দর। তার আনন্দই আলাদা। শ্রোতাদের কানে অন্তত মূল ভাষার ধ্বনিটুকু তো পৌঁছচ্ছে।

হংকংবাসী বিখ্যাত চিনা কবি লি কিং-এর মূল ভাষায় কবিতাপাঠের পাশাপাশি ইংরিজি অনুবাদ পড়ে দিলেন কবির স্ত্রী। আরও অনেক চিনা কবির সঙ্গে আলাপ হল, এঁদের কেউ কেউ চিন দেশ থেকে এসেছেন, অনেকে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। যেমন শেউং ওয়াই চাং। তাঁর নিজের ভাষায়: আমি এম বি এ হয়েও একজন অনুবাদক ও লেখক। বয়স ৩৬, এ তাবৎ চার দেশের বাসিন্দা— চিন, হংকং, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার। জীবনের ওঠা-পড়াই আমাকে প্রথম জীবনের ব্যবসার আকর্ষণ থেকে সরিয়ে এনে উচ্চফলনশীল কবি বানিয়েছে।

সমুদ্রে জলযানে সওয়ার

দুপুরে অ্যান ডেভিস নিজেই এলেন আমাকে গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে যেতে। ব্লু মাউন্টেন অঞ্চলে কবিতাপাঠ ও ভ্রমণের বিষয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস রবিবারের ফাঁকা রাস্তায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে-চালাতেও আমার মনে সঞ্চারিত করে দিলেন।

অ্যান ডেভিস

পোল্যান্ডের কবি যোসেফ বারান ও আরবি কবি গাইল্যানের সঙ্গে লেখক

আমার বাড়িতে বাড়তি দুটো ঘর আছে, যার খুশি চলে আসবে। তবে একসঙ্গে চারজনের বেশি নয়। কেননা ঘর মাত্র দুটোই।
আমার হাত ধরে বললেন, দেশ দেখতে এত ভালোবাসো, অবশ্যই বলিভিয়ায় এসো। আমি থাকি লা প্লাজ-এ।

গাইলানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এতই গভীর হয়ে উঠেছিল যে নিউ সাউথ ওয়েলসে তার স্ত্রীর রান্না বিরিয়ানি ও কাবাব তার পীড়াপীড়িতে অত্যধিক খেতে হয়েছিল।

সিডনির বিখ্যাত অপেরা হাউস

আবার, অস্ট্রেলিয়ার কবি বিয়াত্রিস কপেলোর জন্ম আর্জেন্টিনায়। নারীবাদী বহু পত্রিকায় কবিতা লেখেন। তাঁর 'মেডিটেশন অ্যাট দ্য এজ (edge) অফ এ ড্রিম' বইটি আমাকে দেবার সময় একটা কবিতায় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল, সেটা এই—

My mother visits my dream,
when she finds me
tired and fragile
after the daily struggles ... ইত্যাদি।

মজার কথা, কলকাতায় আমার এক প্রিয় কবি আমার একটা কবিতা তাঁদের পত্রিকায় ছাপাবার জন্য নিয়ে রেখেছেন, তারই একটা কপি ছিল আমার সঙ্গে তার প্রথম লাইনটা এইরকম:

মাঝে মাঝে যেমন আসে কালও তেমনই এসেছিল মা
মানুষ যাতে সুখে থাকে
বৃক্ষ ভালোবাসায় থাকে
জল আর্সেনিকমুক্ত থাকে
উপায় কী তার?
মিলিয়ে যাবার আগেই বলি মাকে।

স্বপ্নে মায়ের আসা নিয়ে দুর দেশের দুই ভাষার কবিতার এরকম অদ্ভুত মিল দেখে দুজনেই বেশ অবাক হলাম, খুশিও হলাম।

প্রবাসী কবি প্রসঙ্গে, অস্ট্রেলিয়ায় উদ্বাস্তু, উরুগুয়ের কবি রামন কুয়েলহো-র কথাও বলতে হয়। 'প্রিজন পোয়েমস' বা 'কারা-কবিতা'র সংকলন প্রকাশ করে যাটোর্ধ্ব রামন অনেকের নজরে পড়েন।

বলিভিয়ার কবি লিদিয়া পারাদা দ্য ব্রাউন আমাকে নিয়ে তাঁর ভাষায় খুব ছড়া বানাতেন, হেসে হেসে সবাইকে শোনাতেন, এটা তাঁর প্রায় নিত্যকার কাজ হয়ে দাঁড়াল। ছন্দ শুনে মজা পেতাম, কখনও কখনও অর্থও বলে দিতেন, সেও মজারই, আমাকে দেখে তাঁর যখন যা মনে হয় তাই নিয়েই এইসব তাৎক্ষণিক ছড়া। এপর্যন্ত তাঁর নটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসপানিক আমেরিকান সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করে এই মহিলা স্বদেশে সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তাঁর অনেক কবিতা পড়ে ফেললাম, বুদ্ধি আর কৌতুক মেশানো গভীর কথার কবিতা। বয়স নাকি আশি। আমাদের অবিশ্বাসের হাসি দেখে বয়েসের প্রমাণপত্র বের করতে লাগলেন। চলে যাবার দিন ঘনিষ্ঠদের তাঁর কার্ড দিয়ে বেশ হেঁকে বললেন, আমার বাড়িতে বাড়তি দুটো ঘর আছে, যার খুশি চলে আসবে। তবে একসঙ্গে চারজনের বেশি নয়। কেননা ঘর মাত্র দুটোই।

আমার হাত ধরে বললেন, দেশ দেখতে এত ভালোবাসো, অবশ্যই বলিভিয়ায় এসো। আমি থাকি লা প্লাজ-এ।

ইস্রায়েলের কবি-লেখক আদা আহারোনি তো আমার একটা বই হিব্রুতে অনুবাদ করবেন বলে চেয়ে নিলেন। পঁচিশটি গ্রন্থের লেখক। আরেকজন ইস্রায়েলি কবি সারা দিৎসার উপনিষদে আগ্রহ দেখে রাধাকৃষ্ণাণের ইংরিজি উপনিষদের নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম।

জেরুজালেমে জন্ম, প্যালেস্টাইনি কবি হানান আওয়াদ প্যালেস্টাইন রাইটার্স ইউনিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। একদিন বাসে তার কাছে বসে তাঁর দেশের নতুন পুরনো কবিতার কথা শুনলাম।

অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন ফ্যাংফোর্ড টিন এজারদের জীবন নিয়ে গোটা একটা কবিতার

বই লিখেছেন, নাম— 'আমার সঙ্গে সোজাসাপটা কথা বলো।' ট্রেভ্যার ল্যাংল্যান্ডস নৈশ-উৎসব 'পানশালায় কবিরা' পরিচালনা করেছেন সাত বছর। অস্ট্রেলিয়ার আরেক কবি মার্ক ও'কোনোর এপর্যন্ত পনেরোটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন, তাছাড়া 'দুই শতাব্দীর অস্ট্রেলিয়ার কবিতা' সংকলনেরও সম্পাদক।

যাঁদের সঙ্গে বেশি সময় কেটেছে, তাঁদের অনেকে যেমন আমার মনে প্রিয় সঙ্গী হয়ে উঠেছেন, অনেকের আবার শুধু কবিতাই মনে আছে। নানা দেশের কবিদের এই মিলনমেলায় এই তো আমার এক মস্ত পাওয়া। এ যেন অচেনা সমুদ্রের অলৌকিক এক ঝলক হাওয়া। হিংসা হানাহানির পৃথিবীতে আহত মনপ্রাণ যেন জুড়িয়ে দেয়।

নিউইয়র্কের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা নিয়ে অনেক কবিই কবিতা পড়লেন। একজনের কবিতার একটি বাক্য আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। অনেকটা এই ধরনের— কিশোরী বেলা থেকে এই বুড়িবেলা পর্যন্ত কতবার আমার বুকভাঙা চোখের জল শুকোতে কত মোমবাতি জ্বালিয়েছি, আরও মোমবাতি, আবারও মোমবাতি! এত মোমবাতি আমি কোথায় পাব?

বারান একদিন বললেন, আমার মেয়ে ইংরিজি জানে। তুমি যদি ই-মেলে আমাকে ইংরিজিতে চিঠি লেখ, আমার মেয়ে তা আমাকে অনুবাদ করে দেবে। আমার চিঠিও তোমাকে ইংরিজিতেই পাঠাবে।

অস্ট্রেলিয়া সৈকতপ্রধান দেশ, সকলেই জানেন। আমরা সিডনিতে একদিন সারা দুপুর সমুদ্রের 'ঘাটে' দাঁড়িয়ে কবিতা পড়লাম। সেদিন রাস্তার ধারের দোকান থেকে লাঞ্চের প্যাকেট তোলা হল, খাওয়া সারলাম আরেকটি সৈকতে বসে। সেখানে কলকাতার কাকের মতো সী গালদের ভিড়। এই দুই পাখিই স্বভাবে এক, তফাত শুধু রঙে।

সিডনি ছাড়াও, নানা দেশের কবিরা একসঙ্গে নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কবিতা পড়ছেন, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রতিষ্ঠানে আপ্যায়িত হচ্ছেন ও সেখানকার কবি শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন —এ এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। আট দিন ধরে দুবেলা, তিনবেলা বা কখনও কখনও চারবেলা এরকম কবিতাপাঠ ও আলোচনা আর সেইসঙ্গে অন্তঃশীল ভ্রমণধারা।

কত দেশের কত ভাষায় কবিতা পড়া হল তার ইয়ত্তা নেই। কানে সেইসব কবির কণ্ঠে সেইসব ভাষার ধ্বনি শোনা আর সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরিজি অর্থ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কত রকম ভাব, কথা, আনন্দ বেদনা, ব্যঙ্গ, বিভা—সব হৃদয়ে মাথায় পৌঁছে যায়। অনেকে সরাসরি ইংরিজিতেও কবিতা পড়লেন।

আমরা সিডনিতে একদিন সারা দুপুর সমুদ্রের 'ঘাটে' দাঁড়িয়ে কবিতা পড়লাম। সেদিন রাস্তার ধারের দোকান থেকে লাঞ্চের প্যাকেট তোলা হল, খাওয়া সারলাম আরেকটি সৈকতে বসে।

অস্ট্রেলিয়ার বুশ বা জঙ্গলে কবিতাপাঠের একটা খুব মজার ঘটনা উপভোগ করেছিলাম। সেদিন সকালে ছোট জাহাজে চড়ে দূর থেকে ন্যুডদের দ্বীপ দেখে চলে গেলাম ম্যানলি, সেখানে জঙ্গলসফর ও কবিতাপাঠের ব্যবস্থা। সেদিন সেই কবিদলে আমরা পনেরো-ষোলজন ছিলাম। বাকিরা গেছেন সিডনির বিখ্যাত অপেরা হাউসে কবিতাপাঠের আসরে। যাইহোক আমরা পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে ক্রমশ ওপরে উঠে শেষমেশ সমুদ্রোন্মুখ পাহাড়ের কিনারে পৌঁছলাম। সেখানে চওড়া খাঁজে বসে-দাঁড়িয়ে শুরু হল কবিতা পড়া। কিনারের ঠিক নিচে প্রশান্ত মহাসাগরের অনন্ত জলরাশি।

উরুগুয়ের কবি এডিলিয়া পোর্ত-ভিডান ইংরিজি ও স্প্যানিশ— দুটি ভাষাতেই কবিতা লেখেন। তিনি সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ধীর ও মৃদু গলায় কবিতা পড়তে লাগলেন— যার মোটামুটি অর্থ, আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, তাকেই তুমি সারাদিন ধরে অসংখ্যবার চুমু খাচ্ছো, ইত্যাদি। একেকটা পংক্তিতে সেই একজনকেই সম্বোধন করে এরকম নানা কথা। প্রত্যেকটা পংক্তি পড়বার সময় সেই মহিলা বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলছেন। আমি ভাবলাম কবিদের বাতিক আর মুদ্রাদোষের বুঝি কোনও সীমাসংখ্যা নেই। বার বার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কবিতা পড়াও নিশ্চয়ই তেমনই একটি মুদ্রাদোষ। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, মহিলা প্রতিবার ঠিক যেখানটায় দৃষ্টি ক্ষেপ করে কবিতা পড়ছেন, সেখানে নীল জলরাশির বুকে এক ঝাঁক সী গাল। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে আর কবিতা পাঠ শুনতে শুনতে হঠাৎই বোঝা গেল— এই কবি সমুদ্রের প্রেমিকা, সী গাল যেন তার সতীন, পুরো কবিতাটাই এই সী গালকে সম্বোধন, সেই জন্যই সমুদ্রের বুকে সী গালদের দিকে ফিরে তাঁর কবিতা পাঠ।

সমুদ্রের সঙ্গে খেলা, মা ও শিশুকন্যার
ছবি: লেখক

ওলঙ্গংয়ের নান তিয়েন বৌদ্ধ মন্দিরে রাত্রিবাসও একটা মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা। মন্দিরের লাগোয়া তীর্থযাত্রীনিবাস বা পর্যটকাবাস যাই বলি না, আরামে-স্বাচ্ছন্দ্যে সেবায়-পরিষেবায় বিদেশি তিন তারা হোটেল বলেই ভুল হয়। যেমন মন্দির, তেমনই তার অতিথিনিবাস। পরদিন সকালে চলে আসার সময় নিরামিষ ব্যুফে ব্রেকফাস্টও আমার সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। বিশেষ করে সয়াবিনের সসেজের স্বাদ-গন্ধ ভুলব না। তবে ওই মন্দিরবাসের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে এক ফরাসি মহিলা কবি রাতে কে জানে কোন কাজের কথা বলতে এসে হঠাৎই তাঁর আকুল হৃদয় নিয়ে আমার ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ায় কিছুটা মুশকিলে পড়তে হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

সেই মহিলাকে বহু কষ্টে বুঝিয়ে সুজিয়ে, শেষে কিছুটা কৌশলে ফেরাতে হয়েছিল ('মন্দির থেকে বেশ কিছুটা দূরে পার্ক করা আমাদের কোচ থেকে ভুলে ফেলে-আসা আমার একটা ব্যাগ দিয়ে যাবার জন্য ড্রাইভারকে অনুরোধ করেছি, সে এসে পড়ল বলে' ইত্যাদি)।

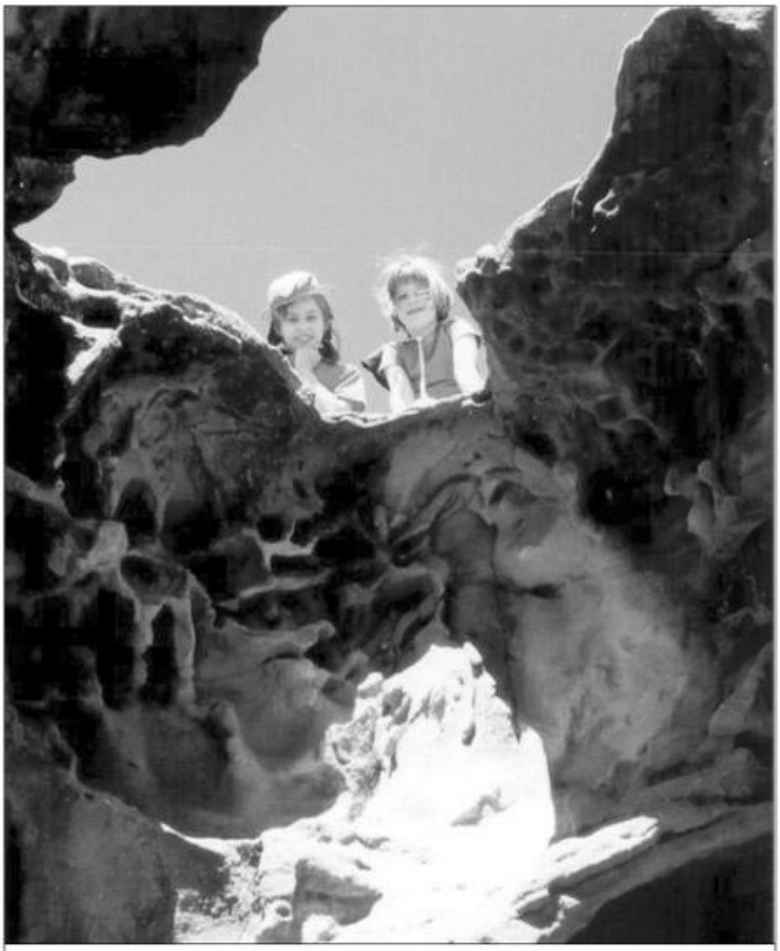

অস্ট্রেলিয়ায় এই পাহাড়ের নীচে সমুদ্র, ওপারে পাহাড়ের জঙ্গলে কবিতাপাঠের আসর বসেছিল। পাহাড়ের মাথায় দুই কৌতূহলী শিশু □ ছবি: লেখক

আমার দুঃখ ও ক্ষোভের ঘটনাও আছে একটা, অনেক চেষ্টা করেও ইস্রায়েলের কবি সারা দিৎসি কুর্তচি আর প্যালেস্টাইনের কবি হানান আওয়াদ বা আরবি কবি গাইলানকে পাশাপাশি বসিয়ে একটা ছবি তুলতে পারিনি।

যাবার সময় প্রায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর ধিক্কারও শুনতে হল— ভালোবাসার কথা তুমি শুধু লেখো, আসলে তুমি তাকে অপমান করো (ইউ রাইট অব লাভ, বাট ইউ ইনসাল্ট ইট!)।

দোষের মধ্যে, আমার একটা সরল সাদামাটা কবিতা এবারের নানা অনুষ্ঠানে আমাকে পড়তে হল, সেই কবিতাটা এইরকম:

যে ভাষা শুধু মানুষের চোখই বলে
সেই ভাষায় কবিতা লিখব বলে
আমি সারাজীবন শব্দ আর ক্ষত
আর মেঘ আর মুখ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি
আমার হৃদস্পন্দন প্রতি মুহূর্তে জপ করে চলেছে—
'ভা লো বা সো, ভা লো বা সো'
একদিন আমি ঠিক একটা রেডিও স্টেশন দখল করে নেব
আর সরাসরি ব্রডকাস্ট করব আমার হৃদস্পন্দন!

যাবার সময় প্রায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর ধিক্কারও শুনতে হল— ভালোবাসার কথা তুমি শুধু লেখো, আসলে তুমি তাকে অপমান করো (ইউ রাইট অব লাভ, বাট ইউ ইনসাল্ট ইট!)।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টে সেই ফরাসি কবিকে অনুপস্থিত দেখে একটু ভয়ও হল— ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে বা অপমানে অধিকমাত্রার ঘুমের বড়ি-টড়ি খেয়ে বসেননি তো!

কোচে ঢুকে দেখি নিজের সিটে বসে আছেন, সামনে গিয়ে বললাম— বোঁ জুর, মাদাম!

দুয়েক মুহূর্ত আমার দিকে কিছুটা বিস্ময়ে চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, বোঁ জুর। কালকের ব্যাপারে আমি খুবই দুঃখিত, আশা করি ভারতীয় ব্রাহ্মিণ আমাকে এজন্য ক্ষমা করবেন। তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মিণ? কাল সারা রাত ভেবে কথাটা আমার মনে হয়েছে।

নানা দেশের নানা ভাষার কবিদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার নানা অঞ্চলে কবিতা পড়ে বেড়ানো, কবিতা শোনা, কবিতা নিয়ে আলোচনা। সিডনিতে চার দিনের মূল কবিসম্মেলনের পর সিডনির বাইরে বিভিন্ন সাহিত্যসংস্থা আয়োজিত কবি-অভ্যর্থনা, কবিতাপাঠ ও কাব্য-আলোচনার যেন একেবারে বান ডাকল। সিডনি থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ উপকূলে ওলঙ্গং, সেখান থেকে ক্যানবেরা, কাটুম্বা— একযাত্রায় কবি, কবিতা, সমুদ্র, পাহাড়! আমাদের ভ্রমণ বাতানুকূল বাসে, রাত্রিবাস হোটেলে, মন্দিরের অতিথিশালায়, মধ্যযুগের পান্থশালায়। আমার জীবনে এই যাত্রা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বিশ্বময় এত যে বন্ধু ছড়ানো আছে কে জানত! পৃথিবীর দেশে-দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে আমার এই ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই অসংখ্য বন্ধু আছে, শুধু পরিচয়ের অপেক্ষা।

তবে আমার দুঃখ ও ক্ষোভের ঘটনাও আছে একটা, অনেক চেষ্টা করেও ইস্রায়েলের কবি সারা দিৎসি কুর্তচি আর প্যালেস্টাইনের কবি

নানা দেশের কবিদের সঙ্গে লেখক

হানান আওয়াদ বা আরবি কবি গাইলানকে পাশাপাশি বসিয়ে একটা ছবি তুলতে পারিনি। গাইলান সাগ্রহে রাজি, সারা এক ইঞ্চিও এগোবেন না। হানান কবিতা পড়লে সারা চোখ বুজে ঘুমনোর ভান করেন। আবার সারার কবিতাপাঠের সময় হানানের বাইরে যাবার দরকার হয়। সে-তুলনায় ইস্রায়েলের ইহুদি কবি আদা আহারোনি ও ইরাকের আরবি কবি গাইল্যান অনেক উদার ও খোলামেলা।

সিডনিতেই দেখা হল নিউইয়র্কপ্রবাসী নব্বই দেশ-ঘোরা গুজরাটি উড়নচণ্ডী, বিবাহসূত্রে বাঙালি, প্রীতি সেনগুপ্তের সঙ্গে। এখানে কবিতা পড়েই যাবেন কোন দূর দ্বীপে, সেখান থেকে আর কোনও দেশে। বললেন, তাঁর সুমেরু-কুমেরু অভিযান নিয়ে বই লিখেছেন, অনেকদিন আগে নাকি আমাকে সে বিষয়ে চিঠিও লিখেছিলেন। পরিচয় হল কিন্তু এই সিডনিতে, কবি সম্মেলনে।

এর প্রায় একবছর পরে আগস্টের শেষে যোসেফ বারানের বার্তা পেলাম:

একবছর জানুয়ারিতে আমার খুব বড় অপারেশন হয়েছিল, আশা করি পুরো সুস্থ হয়ে যাব, খারাপ কিছু পাওয়া যায়নি। সিডনির কথা আমাদের সংবাদপত্রে লিখেছিলাম। তোমার কথা অনেক লিখেছি, তোমার-আমার ছবি সহ। এই লেখাটা আমার নতুন বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

উত্তরে আমি লিখি:

এই অক্টোবরে ইলেক্ট্রনিক পাবলিশিং নিয়ে দু-দিনের এক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে বার্সিলোনা যাচ্ছি। সেখান থেকে ২৫ অক্টোবর যাব রুমানিয়ার ইয়াস-এ বিশ্ব কবিসম্মেলনে, আশ্চর্যের কথা, এবছর নাকি আমার বিশেষ নিমন্ত্রণ। মাঝের পাঁচ-ছদিন কোনও কাজ নেই, তুমি সেসময় শহরে থাকলে ওই ক'দিনের জন্য ক্র্যাকাও যেতে পারি।

সেদিনই ই-মেলে যোসেফের ইংরিজি-জানা মেয়ের চিঠি পেলাম:

আপনার বার্তার জন্য ধন্যবাদ। দুর্ভাগ্যবশত আমার বাবা এখন ক্র্যাকাওয়ের বাইরে। তাঁর সঙ্গে আমার সোমবার ২ সেপ্টেম্বর দেখা হবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আপনাকে দেখলে বাবা ভীষণ আনন্দ পাবেন। আমার মনে আছে তিনি একবার বলেছিলেন, 'অমরেন্দ্র ক্র্যাকাও এলে আমি খুব খুশি হব।'

তাঁর সঙ্গে কথা হওয়া মাত্র আমি আপনাকে চিঠি লিখব।

গ্রীটিংস। ইতি— এভা বারান

২ সেপ্টেম্বরের চিঠি:

আমি আবার লিখছি। বাবার সঙ্গে কথা বলেছি, আপনি পোল্যান্ড আসতে পারেন শুনে তিনি আনন্দিত। ওইসময় তিনি নিশ্চয়ই ক্র্যাকাওয়ে থাকবেন। —এভা

ইতিমধ্যে আমার কর্মসূচির সামান্য বদল হওয়ায় পোল্যান্ডের তারিখও বদলাতে হল। সে কথা এভাকে জানিয়ে দিলাম।

তারপর ৪ সেপ্টেম্বর:

আমার বাবা এখনও ক্র্যাকাওয়ে নেই, যে গ্রামে তিনি জন্মেছেন, সেই গ্রামে বিশ্রাম করছেন। এসপ্তাহের শেষে তাঁর ফেরার কথা। কিন্তু ঠিক কবে, আমি জানি না। উনি আমাকে ফোন করলে, আপনার তারিখ বদলের কথা জানাব। আপনাকে দেখলে তিনি সত্যিই খুশি হবেন, এবং আমি নিশ্চিত যে তারিখের বদলে কিছু যাবে-আসবে না। আপনি নিশ্চয়ই ওয়ারশও যাবেন? সেখানে আমার বোন থাকে, আপনার থাকবার কোনও অসুবিধা হবে না।

ক'দিন পরের চিঠি:

স্বরাষ্ট্র বিভাগে কথা বলেছি। আপনার জন্মের স্থান ও তারিখ আজই ই-মেলে পাঠাতে পারেন? আপনার ভিসার ব্যাপারে দরকার।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে। প্রিয় বন্ধু, প্রিয় কবির সঙ্গে দেখা হবে বলে শুধু নয়, পৃথিবীটা স্বভাবত এইরকম বলে।

আমার বাবা এখনও ক্র্যাকাওয়ে নেই, যে গ্রামে তিনি জন্মেছেন, সেই গ্রামে বিশ্রাম করছেন। আপনাকে দেখলে তিনি সত্যিই খুশি হবেন, এবং আমি নিশ্চিত যে তারিখের বদলে কিছু যাবে-আসবে না।

পুরনো অ্যালবাম

কষ্টিপাথর

এটি আমাদের সাহিত্য আলোচনা বিভাগ। মহাকাল স্বীকার করেন শুধু মাত্র সেই সব গ্রন্থকে যা রসোত্তীর্ণ, যা সর্বকালের এবং সর্বজনের।

শূলপাণি

মহাস্থবির জাতক—মহাস্থবির

কষ্টিপাথর বিভাগে একটা পিলে চমকানো নিয়ম করে আমাদের "মহাকাল" বসে আছেন। এখানে আলোচিত হবে সেই বই "যা সর্বকালের, সর্বজনের এবং নিশ্চিত ভাবে রসোত্তীর্ণ"। এখন বলুন দিকি— একটা ভাষায় ক'খানা এরকম বই বেরোয়? বিশেষ করে বাংলাভাষায়— এই সেদিন যার রবি অস্ত গেল। একটানা রাত্রির দীর্ঘ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কোন রকমে পথ করে যখন প্রকাশকরা বটতলার দিকে এগোচ্ছে— কোনদিক থেকে হঠাৎ "আলোর ঝলকানির" সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না— এমন সময় সেই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি ভেদ করে অসম্ভবের 'ঋচিত কিরণ" উল্কার প্রভা নিয়ে ঝলসে উঠল। অবশ্য বাংলা চিরকালই অসম্ভবের দেশ। নইলে যে বাঙ্গালীর বঙ্গ ভঙ্গ রদের আন্দোলন ঘুমন্ত ভারতবাসীর রক্ত টগবগ করে একদিন নাচিয়ে তুলেছিল সেই বাঙ্গালী সেই বাংলা ভাগ করিয়ে তবে ছাড়লে। যাকগে যা বলছিলুম— যখন boy-meets-the-girl ধরণের গল্পের ভারে বাঙ্গালী পাঠকের মেরুদণ্ড বেঁকে যাবার দাখিল, মহাস্থবিরের এই বলিষ্ঠ রচনা সে দুর্দৈব থেকে তখন আমাদের রক্ষা করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের কোলকাতা তথা ভারতবর্ষ। যাকে আমরা ভুলে গেছি, দেখে চিনতে পারি না। যখন ট্রামের ওভারহেড তারে বিজলীর ঝলক দেখবার জন্য রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়িয়ে যেত, যখন ছাত্রকে ক্লাশে মারবার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে ইস্কুলের ফটকের সামনে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে মাষ্টারকে "বাপের বিয়ে" দেখান হত— সেই সব দূর অতীত কালের কাহিনী জাতকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে। মহাস্থবির তাঁর অগাধ পরমায়ুর গোড়াকার গুটী কয়েক বৎসরের কথা জাতকের দুই ভাগে ব্যক্ত করেছেন। কাহিনী সম্বন্ধে পরে বলছি। প্রথমে অভিনন্দন জানাই বইটার ভাষাকে। মরি, মরি, আমাদের প্রতিদিনের তুচ্ছতার ধূলোয় ঢাকা চলতি বাংলার এত সম্পদ, এমন বর্ণনা শক্তি! কোথায় তারা লুকিয়ে ছিল? ব্যবহারিক শৈথিল্যে বুঝতেই পারি নি চলতি কথায় কী গতিই না সৃষ্টি করা যায়। যে সহরে ৫০ গজ দূরে ট্রাফিক পুলিশ, আধ হাত চল্লে ১০ বার ধাক্কা খেতে হয়, সেই কোলকাতাবাসীকে এ গতি বোঝাতে কোন উপমা দেব? ভাষা নির্বাচনে লেখক এমন মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন যে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বইটার একটী লাইনেও কাহিনীকে থমকে দাঁড়াতে হয় নি। আবার দরকার হলেই চট করে গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, গুরু ভাষা প্রয়োগ করেছেন কিন্তু কোথাও এতটুকু শ্রুতিকটু হতে দেন নি। এইবার বিষয় বস্তুতে আসা যাক। লেখক বহু চরিত্র আমদানী করেছেন, বিচিত্র তাদের জীবন। অত চরিত্রবাহুল্য থাকা সত্ত্বেও কেউ অসম্পূর্ণ নয়। বর্ণনা কোথাও স্বল্প পরিসর, কোথাও অতি বিস্তৃত। কিন্তু ছবি কোনখানে ফিকে হয় নি। কৌতূহল আপনার স্তিমিত হবে না কোথাও, এম্নি ভাষার বাঁধুনি ও বক্তার সংযম। সব থেকে আশ্চর্য লাগে চরিত্রের বৈচিত্র্য দেখে। কী নাই এই জাতকে? ছেলে ঠ্যাঙ্গানো পাগল-পালক পিতা, শেলীভক্ত গঞ্জিকাসেবী "পাগলা সন্ন্যাসী", দেহজ্বরে পীড়িতা ব্রহ্মচারিনী, এক্কাওলার গালে চড়মারা বাঙ্গালী যুবতী বিধবা, চোদ্দ বছরের ছেলের ত্রিশ বছরের চাপদাড়িযুক্ত ছাত্র মায় আটঘণ্টা কাঁধে নাড়িটেপা হকিম সাহেব পর্যন্ত। কিন্তু ঐ সব অসম্ভব অসম্ভব ব্যাপার গুলো কলমের গুণে একেবারে জীবন্ত হয়ে পাঠকের চোখের সামনে অভিনীত হতে থাকে। আপনি কখনও স্থবিরের বাবা মহাদেব শর্ম্মার সঙ্গে মাধববাবুর বাজার (বর্তমানে যেখানে আশুতোষ বিল্ডিং) থেকে তিলজলা পর্যন্ত চিলের পেছনে তাড়া করে ফিরবেন কারণ ঐ চিল মহাদেব বাবুর হাত থেকে দেড়সের ওজনের এক টুকরো শিলংমাছ নিয়ে পালিয়েছে। কখনও পাগলা সন্নেসীর গাঁজা টিপতে টিপতে একটি চোদ্দ আর একটা ন' বছরের ছেলের সাম্নে শেলীর "Alastor" থেকে আবৃত্তি শুনবেন। বা ঐ দুই ভাইকে ঐ বয়সে মালটানায় দীক্ষা দিয়ে কর্তব্য সমাপন করে সে রাতেই সন্নেসীর ইহলোক থেকে বিদায় নেওয়া দেখে স্তম্ভিত হবেন।

জাতকের দ্বিতীয় পর্বেও এই রকম বহু আলৌকিক চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলবার আছে। এই ভাগের প্রথম দিকে বর্ণিত লক্ষ্মীমণির গৃহের ঘটনাবলীর ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরের দিকের দিদিমণির বাড়ীর দৃশ্যগুলোর ওপর পড়েছে। চরিত্রগুলোর মধ্যেও বেশ একটা ঐক্য লক্ষিত হচ্ছে। প্রথম দিকের বদিনাথ ও দিদিমণির বাড়ীর অমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়ের মধ্যে বেশ একটা মিল আছে— তেম্নি লক্ষ্মীমণির বাড়ীর ঝি "রসিয়াকি মায়ি" ও দিদিমণিদের দাই "আহিয়া" ইত্যাদি। ঐ পুনরাবৃত্তিটুকু না ঘটলেই যেন ভাল হত। অবশ্য ঐ ত্রুটীর জন্য এ পর্বটিও ফেলনা নয়। যথেষ্ট বর্ণাঢ্য চরিত্রসমষ্টি, বিস্ময়কর ঘটনা প্রবাহে এ পর্বটী বেশ সুখপাঠ্য। ২য় ভাগ রচিত মহাস্থবিরের গৃহত্যাগ নিয়ে, কাজেই বাংলার বাইরের তৎকালীন ছবি হিসাবে এ ভাগটীও বেশ উৎরেছে। বিশেষ করে সে কালের কাশীর বিবরণ অতি নিখুৎভাবে লেখা হয়েছে।

জাতকের যাদুঘরে কত যে wax model রয়েছে তার বিশদ সমালোচনা অসম্ভব। তবে অসঙ্কোচে বলতে পারি গ্যালারীর পর গ্যালারী ঘুরে বেড়ালেও দর্শকের এতটুকু ক্লান্তি আসবে না। ধন্য মহাস্থবির! তুমি কি ম্যুসিয়মই সাজিয়েছো!

আর পরিশেষে বলতে চাই— ২য় পর্বের পর অনেককাল হয়ে গেল, হে মহাস্থবির, আর আমাদের ঔৎসুক্যে দগ্ধে মের না বাপু। ঝট্‌পট ৩য় পর্ব বার করে ফেল। তবে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বোধকর যে ৩য় পর্ব হয়ত তেমন ওৎরাতে পারবে না— তাহলে বাপু, কক্ষনো শুধু এই ধরণের রচনায় দু'দু'বার বাজী মাৎ করেছ বলে ৩য় বার সেই পুরোনো প্যাঁচ ছেড় না। তোমার ত অজানা নেই, জ্ঞানবৃদ্ধ, অতি লেখার পাপে কত একদা-অসামান্য লেখকের ভরাডুবি হয়েছে।

প্রকাশকের দার্শনিক সুলভ ঔদাসিন্যে পুলকিত হতে পারি নি। তিনি কমল হীরে ন্যাতায় মুড়ে রেখেছেন মানে বইটার ছাপা, বাঁধাই একেবারে যাচ্ছেতাই।

মহাস্থবির জাতক— ১ম ও ২য় পর্ব। "মহাস্থবির"। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ২৫/২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা। দাম ৪৲ (১ম পর্ব) ও ৪৲ (২য় পর্ব) পৃষ্ঠা ২৮৮+২৯৯ অক্টেভো ক্রাউন সাইজ।

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' বৈশাখ, ১৩৫৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত। বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

৮

(পরিচ্ছেদ: ২২, ২৩, ২৪)

উনিশটি পূর্ণিমা গাছবাড়িতে সুখে কাটবার পর অমাবস্যার দুদিন আগে তিন মাসের পোয়াতি নন্দিনীর পেটের ওপর হাত, উরুর ওপর পা রেখে দিবাকর যখন গভীর নিদ্রায়, দুজনের কেউই দরজার চার ফেরতা দরমা কাটার শব্দও শুনতে পায়নি, তখন চার সশস্ত্র যুবক আচমকা দুজনের হাত মুখ শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে।

একজন দিবাকরের বুকে, আরেকজন তার পিঠে রিভলবার ঠেকিয়ে তাকে ঘরের বাইরে এনে এবার মাথার তালুতে রিভলবার ঠুকে হুকুম করল— 'সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামো।' একজন তার একটা পা টেনে সিঁড়িতে প্রথম ধাপে দাঁড় করিয়ে দিল। আরেকজন নন্দিনীর দিকে ফিরে গম্ভীর স্বরে শোনাল— 'আমরাই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। পুলিশকে খবর দিলে তক্ষুনি গুলি করে এর মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হবে।'

বাঁধা দুহাতের এক আঘাতেই সামনের ছেলেটির মুণ্ডু উড়িয়ে দেবার জন্য দিবাকর শরীর টানটান করে মোক্ষম মোচড় দেবার আগেই একজন নন্দিনীর বাঁ স্তনের ওপর তার রিভলবারের মুখ চেপে ধরল, আরেকজনের হাতের লম্বা ছুরি তার তলপেট ছুঁয়ে রইল।

দিবাকরকে নীচে নামিয়ে দুচোখ বেঁধে দেওয়া হল। মোটর লাগানো নৌকোয় তুলে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে না ভেবে জঙ্গলের মধ্যে অসহায় নন্দিনীর কথা কল্পনা করে ক্রোধে তার মাথা চৌচির হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে নিরুপায় হাহাকারের লাভাস্রোত বইছে।

নৌকো থেকে নামিয়ে দিবাকরকে জিপে তোলা হল। সাত ঘণ্টা পর জিপ থেকে নামিয়ে আরও কয়েক ঘণ্টা হাঁটিয়ে তাকে গভীর জঙ্গলে একটা তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে তার চোখ মুখ হাতের বাঁধন খোলা হল।

কংকাল শেয়ালের না মানুষের, বালকের না বৃদ্ধের, পুরুষ না নারীর— কংকালের হাড়ে-গঠনে তার পরিচয় থাকে, কিন্তু কংকাল হিন্দুর না মুসলমানের, বৌদ্ধদের না খ্রিস্টানদের কংকালের গায়ে তার কোনও চিহ্নই থাকে না। কেন থাকে না? কারণ কংকালের কোনও ধর্ম নেই। কংকাল সর্ব ধর্মের অতীত।

বন্দুকে হাত বোলাতে বোলাতে লোকটা বলে উঠল, 'সাবাশ, সাবাশ! ভেরি গুড!' তার চোখের ইঙ্গিতে আগের মতোই দুজন দিবাকরের চোখ বাঁধতে এগিয়ে এল। মুখ-ঢাকা লোকটি দিবাকরকে বলল, 'বন্দুকের ব্যাপারে, আমাদের ব্যাপারে, জঙ্গলের ব্যাপারে কখনও কারও কাছে মুখ খুললেই মৃত্যু। কথাটা প্রাণ থাকতে ভুলবে না আশা করি।'

পুরু গামছায় প্রায় সারা মুখ ঢাকা একটা লোক দিবাকরের কাছে এসে কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'তোমার যন্ত্র তৈরির হাত মাথা খুব পরিষ্কার। আমাদের এই দোনলা বন্দুক ভালো করে দ্যাখো, তোমাকে পাঁচনলা বন্দুকের নকশা করে দিতে হবে। সেই নকশা মতো একটা বন্দুক বানিয়ে এখানকার দুজনকে হাতে-কলমে তোমার নকশা ও তার কারিগরি শিখিয়ে দিয়ে তোমার ছুটি।'

তার প্রতি এদের ব্যবহার শুধু ভালোই নয়, তাকে এরা রীতিমতো যত্ন আত্তি করছে। আলাদা তাঁবুতে তার থাকার ব্যবস্থা, দুবেলা পেট পুরে সুখাদ্য খাওয়ানো, যখন যে যন্ত্রপাতি দরকার জানালেই পাওয়া যায়। কামার বা ছুতোরের সহায়তাও চাইলেই মেলে। তবে আলাদা তাঁবুতে থাকতে দিলেও তাঁবুর চারপাশের পাহারা এক মুহূর্তের জন্যও আলগা করে না।

পাশাপাশি পাঁচ গুলি ছোড়বার পাঁচনলা বন্দুক এরা মানুষ মারার কাজে লাগাবে। সেই বিষাক্ত বন্দুক তাকেই উদ্ভাবন করতে হবে ভেবে দিবাকর মনে মনে যন্ত্রণা বোধ করে। এদের বিরুদ্ধে ক্রোধে মাথা জ্বলতে থাকে। নন্দিনীর কথা ভেবে মুখ বুজে সে কাজ করে যায়।

তার আরও একটা বড় দুঃখ, লিওনদাদার পরামর্শ মতো বালিসোনার গরিব মানুষের জন্য সে একটা যন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। ঘাস, পাতা, ফুল, ফল, ফলের বীচি, বাদাম, ধান, গম, শেকড়বাকড় সেই যন্ত্রে ঢুকিয়ে হাত দিয়ে মাড়াই করে নিলেই খুব সস্তায় প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থে ভরপুর খাদ্য তৈরি হয়ে যাবে। এ কাজে সে অনেকটা এগিয়েও ছিল, এখন সব ভুলে মানুষ মারা বন্দুকের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে!

গাছবাড়িতে দাগানো উনিশ পূর্ণিমার পর আরও তিন পূর্ণিমা কেটে গেছে। বিপ্লবীদের জঙ্গলে দিবাকর দুই শিক্ষার্থীর চোখের সামনে পাঁচনলা বন্দুক তৈরি করে নকশাসমেত সেই বন্দুক তাদের হাতে তুলে দেবার পরদিন পুরু গামছায় প্রায় সারা মুখ ঢাকা নেতা দিবাকরের সামনে এসে দাঁড়াল। একটাও কথা না বলে বন্দুকে পাঁচটা গুলি ভরে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক তাক করে ট্রিগার টিপল। ঠিক পাঁচটা পাখি ওলোটপালোট খেতে খেতে নীচে পড়ে গেল।

বন্দুকে হাত বোলাতে বোলাতে লোকটা বলে উঠল, 'সাবাশ, সাবাশ! ভেরি গুড!'

তার চোখের ইঙ্গিতে আগের মতোই দুজন দিবাকরের চোখ বাঁধতে এগিয়ে এল। মুখ-ঢাকা লোকটি দিবাকরকে বলল, 'বন্দুকের ব্যাপারে, আমাদের ব্যাপারে, জঙ্গলের ব্যাপারে কখনও কারও কাছে মুখ খুললেই মৃত্যু। কথাটা প্রাণ থাকতে ভুলবে না আশা করি।'

দিবাকর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেও তার চোখের দৃষ্টিতে রাগ ও ঘৃণার ঝিলিক। ভয়ে ও উদ্বেগে সে কিছুটা অস্থিরও।

তার চোখ বেঁধে দেবার পর মুখ ঢাকা লোকটি সেই দুজনকেই আদেশ দিল, 'বালিসোনায় বউয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

'জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছেলে দুটির একজনের পেছন-পেছন তার হাতের লম্বা লাঠির ডগা ধরে জিপ অব্দি দিবাকর হেঁটে চলেছে। ঘণ্টাখানেক চলার পর লাঠি হাতে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে দিবাকরকে বলল, 'পেচ্ছাপ করবে?'

'দরকার নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চাই।'

'আমি পেচ্ছাপ করে আসছি। একটু দাঁড়াও।'

দু-মিনিট দুজনের কারও-ই সাড়া নেই। তারপরই একসঙ্গে দুটি রিভলবারের গুলি দিবাকরকে শুধু 'মা গো!' বলে চেঁচিয়ে ওঠবার সময়টুকু দিল।

বাইশতম পূর্ণিমাও এসে চলে গেল, দিবাকর তবু ফিরে এল না দেখে নন্দিনী দিবাকরের লেখা চিঠিখানা নিয়ে বার বার পড়ে। দিবাকরকে নিয়ে যাবার পর-পরই অল্পবয়েসি অচেনা একটা ছেলে এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে। সে ভালো আছে, শিগগিরি ফিরে আসবে, তার বিষয়ে কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। পড়তে পড়তে বুক ব্যথা করে উঠলে কখনও সরোজিনী কখনও লক্ষ্মী কখনও মিতার কাছে ছুটে যায়, কখনও বড় মা'র কাছে। নিজের মা'র কাছে আর যায় না, তাকে দেখলেই 'ও রে, সে আর বেঁচে নেই রে' বলে অলক্ষুণে কান্নায় মেয়ের বুকেই মাথা খুঁড়বে। ভোরবেলা অবনীমোহন ধ্যানে বসলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নন্দিনীও নীরবে বসে থাকে— যদি হঠাৎ তিনি চোখ খুলে কোনও আশার কথা শোনান। একেক দিন তাদের যে সন্তান আসছে তার হাত পা গা মাথার মাপ কল্পনা করে সারা দিন সেইমতো উল বোনে আর দিবাকরের সঙ্গে মনে মনে কত যে কথা বলে যায় সে নিজেই তার খেই রাখতে পারে না।

লিওন ও পরীক্ষিৎ প্রথম থেকেই পুলিশকে ঘটনাটা আগাগোড়া খুলে বলতে চেয়েছিল। নন্দিনীর বাধায় তাদের নিরস্ত হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে আলোচনা করে থানায় যখন নিখোঁজের ডায়েরি করা ঠিক হল, তখনও নন্দিনী কেঁদে-কেটে একসা, পুলিশকে জানালেই তার দিবাকরকে নাকি ওরা শেষ করে দেবে।

উলের মোজা, দস্তানা, টুপি, হাঁটু ঢাকা, গোড়ালি পর্যন্ত নানা মাপের ফ্রক ও নানা রঙের পঞ্চে ঘর ভরে গেল, দিবাকরের কোনও খোঁজ বা খবর পাওয়া গেল না। পূর্ণিমার হিসাব রাখা নন্দিনী ছেড়ে দিয়েছে, অমাবস্যার কাছাকাছি এক রাতে যখন সবাইকে অবাক করে একমাথা কোঁকড়ানো চুল আর তারই গায়ের রং নিয়ে তার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল তখনও নন্দিনী জানে না দিবাকর কবে ফিরবে। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে, তেল মাখিয়ে রোদে রেখে স্নান করাবার সময়, বিকেলবেলা

সাজিয়ে গুজিয়ে কপালে চুমু ও কাজলফোঁটা দিতে দিতে উদাসমনে ভাবে ছেলে কবে তার বাবার কোলে ঝাঁপাবার সুযোগ পাবে? কবে দিবাকর জোনাকজ্বলা ঘরের পূর্ণিমা-অমাবস্যায় তার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠবে? যত ভাবে ততই তার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ছেলের নাম প্রভাকর, না জ্যোতির্ময়, না অপরাজেয়— তা নিয়ে অনেক আলোচনার পরও বাড়ির সকলে একমত হতে পারছে না দেখে পরীক্ষিৎ বলল, 'ওর নাম রাখো মেঘাবৃত। মেঘাবৃত বসু। তোমাদের দুজনের পদবী জুড়ে বসুচৌধুরীও হতে পারে।'

নামকরণ শেষ হবার জন্য কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ব্রতীন দরজার বাইরে থেকে জানাল, 'একজন দিদিমণি এসেছেন, পরীক্ষিৎ দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।'

লখনউ থেকে সরস্বতীর চিঠি নিয়ে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক মহিলা এসেছে। সে পতিতাপল্লীর মেয়েদের পেশাপূর্ব পারিবারিক জীবন নিয়ে গবেষণা করছে। সেই কাজে বালিসোনার রেড লাইট এরিয়ায় ওই পেশায় যুক্ত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে পরীক্ষিৎ কি মেয়েটিকে সাহায্য করতে পারে? মেয়েটি বাঙালি হলেও জন্ম, শিক্ষা সবই বাংলার বাইরে।

আগে এপাড়ায় আট-দশটা খড়ের চালাঘর মাত্র ছিল, এখন টিন টালি অ্যাসবেসটসের ছাদ দেওয়া প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি ঘর। দরজায় দরজায় সন্ধে থেকে উগ্র সাজসজ্জা করে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। যেসব দরজার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, সেসব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে তার আগের অভিজ্ঞতা থেকে এখানেও নীলাঞ্জনা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মেয়েদের প্রথমেই জানাল সরকার এইসব অসহায় মেয়েদের সাহায্য করতে চায়। সেই জন্যই নীলাঞ্জনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে প্রত্যেকের আগেকার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে। নীলাঞ্জনা প্রথমে অভ্যাসবশে ইংরিজিতে বলল। পরীক্ষিৎকে তার বাংলা করে দিতে হল।

দ্বিতীয় দিনে একটা দরজার সামনে এক দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের মুখে পরীক্ষিতের চোখ আটকে গেল। লজ্জাবতী-ময়নামতীর একজন!

লজ্জাবতী বা ময়নামতী পরীক্ষিৎকে চিনতে পারেনি। তার সঙ্গে মহিলা দেখে পরীক্ষিৎকে ঘরে আসার জন্যে পীড়াপিড়ি করবে কিনা স্থির করতে পারল না।

পরীক্ষিতের কাগজের বান্ডিলের শিরোনামগুলোয় একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে বলল, 'এর সবটাই আমি জানি। খুন করে সত্যিই তো কাউকে মেরে ফেলা যায় না। সব হত্যাই কোথাও না কোথাও বেঁচে থাকে। হয় বিষ ছড়াতে, নয় অমৃত ফলাতে। আসল কথা, কোনও ঘটনাই কোনওদিন চিরতরে অতীত হয়ে যায় না।'

'হোয়াট এ চার্মিং লুক! ল্য ফ্লর দু মাল! হাউ শি কুড অ্যাপিয়ার ইন দি সিন? আই মাস্ট নো হার পাস্ট ইন এভরি ডিটেল।'

'প্লিজ ডোন্ট আস্ক হার এনিথিং। আই নো এভরিথিং অফ হার। শি হ্যাজ এ টুইন সিস্টার উইথ ইকোয়ালি ইল ফেট। লেটার আই উইল টেল ইউ অল।'

অন্যদিকে চলে যাবার সময় পরীক্ষিৎ নিজের কৌতূহলে না জিজ্ঞেস করে পারল না— 'তুমি ময়নামতী?'

মেয়েটি পাশের বন্ধ দরজাটা দেখে বা দেখিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'ময়নামতী ভেতরে। আমি লজ্জাবতী।'

২৩

ছেলেবেলায় তারই বয়েসি একটা ছেলেকে মেলার দোকান থেকে মোয়া চুরির অপরাধে মোয়া ভরতি বিরাট ধামা এক লাফে ডিঙিয়ে এসে দোকানদারের চড় কিল ঘুঁষি মারার দৃশ্য এখনও হঠাৎ হঠাৎ পরীক্ষিতের মন ফুঁড়ে উঠে আসে। মোয়ার ধামা লাফিয়ে পেরবার সময় নিজেরই পায়ে লেগে ধামা উল্টে সব মোয়া দোকানের সামনের কাদায় পড়ে যাওয়ায় দোকানদার রাগে অন্ধ হয়ে মেরেই চলে। শেষ পর্যন্ত মোয়ায় কাদায় মাখামাখি। ভাঙা ইটবালির ওপর উপুড় করে ফেলে সবাই মিলে ছেলেটাকে পায়ের চাপ দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল। দোকানদার তখনও জোর পায়ে ছেলেটার পিঠের ওপর লাফাতে লাফাতে বলছিল— প্যাঁকাটির মতো তোর সব ক'টা পাঁজর আমি গুণে গুণে ভাঙব রে ছোড়া!

একটা একটা করে বুকের পাঁজর ভেঙে গেলে মানুষের কী হয়— পরীক্ষিতের ছেলেবেলার সেই ভীত সন্ত্রস্ত ভাবনা আজও মাঝে মাঝে তাকে পেয়ে বসে, বিশেষত বিনিদ্র রাতে।

এই ভাবেই এক গ্রীষ্মের গুমোট রাতে বাবার কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁরই হাতে লেখা ভাঁজ করা কয়েকটা কাগজে পরীক্ষিতের চোখ আটকে গেল। একটা কাগজের মাথায় লেখা— 'সাত খুন মাফ।' নীচে বিবরণ। অম্বরীশের ঠাকুরদার আমলে তাঁরই নেতৃত্বে বালিসোনার কোন এক কপিখেতের যুদ্ধে সাত চাষিকে খুন করা হয়। জমিদারের লোকেরাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাতটি শবদেহ বাদায় গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়। আরেকটা কাগজের মাথায় লেখা— 'সাত কংকালের কাহিনী।' গভীর রাতে একে একে সাতটি কংকাল এসে অম্বরীশের বুকের ওপর বসে তার দম বন্ধ করে ফেলতে চায়, তারই বিশদ বর্ণনা।

তৃতীয় কাগজের শিরোনাম— 'খুন করে কাউকে মেরে ফেলা যায় না।'

পুরো রাতটা জেগে বসে সব ক'টা কাগজের লেখা বার বার পড়ার পর ভোরে সেগুলো নিয়ে অবনীমোহনের কাছে গেল। অবনীমোহন ছাদে উদীয়মান সূর্যের মুখোমুখি বসে ছিল, ভোরের প্রথম আলোয় পৃথিবীকে দেখা তার অনেক দিনের অভ্যাস। পরীক্ষিতের কাগজের বান্ডিলের শিরোনামগুলোয় একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে বলল, 'এর সবটাই আমি জানি। খুন করে সত্যিই তো কাউকে মেরে ফেলা যায় না। সব হত্যাই কোথাও না কোথাও বেঁচে থাকে। হয় বিষ ছড়াতে, নয় অমৃত ফলাতে। আসল কথা, কোনও ঘটনাই কোনওদিন চিরতরে অতীত

'হেডমিস্ট্রেসের সেই জারজ ছেলেটা না? তুমিও শেষে বেশ্যাপাড়ায় মাগী সাপ্লাইয়ে লেগে পড়লে, বাবা? মালটা তো ভালোই বাগিয়েছ!' পিছন ফিরে ফরাসে প্রায় গড়িয়ে পড়া রুদ্র ঝম্পটিকে দেখেই চিনতে পারল পরীক্ষিৎ। চুলে পাক ধরেছে, মুখ আরও গোল, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি।

হয়ে যায় না।'

কৃষ্ণপক্ষের শুরু থেকেই মাঝ রাত পেরিয়ে পরীক্ষিৎ, অবনী আর লিওন বাদায় এসে খোঁড়াখুড়ি শুরু করে দিল। বাইরের শুধু একজনকেই সঙ্গে নেওয়া হয়েছে, সে অভিজ্ঞ নিদ্দা। তৃতীয় দিনে একটা ঢিবি খুঁড়ে, ভাঙা-চোরা সাতটি কংকালই পাওয়া গেল। এই ঢিবির গায়ে হেলান দিয়ে অম্বরীশ সারা রাত ঘুমিয়ে ছিল।

পরীক্ষিৎ দেরি করতে চায় না, বর্ষা আসার অনেক আগেই বালিসোনার বিশিষ্ট মানুষদের ডেকে, চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে, ভিড় করে আসা মানুষজনের সামনে সাত কংকালের ভাঙা হাড়গোড় তুলে ঢিবির পাশে নতুন খোঁড়া গর্তে রেখে অনেকে মিলে সযত্নে মাটি চাপা দিল। তার ওপরে কংক্রিটের বেদিতে শ্বেতপাথরের ফলক গেঁথে দেওয়া হল। সাদা পাথরের গায়ে কালো হরফে পরীক্ষিৎ লিখিয়ে এনেছে:

বালিসোনার কপিখেতে
প্রথম ফসলরক্ষার যুদ্ধে নিহত
সাত শহীদের স্মৃতিতে

হিন্দু-মুসলমানের কংকালের একত্র অবস্থান নিয়ে ভিড়ের মধ্যে নিহতদের পল্লীর লোকেরা ও পরিবারের বংশধররা প্রথমে গুঞ্জন, পরে প্রতিবাদ করলে পরীক্ষিৎ তাদের বুঝিয়ে বলল— কংকালের কোনও ধর্ম থাকে না। কংকাল শেয়ালের না মানুষের, বালকের না বৃদ্ধের, পুরুষ না নারীর— কংকালের হাড়ে-গঠনে তার পরিচয় থাকে, কিন্তু কংকাল হিন্দুর না মুসলমানের, বৌদ্ধদের না খ্রিস্টানদের, কংকালের গায়ে তার কোনও চিহ্নই থাকে না। কেন থাকে না? কারণ কংকালের কোনও ধর্ম নেই। কংকাল সর্ব ধর্মের অতীত।

পরীক্ষিতের কৈফিয়তে অসন্তুষ্ট, হিংস্রদৃষ্টি কয়েকজনকে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিবেশীরা জোর করে নিয়ে যাবার পর জলকাদাভরা জনশূন্য বাদায় শহীদবেদীর সামনে অসময়ে ধ্যানরত অবনীমোহনের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পরীক্ষিতের দুচোখ জলে ভরে এল।

বাড়ি ফিরে অনেকদিন পর মিতার বুকে মাথা রেখে সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'বাবা বোধহয় এবার একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন!'

লক্ষ্মী-লিওনের বাড়িতে নীলাঞ্জনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পরীক্ষিৎ ব্যস্ত থাকায় এর মধ্যে পতিতাপল্লীতে আর যাওয়া হয়নি, সে-ক'দিন নীলাঞ্জনা ঘরে বসে লিখে, বই পড়ে কাটিয়েছে।

সপ্তাহখানেক পর পরীক্ষিতের সঙ্গে এ-চালা ও-চালা ঘুরে ঘুরে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে পল্লীর পশ্চিম প্রান্তে একটা নতুন দোতলা বাড়ি থেকে গান বাজনার আওয়াজ শুনে নীলাঞ্জনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

পরীক্ষিৎও বিস্মিত। এপাড়ায় এরকম বাড়ি কখনও ছিল না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই ছোট একফালি অপ্রশস্ত লম্বা ঘর, মেঝেয় এলোমেলোভাবে জুতো রাখা আছে, কয়েকজন বাদার মাটি কাটার লোক কড়া ফিনাইলের গন্ধে ভরা প্লাস্টিকের বালতি-ঝাঁটা নিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় মদের বোতল, সোডার বোতল, বাটি-ওপচানো বরফ খণ্ড নিয়ে সার্কাসের মেয়েদের মতো ফোলানো ইজের ও আঁটো ব্লাউজ পরা যুবতীরা ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে।

বড় হলঘরের দরজার পর্দা সরাতে বাইজীর নাচগানের জমজমাট আসর আলোয় ঝলমল করে উঠল। মাথায় কদমছাঁট চুল, ধুতির ওপর হাফশার্ট পরা পালোয়ানের মতো দুটো লোক পরীক্ষিৎদের সামনে লাফিয়ে এসে তাদের আটকে দেবার আগেই সামনে মদের সুদৃশ্য পাত্র নিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া আরবের এক শেখ নীলাঞ্জনার উদ্দেশে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল— 'এনতি জমিরা! এনতি জমিরা! শু ইসমাক?'

বোম্বাইয়ে 'হোটেল-প্রসটিটিউশন' সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সময় নীলাঞ্জনাকে আরবি ভাষা কিছুটা শিখতে হয়েছিল। এরকম একটি পরিবেশে আরব শেখের মুখে 'এনতি জমিরা' শুনে সে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হল। কথাটার মানে 'তুমি সুন্দর! কী সুন্দর তুমি!' এত সাহস যে নামও জিজ্ঞেস করছে— 'শু ইসমাক', তোমার নাম কী? তাকেও নিশ্চয়ই এই পল্লীর মেয়ে ভেবেছে। বিদেশে এসে মেয়েদের এরা কী চোখে দ্যাখে তার ভালোই জানা আছে।

লোকটা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে নীলাঞ্জনার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে পরীক্ষিৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল।

তার আগেই তার কানে এল— 'হেডমিস্ট্রেসের সেই জারজ ছেলেটা না? তুমিও শেষে বেশ্যাপাড়ায় মাগী সাপ্লাইয়ে লেগে পড়লে, বাবা? মালটা তো ভালোই বাগিয়েছ!'

পিছন ফিরে ফরাসে প্রায় গড়িয়ে পড়া রুদ্র ঝম্পটিকে দেখেই চিনতে পারল পরীক্ষিৎ। চুলে পাক ধরেছে, মুখ আরও গোল, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি।

'সাপ্লায়ার, না নিজেই মাড়াতে এসেছ, খোকা?'

সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছে পরীক্ষিৎ হড় হড় করে বমি করে দিল।

নীলাঞ্জনা তার কাঁধের থলে থেকে ছোট তোয়ালে বের করে দিয়ে বলে, 'লেট'স গো টু পোলিস ফার্স্ট।'

পরীক্ষিতের স্বর দুর্বল, হতাশায় ভরা— 'লাভ নেই, ঝম্পটি পুলিশের চোখে এখনও ফেরার। সে এখানে আছে, হয়তো নিয়মিতই আসে, পুলিশ ভালো করেই জানে।'

অনেক রাতে পরীক্ষিতের মনে হল তার একটা পাঁজর এবার প্যাঁকাটির মতো পুড়ছে।

সকালে অবনীমোহনের কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'আপনার কি মনে হয় না মানুষ মাত্রই সম্পূর্ণ অসহায়? জন্ম থেকেই চিরপরাজিত?'

'আমার ঠিক এর উল্টোই মনে হয়। আমার মনে হয় মানুষ অপরাজেয়, শুধু সকলে সেটা উপলব্ধি করতে পারে না।'

অবনীমোহনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেও পরীক্ষিৎ কোনও সান্ত্বনা পেল না।

অনেকদিন থেকেই মিতার তীর্থদর্শনে যাবার ইচ্ছে নানা অজুহাতে সে ঠেকিয়ে রেখেছে, এবার হঠাৎ রাজি হওয়ায় মিতা রাত জেগে বাঁধাছাঁদা শেষ করে ফেলল।

সাতসকালেই সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ির পুরনো অস্টিনে চড়ে দুজন বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্মী-লিওনও সঙ্গে গিয়ে ট্রেনের ইন্টার ক্লাসে তাদের বসিয়ে দিয়ে এল।

পরীক্ষিত মিতাকে নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে দেবদেবী দর্শন করায়। সে নিজে তখন মন্দিরে ঢোকার মুখে মিতার চটি পাহারা দেয়। আসলে ওই ফাঁকে সে মানুষের মুখ দেখে। সারি সারি মানুষ মন্দিরে ঢুকছে বা ঢোকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, আবার দর্শন সেরে দলে দলে বেরিয়ে আসছে। এ এক মানুষের চলমান মেলা। কারও মুখের সঙ্গে কারও মুখের সামান্য মিলও নেই।

সন্ধেবেলা বহু কালের পুরনো লোহার রেলিং-ঘেরা নদীর ধারে বসে নদীর জলে ওপারের মন্দিরের আলোকমালার প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে দুজনেই নিঃশব্দে যে যার স্মৃতিপুঞ্জে ডুবে আছে, হঠাৎই নদীর শীতল হাওয়ায় ভেসে-আসা কীর্তনের সুরে মিতার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠল—

না পুড়ায়ো রাধাঅঙ্গ
না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলায়ে রেখো
তমালের ডালে

পরীক্ষিতের বুকে ভূমিকম্প হল। এ তো তিকানের গলা, তার প্রিয় পদাবলী! এ পদ সরোজিনীরও বড়ই প্রিয়। তাঁর হুকুমে কত বার যে তিকান এই পদ তাঁকে শুনিয়েছে তার শেষ নেই।

'আমাদের তিকান না? দ্যাখ না খোঁজ নিয়ে। তীর্থে এমন অনেক কিছুই ঘটে। যা পাবার আর আশা নেই, তাও পাওয়া যায়।'

অনেকক্ষণ বসেও ওপারে যাবার কোনও নৌকোর দেখা নেই। নিরাশ হয়ে কাল সকালে যাবার কথা ঠিক করে উঠে পড়বার মুখে তীরের কাছ ঘেঁসে একটা বড় মাপের ছইওলা নৌকো যেতে দেখে পরীক্ষিৎ হেঁকে বলল, 'এ কি ভাড়ার নৌকো? ওপারে আমাদের পৌঁছে দেবে?'

'এ আবার কোন সুমুন্দির পো রে?'

নেশায় জড়ানো গলায় কথাটা বলতে বলতে একজন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে আবার বসে পড়ল, বাকি দু'জন শুয়েই শুয়েই বোতল থেকে চুমুক দিচ্ছে। ছইয়ের মুখে হ্যাজাকের আলোয় ঝলমলে শাড়ি গয়না পরা একটা মেয়েকে তীর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

'ওই ফুল ও নিজেই চিংড়ির জল ঝরানোর মেশিনে শুকনো করে শার্টের ভেতরের পকেটে রেখে দিয়েছিল। ওটা আমাদের ফুলশয্যার ফুল।' কথাটা শেষ করে ঢিল-খাওয়া কুকুরের মতো সে কঁকিয়ে উঠল।

হাওয়ায় তখনও ভেসে আসছে—

না পুড়ায়ো রাধাঅঙ্গ
না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলায়ে রেখো
তমালের ডালে।
কৃষ্ণ কালো তমাল কালো
তাইতে তমাল লাগে ভালো।

পরদিন সকালে নদীর ওপারে কাছাকাছি তিনটি মন্দিরে খোঁজ করেও তিকানের কোনও খবর পাওয়া গেল না।

কিছুটা দূরে অশ্বত্থগাছের ঝুরি-জর্জরিত একটা মন্দিরে গিয়ে জানা গেল, সন্ধ্যায় যে কীর্তন গেয়েছিল ভোরে সে তার বোষ্টমের সঙ্গে মন্দির ছেড়ে চলে গেছে। সাত মাস তারা ছিল এই মন্দিরে।

'তার নাম কি তিকান?'

'তাকে তো পুতুলবোষ্টমী বলেই সবাই ডাকত।'

'তার চিবুকে তিল দেখেছেন?'

'নদীতে নেয়ে উঠলে দেখা যেত। অন্য সময় চন্দনের ফোঁটায় ঢেকে রাখত। তার আসল কথাই তো আপনি জানতে চাইলেন না। প্রভুদত্ত গলা! প্রভুর কৃপা না হলে অমন কীর্তনের কণ্ঠ কেউ পায়? আপনারা কে?'

মিতা বলল, 'ওর দেশের মানুষ।'

মন্দির থেকে ফেরার পথে খেয়াঘাটের পাশে চায়ের দোকানে মুণ্ডিতমস্তক, কপালে তিলক কাটা এক তরুণের হাতের খবরের কাগজে পরীক্ষিতের চোখ আটকে গেল। দিবাকরের বিকৃত মুখের ছবি। সন্দেহবশে ভালো করে দেখতে গিয়ে পুলিশের সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি পরীক্ষিৎ পড়ে ফেলল। মিতাকেও দেখাল।

'কী সাংঘাতিক! এ তো দিবাকরের ছবি। চল, ফিরে যাই, খোকা। অমন চুপ করে আছিস কেন? তোর চোখ এত লাল হল কী করে?'

'খুব তাড়াতাড়ি বালিসোনায় ফিরতে হবে আমাদের' —যেন জ্বরের ঘোরে কথা বলছে পরীক্ষিৎ।

২৪

জঙ্গলে তিনদিন ধরে রেইড করে ফেরার পথে দিবাকরের পচা-গলা দেহ পুলিশই আবিষ্কার করেছে। সরোজিনী-হাসপাতালের মর্গে শব রেখে খবরের কাগজে আনুমানিক বয়েস ও অন্যান্য তথ্য জানিয়ে মৃতের আবক্ষ ছবি সহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনে আরেকটি তথ্যও উল্লেখ করা হয়েছে। মৃতের শার্টের ঘড়ির পকেটে শুকনো বিবর্ণ একটা রজনীগন্ধা ফুল পাওয়া গেছে।

ছবি দেখেই দিবাকরের মুখের আদল চিনতে পেরে নন্দিনীর বুকের ভেতর হাতুড়ি ঘা পড়ছিল, রজনীগন্ধার কথা পড়ে সে চিৎকার করে উঠে জ্ঞান হারাল। মাথায় অনেকক্ষণ জল দিয়ে হাওয়া করে তার জ্ঞান ফেরানোর পর সে হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে খবরের কাগজে রজনীগন্ধার জায়গাটা দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওই ফুল ও নিজেই চিংড়ির জল ঝরানোর মেশিনে শুকনো করে শার্টের ভেতরের পকেটে রেখে দিয়েছিল। ওটা আমাদের ফুলশয্যার ফুল।' কথাটা শেষ করে ঢিল-খাওয়া কুকুরের মতো সে কঁকিয়ে উঠল।

কেন ওকে ওরা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গেল, কোথায় ওকে নিয়ে গেল, বলেছিল পুলিশকে কিছু না জানালে ওকে শীগগিরই ফিরিয়ে দিয়ে যাবে, আমি তো পুলিশকে কিছু জানাইনি, কাউকে জানাতেও দিইনি, তবে কেন ওকে মেরে ফেলল— তিনমাস ধরে কয়েক ঘণ্টা পর পর এইসব কথার সঙ্গে তার

‘তোরা ওভাবে ন্যাংটা হয়ে, ব্যাটাছেলের সঙ্গে বায়োস্কোপের ছবি তুলতে দিস কেন?’
‘অনেক টাকা দেয় বাবু। হপ্তাভর চল্লিশ-পঞ্চাশটা খদ্দের থেকে যা আয় হয়, একবেলা ছবি তুলিয়ে তার চেয়ে বেশি পাই বাবু।’

আর্ত কান্না বহু দূর থেকেও লোকে শুনেছে।

ছ’মাসের শিশু মুখে কয়েকটা আঙুল পুরে শুধু ওয়া, ইয়া, হোআও ইত্যাদি শব্দ করে কী যে বলে যায় কেউ বোঝে না।

থানায় গিয়ে দিবাকরের হত্যার বিষয়ে কোনও তথ্য তো জানাই গেল না, বরং যখন-তখন চৌধুরীবাড়িতে পুলিশের আনাগোনা শুরু হল। নন্দিনীকে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

পুলিশের অভিযোগ, এতদিনেও কেন মিসিং ডায়েরি করা হয়নি? মাঝরাতে বিছানা থেকে রিভলবারের মুখে দিবাকরকে তুলে নেওয়া হয়েছে জেরায় সেকথা জেনে পুলিশের আরও অভিযোগ— কেন কিডন্যাপিং থানায় রিপোর্ট করা হল না? ডাকাতি বা খুনের চেষ্টার অভিযোগও তো করতে পারতেন। পুলিশকে কিছুই জানাননি কেন?

‘আমাকে ভয় দেখিয়েছিল, পুলিশকে জানালে তক্ষুনি ওকে মেরে ফেলবে।’

‘পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে না দিলে বিপদ কি কমে? বাঁচাতে পারলেন ওকে?’ গোয়েন্দা অফিসার নোট লিখতে লিখতে চোখ না তুলেই কথা বললেন।

নন্দিনীকে সরিয়ে এগিয়ে এসে এবার পরীক্ষিৎ বলল, ‘পুলিশ বাঁচাতে পারত? পুলিশকে জানালে পুলিশ কি ওকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারত? পুলিশের চোখের সামনে ফেরার রুদ্র ঝম্পটি দশ বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পেরেছে? পশ্চিমপাড়ার একেবারে পশ্চিমে নতুন দোতলা বাড়িতে গেলেই রুদ্র ঝম্পটিকে পাওয়া যায়, তবু পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করতে পারছে না, পুলিশের ওপর মানুষ আর আস্থা রাখতে পারে কি?’

‘আপনারও তাহলে ওপাড়ায় যাতায়াত আছে? তা তাতে দোষেরই বা কী!’

কাকতালীয় ঘটনার মতো ঠিক ওইসময়ই উত্তেজিত নীলাঞ্জনা, পরীক্ষিৎ এ ঘরে আছে জেনে, তাকে কিছু বলতে এসে সামনেই পুলিশ দেখে বলে উঠল, ‘রেডলাইট এরিয়ায় দোতলা বাড়ি এখনই রেইড করুন। বাইজী নাচের বড় হল ঘরের পিছনে ব্লু ফিল্মের স্টুডিও, এখনও সেখানে শুটিং চলছে, এক্ষুনি গেলে হাতেনাতে ধরা যাবে।’

গোয়েন্দা অফিসার কিছু বলতে যাচ্ছিল, থানার ও সি তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় নীলাঞ্জনাকে বলল, ‘নতুন নাকি? নাম? কত নম্বর চালা? ওখানে লাগল কার সঙ্গে? কবে এসেছ ওপাড়ায়?’

পরীক্ষিৎ ও সি-র চোখে চোখ রেখে বলল, ‘ইনি নীলাঞ্জনা মিত্র, সুইডিশ সরকারের স্কলারশিপে ভারতের পতিতাদের নিয়ে গবেষণা করছেন। দেহব্যবসাকে যাদের জীবিকা হিসেবে নিতে হয়েছে তাদের পেশায় আসবার আগের পারিবারিক জীবন এঁর গবেষণার বিষয়। পশ্চিমপাড়ায় এঁকে আমিই প্রথম কয়েকদিন নিয়ে গিয়েছিলাম, এখন একাই যান। আপনাকে আলাদা করে আর দোষ দেব কী! দারিদ্র ও দুর্নীতির দেশে রাষ্ট্র যেমন পুলিশকে অমানুষ বানায়, পুলিশও তেমনি সাধারণ মানুষের জীবনে ঢুকে তার শোধ তোলে।’

মূর্তিবৎ পুলিশদের মধ্যে থেকে ও সি-র গলা শোনা গেল— ‘পশ্চিমপাড়া আজই রেইড করা হবে।’

‘কখন?’ নীলাঞ্জনার প্রশ্ন।

ও সি-র উত্তর, ‘কাগজপত্র রেডি করতে, ফোর্স অ্যারেঞ্জমেন্টে যেটুকু সময় লাগে। আপনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।’

ঠিক দুঘণ্টার মাথায় পশ্চিমপাড়ার নতুন দোতলা বাড়ি চারদিক থেকে সশস্ত্র পুলিশ ঘিরে ফেলা মাত্র রিভলবার-হাতে আরও বড় একটা পুলিশের দল বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রত্যেকটা ঘর সার্চ করেও কোথাও আপত্তিকর কিছু পেল না। বড় হলঘরে আজ শুধু গানের আয়োজন চলছে। বড় টি-পটে চা, থালায় ঢালাও বিস্কুটের ব্যবস্থা, আলাদা

দারোগার ইঙ্গিতে দুজন কনস্টেবল এগিয়ে গিয়ে দুটো দরজাতেই প্রথমে জোরে ধাক্কা ও পরে লাথি মারতে দরজা খুলে পড়ে গেল। কোনও খদ্দের না, দুই বোন যে যার নিজের ঘরে আচমকা ঘুম ভেঙে সামনে পুলিশ দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে বসেছে।

রেকাবিতে সাজা পানের স্তূপ।

পিছনের স্টুডিওয় বিয়ে ও অন্নপ্রাশনের ছবি প্রসেসিং ও ডেভেলপিংয়ের কাজ চলছে। আরবের শেখ ও রুদ্র ঝম্পটিকে এখানকার কেউ চেনে না, ওদের কথা শোনেইনি কখনও।

এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা পুবমুখো এগিয়ে লজ্জাবতী-ময়নামতীর দুই দরজাই পাশাপাশি বন্ধ দেখে নীলাঞ্জনা ও সি-কে বলল, ‘এরা দুজনেই আজ দুপুরে শুটিংয়ে ছিল, লজ্জাবতীকে ভালো মতো সরকারি সাহায্যের লোভ দেখিয়ে ওর কাছ থেকেই আমি সব জেনেছি। এখানে নাকি ভদ্রঘরের মেয়েরা, কলেজের ছাত্রীরাও কেউ কেউ আসে। এই ডানদিকের ঘরটা ওর, বেরলেই ওকে চেপে ধরুন, ব্লু ফিল্মের ব্যবসা এখানে কারা চালাচ্ছে জানতে পারবেন।’

দারোগার ইঙ্গিতে দুজন কনস্টেবল এগিয়ে গিয়ে দুটো দরজাতেই প্রথমে জোরে ধাক্কা ও পরে লাথি মারতে দরজা খুলে পড়ে গেল। কোনও খদ্দের না, দুই বোন যে যার নিজের ঘরে আচমকা ঘুম ভেঙে সামনে পুলিশ দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে বসেছে।

দুজনকে টেনে এনে বাইরে দাঁড় করানো হল। নীলাঞ্জনা বলল, ‘পুলিশ তোমাদের কিছু বলবে না, আমাকে যে অসভ্য বায়োস্কোপের কথা বলেছিলে সেই অসভ্য বায়োস্কোপের ছবি তোলা আজ কখন শুরু হয়েছিল, কতক্ষণ

চলছিল এদের বলো তো লজ্জাবতী।'

'আমি লজ্জাবতী না, আমি আপনারে চিনি না।'

আরেক বোনও একইভাবে বলল, 'আমি আপনারে চিনি না।'

'অ্যারেস্ট দেম। দে উইল হ্যাভ টু কনফেস।'

দারোগার নির্দেশে দুটো মেয়েকেই মোড়ের মাথায় কালো গাড়িতে তুলে থানায় এনে লক-আপে ঢোকানো হল।

নীলাঞ্জনা 'থ্যাংক ইউ স্যার' বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ফিরে গেল।

রাত্রে লজ্জাবতী-ময়নামতীকে একসঙ্গে বসিয়ে জেরা শুরু হল।

দারোগা প্রথমে লজ্জাবতীকে জিজ্ঞেস করল, 'বায়োস্কোপের ফটো তোলে বড় না ছোট ক্যামেরায়?'

'ছোট ক্যামেরায়।'

'তোদের পাড়ার মেয়েরা সেখানে শাড়ি-সায়াটায়া খুলে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায়? তোরা দুজন আজ দাঁড়িয়েছিলি?'

যেমন শেখানো হয়েছিল সেইমতো ছোট ক্যামেরার কথাটা মিথ্যে বলেই বুক ঢিবঢিব করছে। দুজনের কারও মুখে কথা নেই। দারোগা কিছু বলবার আগেই লজ্জাবতী বলল 'একটা মিথ্যে বলে ফেলেছি বাবু, ছোট ক্যামেরা না, বড় ক্যামেরায় ছবি নিচ্ছিল।'

লজ্জাবতীর কোমরে রিভলবারের একটা ঘা দিয়ে দারোগা এবার হুংকার ছেড়ে বলল, 'ঠিক করে বল, ল্যাংটো হয়ে তোরাও দাঁড়িয়েছিলি?'

'একটা ব্যাটাছেলেও ছিল।'

'প্যান্ট পরা?'

'না, ন্যাংটা।'

'তোরা দুজনও ছিলিস তো?'

'আর একটা মেয়েও এসেছিল।'

'সেও এপাড়ার?'

'না, সে বাইরে থেকে এসেছিল, হাতে বই-খাতা ছিল। প্রথমে শাড়ি-বেলাউজ খুলতে চাইছিল না।'

'তিনটে মেয়ে ওখানে কী করছিলি?'

'লোকটা তিনজনের সঙ্গেই করছিল।'

'সে কী? কীভাবে? তিনজনের সঙ্গেই কীভাবে?'

'একজনকে মেঝেয় শুইয়ে, আরেক জনকে পিঠে শুইয়ে, আরেক জনকে সামনে বসিয়ে। ছবি তোলা হচ্ছে তো, তাই।'

'তোরা ওভাবে ন্যাংটা হয়ে, ব্যাটাছেলের সঙ্গে বায়োস্কোপের ছবি তুলতে দিস কেন?'

'অনেক টাকা দেয় বাবু। হপ্তাভর চল্লিশ-পঞ্চাশটা খদ্দের থেকে যা আয় হয়, একবেলা ছবি তুলিয়ে তার চেয়ে বেশি পাই বাবু।'

ঘর থেকে লজ্জাবতীর আগে আগে দ্রুত বেরিয়ে এল অল্পবয়সি একটা ছেলে। সারা মুখে শিশিরের মতো ঘাম। পরীক্ষিৎকে দেখে উল্টো মুখে হন হন করে হাঁটা লাগাল। দুম করে পরীক্ষিতের মনে পড়ে গেল এ তো বিরোধী দলের ছাত্র ফ্রন্টের এক নেতা, তপন না তাপস কী যেন নাম।

জবানবন্দী লিখে নিয়ে দারোগা মোটা খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আঙুলের ছাপ দে। এই নে কালির বাক্স। বাঁহাতের বুড়ো আঙুল কালিতে ভিজিয়ে ঠিক এই খানটায় ছাপ দে।'

দুজনেই পর পর বুড়ো আঙুলের ছাপ দিল।

দারোগা এতক্ষণে একটা কিং সাইজ সিগারেট ধরিয়ে গাঁজার কলকের মতো দুহাতে ধরে লম্বা লম্বা কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'ছোট ক্যামেরাই সত্যি, কেউ জিজ্ঞেস করলে ওটাই বলবি। ল্যাংটো ব্যাটাছেলে-মেয়েছেলেদের যেসব কথা বললি, ওসব ভুলে যা, ওরকম কেউ ওখানে কখনও যায়নি, ক্যামেরার সামনে তোরাও কেউই দাঁড়াসনি। যা যা আমাকে বলেছিস, সেগুলো আর মনে আনবি না, আমি যা বলে দিলাম সেটাই তোরা বলেছিস, তাতে আঙুলের ছাপ দিয়ে দিয়েছিস। কথাটা মনে রাখিস। যা, ঘরে যা। বড় ক্যামেরার সামনে যত পারিস ল্যাংটো হয়ে নেত্য কর।'

দুদিন পরে নীলাঞ্জনা পশ্চিমপাড়ায় লজ্জাবতী-ময়নামতীদের দেখে কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চাইল কে তাদের জামিনের ব্যবস্থা করল।

জামিন কী, দুজনের কেউই জানে না শুনে নীলাঞ্জনা বলল, 'কে তোমাদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনল?'

দুই বোন একসঙ্গে দারোগার শেখানো কথাটাই বলল, 'থানায় মেয়েদের আলাদা লক-আপ নেই বলে বড়বাবু আমাদের ঘরেই থাকতে বলেছে।'

কিছুটা দূরে, দোতলা থেকে যথারীতি নাচ গান বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে।

পরীক্ষিৎ একদিন দুপুর রোদে নীলাঞ্জনার খোঁজে নানা জায়গায় ঘুরে পশ্চিমপাড়ায় তার চেনা-জানা লজ্জাবতী-ময়নামতীদের কাছে গিয়ে দেখল লজ্জাবতীর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, ময়নামতী নিজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দূরে হালুইকরের দোকানের কাউকে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করছে। পরীক্ষিৎ বলল, 'কেমন আছো লজ্জাবতী?'

'আমি লজ্জাবতী না, ময়নামতী।' বলে সে হাসল।

'আমার সঙ্গে সেই যে সরকারের দিদিমণি আসতেন, তাঁকে আজ এপাড়ায় দেখেছ?'

'আজ দেখিনি। কয়েকদিন আগে এসেছিল।'

কথার মধ্যেই লজ্জাবতীর ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘর থেকে লজ্জাবতীর আগে আগে দ্রুত বেরিয়ে এল অল্পবয়সি একটা ছেলে। সারা মুখে শিশিরের মতো ঘাম। পরীক্ষিৎকে দেখে উল্টো মুখে হন হন করে হাঁটা লাগাল। দুম করে পরীক্ষিতের মনে পড়ে গেল এ তো বিরোধী দলের ছাত্র ফ্রন্টের এক নেতা, তপন না তাপস কী যেন নাম।

(ক্রমশ)

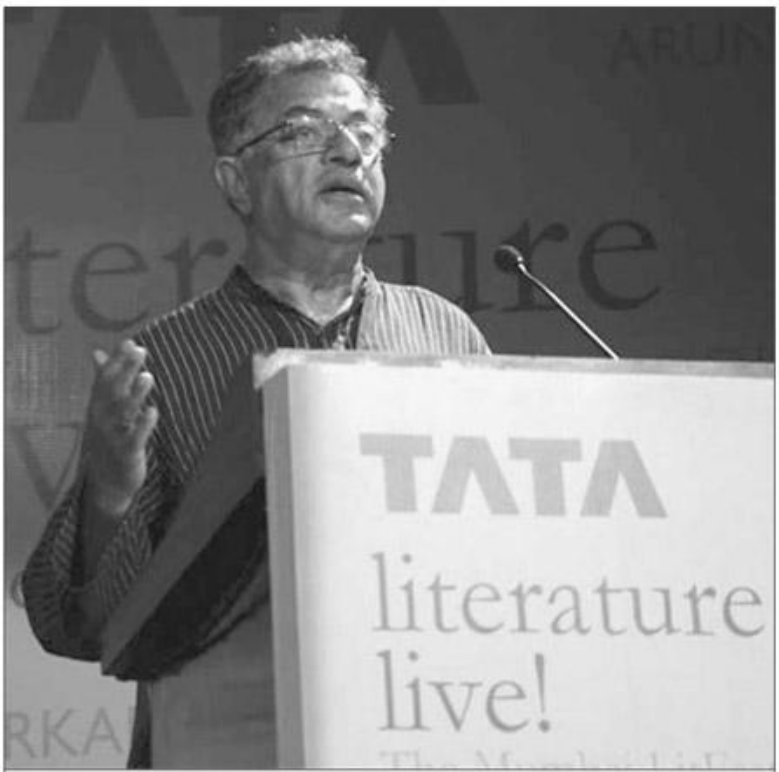

বিতর্কিত বক্তৃতার মুহূর্তে নাট্যকার গিরিশ কারনাড

নইপলকে তোপ কারনাডের

গতমাসে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত 'টাটা লিটারেচার লাইভ!' নামে এক সাহিত্য সম্মেলনে নোবেল পুরস্কার পাওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঔপন্যাসিক স্যার বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নইপলকে শানানো বাক্যে যথেচ্ছ বিঁধেছেন নাট্যকার গিরিশ কারনাড। তাতে লাভ হয়েছে এই, এমনিতে উত্তাপহীন এইসব আধুনিক লিটারারি ফেস্ট খবরের কাগজের বিনোদন বিভাগে দুয়েকটি বিভা বিলোনো ছবি ছাড়া তেমনভাবে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে পারে না, এবার তবু কিঞ্চিৎ সাহিত্যগন্ধী চর্চার মধ্যে উঠে এল। নিন্দুকে বলে, এইসব বর্ণাঢ্য সাহিত্যসভায় আমন্ত্রিত-নিমন্ত্রিত থাকেন সাধারণভাবে ইংরিজিভাষায় লেখালেখি করা ভারতীয়রা। উপরন্তু লেখালেখির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অন্য অন্য ক্ষেত্রের যশোপ্রার্থীদের আনাগোনাও বেশ থাকে আর রবাহুত হয়ে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় যারা নেবার তারাই নেন। বিতর্কের ধোঁয়া উঠলে অন্তত এটুকু জানা যায় ভারতে নানা নামে, বেসরকারি অর্থানুকূল্যে এবং প্রভূত অর্থব্যয়ে এই ধরণের কিছু সম্মেলন এখন হচ্ছে।

এটুকু বাদ দিলে, বিতর্ক নইপল বেশ ভালোই বাসেন। ভারতের সাহিত্য মহলে দুর্মুখ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি তাঁর। শুধু দুর্মুখ-ই নন, উন্নাসিকতাতেও তাঁর জুড়ি মেলা দুষ্কর। ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মকে পাসমার্কস দিতে কী যে এক ভীষণ কার্পণ্য ভর করে এ দেশের কলমজীবীদের অঙ্গুলি আর জিহ্বায় তা কহতব্য নয়। মনে পড়তে পারে, বছর আটেক আগে, উইলিয়াম ডালরিম্পলও বেশ কয়েক হাত নিয়েছিলেন নইপলকে। 'দ্য লাস্ট মুঘল', 'হোয়াইট মুঘলস' নামে পাথরের মতো ভারী গোটাকতক বই লিখে খ্যাতিমান ডালরিম্পল ইতিহাস গুলে খাওয়া লোক। ভারতের ইতিহাস বিষয়ে নইপলের তাত্ত্বিক চর্চাকে তুড়ি মেরে নস্যাৎ করে তাঁর এক দীর্ঘ লেখা সাহিত্যের জলবায়ুতে সেসময় ফিসফিস করে ঘুরেছিল বেশ কিছুদিন। কিন্তু এবার গিরিশের মোক্ষম আক্রমণ প্রায় ব্যক্তিগত স্তরে। যা ইচ্ছে তাই বলে আবার সাফাই গেয়েছেন এই বলে যে, তাঁর নাকি নম্র-ভদ্র হওয়ার কোনওই দায় নেই, কেন-না এ ক্ষেত্রে তিনি নইপলের পদাঙ্কই অনুসরণ করছেন।

উদ্যোক্তারা তাঁকে ডেকেছিলেন তাঁর নাটক নিয়ে কিছু বলতে। বদলে গিরিশ নাটকীয়ভাবে নইপলকে নিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন। শুনে শুনে এমন তিনটি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে দিলেন, যে সকলেই স্তম্ভিত। নইপলকে তিনি ক্রমান্বয়ে বললেন, মুসলিমবিরোধী, সুরকানা এবং ভারতবর্ষ নিয়ে গল্প ফাঁদার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। গিরিশের কথায়, ডিটেলের প্রতি নইপলসাহেবের কোনও দায়বদ্ধতা তো নেই-ই, সেইসঙ্গে এদেশের ইতিহাসে মুসলিমদের অবদান সম্পর্কেও তিনি কিস্যু জানেন না। গিরিশের ক্রোধে ইন্ধন জুগিয়েছিল অবশ্য এই ফেস্টিভ্যাল কমিটির একটা সিদ্ধান্ত। এক সপ্তাহ আগেই তাঁরা নইপলের হাতে তুলে দিয়ে এসেছিলেন সাহিত্য সম্মেলনের তরফে জীবনকৃতি সম্মান। রেগে কাঁই কারনাড প্রশ্ন করেছেন, ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় যে লোকটার ঝোঁক স্পষ্টতই ছিল হিন্দু চরমপন্থী শক্তির দিকে, তাঁকেই কিনা জীবনকৃতি সম্মান দিয়ে খাতির দেখানো?

এ লেখা প্রেসে দেওয়া পর্যন্ত অশীতিপর নইপলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া

যায়নি। তবে এটুকু জানা, তাঁকে নিয়ে বিতর্ক বেশ উপভোগই করেন 'স্যার ভিডিয়া'। আপাতত কিছুদিন মুখে কুলুপ এঁটে থেকে, সবকিছু থিতিয়ে যাবার পর, হঠাৎই আবার তাঁকে নতুন কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করে ভেসে উঠতে দেখা যাবে।

বিতর্ক যে-কোনও সৃষ্টির ক্ষেত্রেই যে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, সন্দেহ কী তাতে! কিন্তু কজন তা খোলা মনে নিতে পারেন! এমনকী বিশ্বখ্যাত সেই অদ্ভুত প্রতিভার বাঙালি চিত্রপরিচালককে নিয়েও অনেকের মৃদু অভিমান আছে যে তিনি নাকি নিন্দা মোটে সহ্য করতে পারতেন না। সাম্প্রতিক অতীতে বিশ্ব-সাহিত্যে বিখ্যাত মানুষদের মধ্যে কত যে এমন কাটাকুটি খেলার ইতিবৃত্ত হাজির করা যায়, তার কোনও লেখাজোকা নেই। নইপলের কথাই যখন হচ্ছিল, তখন সে কাহিনিই আরও খানিক বিস্তৃত করা যাক। নইপলের সঙ্গে 'দ্য গ্রেট রেলওয়ে বাজার' উপন্যাসের লেখক পল থোরাক্সের গভীর বন্ধুত্বে এমনই কাটাকাটি হল যে দীর্ঘ পনেরো বছর কেউ কারও মুখ দেখেননি। নইপল নাকি থোরাক্সের উপহার দেওয়া তাঁরই একটি বই ইন্টারনেটে অনলাইনে বিক্রির জন্য তুলে দিয়েছিলেন। তাতেই অভিমানী থোরাক্সের গোঁসা হয় আর গোঁসার পীড়নে তিনি আস্ত একটা স্মৃতিকথাই লিখে ফেলেন 'স্যার ভিডিয়াস শ্যাডো' নামে। দেড় দশক পরে এই দুই প্রবীণ সহচরকে প্রকাশ্যে করমর্দন করতে দেখা গেছে ফের ওয়েলশ-এর এক বইমেলায়। শুধু নইপল-থোরাক্স নন, মার্কেজ এবং মারিও ভার্গাস লোসার প্রবাদপ্রতিম বন্ধুত্বেও ছেদ পড়েছিল সামান্য কারণে, যার সঙ্গে সাহিত্যের কোনওই সম্পর্ক নেই। সেই নিঃসঙ্গতার দৈর্ঘ্য ছিল ত্রিশ বছর, যা কাটল আর এক একশ বছরের নিঃসঙ্গতার ডাকে। 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউড' উপন্যাসের চল্লিশ বছর পূর্তি সংস্করণ বেরনোর আগে মার্কেজ-ই লোসাকে অনুরোধ করেন একটি ভূমিকা লিখে দিতে। লোসা বন্ধুকে খালি হাতে ফেরাননি, লিখে দিলেন এক অবিস্মরণীয় মুখবন্ধ।

'লোলিটা' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে লেখক ভ্লাদিমির নবোকভ এবং এডমন্ড উইলসনের বিরোধও ইতিহাসের প্রসিদ্ধি পেয়েছে। লোলিটা পড়ে সমালোচক উইলসন লিখেছিলেন, নবোকভের এর চেয়েও ঢের ভালো লেখা আছে। লোলিটা নিয়ে স্পর্শকাতর নবোকভ তক্ষুনি চিঠি লিখলেন কাগজে। যদিও চিঠি লেখাটাকে একসময় প্রায় আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছিলেন উইলসন। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধি ছিল তুঙ্গস্পর্শী। নবোকভ উইলসনকে উদ্দেশ করে লিখলেন, বাপু হে, তুমি দেখছি এক নেহাতই মাঝারি মানের পাঠক, যার ইংরিজি ভোকাবুলারির শ-ছয়েক ইংরিজি শব্দ কোনওক্রমে জানা আছে। সেই নবোকভ, উইলসন যখন অসুস্থ, ১৯৭১ সাল, দেখতে গেলেন তাঁকে। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে এলেন। আমাদের এই বঙ্গের নিভৃত সাহিত্যজগতেও এরকম এক বিশিষ্ট অসুস্থ মানুষকে দেখতে গিয়ে তাঁর আশ্চর্য অনুশোচনার সাক্ষী হয়েছিলেন শিবনারায়ণ রায়। অসুস্থ মানুষটি 'শনিবারের চিঠি'র মুখরা সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। তিনি তখন শেষশয্যায়। শিবনারায়ণবাবুর হাত ধরে বলেছিলেন, শুনেছি বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে আপনার। যৌবনে শনিবারের চিঠিতে তাঁকে এবং আরও অনেককেই বিস্তর আঘাত দিয়েছি। অনেকেই আমাকে ক্ষমা করেছেন। আপনি দেখা হলে তাঁকে বলবেন, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

ভি এস নইপল : জীবনকৃতি সম্মান পাওয়ার পর

আর-একটি সাড়াজাগানো বিবাদ মিটে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে চলতি বছরের অক্টোবরেই। সলমন রুশদি এবং জন লে কারের এই মনোমালিন্য পনেরো বছরের পুরনো। দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা একসময় লিখেছিল, সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে তুখোড় ঝগড়া। ঝগড়ার সূত্রপাত ব্রিটেনের সংবাদপত্রে ছাপা হওয়া রুশদির একটি চিঠি থেকে, যেখানে তিনি লিখেছিলেন, স্যাটানিক ভার্সেস উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন যখন অন্ধকারে নিমজ্জমান, তখন নাকি অক্লেশে বিরুদ্ধবাদীদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন লে কার।

অক্টোবরেই চেলটেনহাম সাহিত্য সম্মেলনে রুশদির গলায় শোনা গেল অন্য সুর। বললেন, ওই কথাগুলো না বললেই হতো। ঝটিতি উত্তর দিয়েছেন লে কারও। 'দ্য টাইমস' সংবাদপত্রে লিখেছেন, ওই বিতর্কটার জন্য আমিও অনুশোচনা করি। বরফ কি এরপরও গলবে না? এখন দুজনেই এত সদয়, যে দরাজ হয়ে একে অপরের লেখার ঢালাও বন্দনা গাইছেন।

ধরা যাক, একদিন স্যার বিদ্যাধরও গিরিশের 'হয়বদন'কে বলছেন 'মাস্টারপিস' আর গিরিশ আমতা আমতা করছেন, 'গতকাল রাতে আর-একবার 'আ হাউস ফর মিঃ বিশ্বাস' উপন্যাসটা শেষ করলাম, বেশ লাগল!'

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

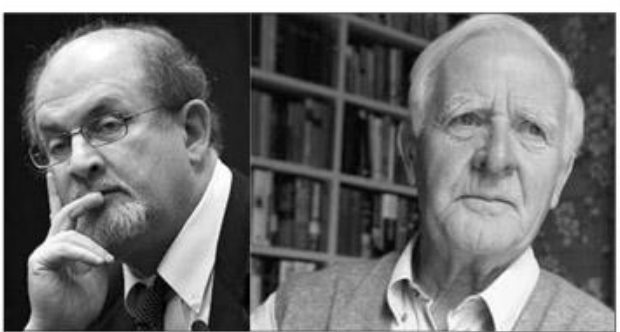
সলমন রুশদি ও জন লে কার

সুনীল-আবেগে ভাসল বাংলাদেশ

জাপানে সুনীল

'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও চলে গেলেন'—চলকে পড়া দীর্ঘশ্বাসের মতো এই শিরোনামটি লিখেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের দৈনিক '**বাংলাদেশ প্রতিদিন**'। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা '**সমকাল**' তাদের প্রথম পাতায় 'সুনীল নেই'—এই শিরোনামে লিখেছে:

> 'সন্ধ্যের আকাশ কি অকপট/বাতাসে কোনও মিথ্যে নেই/ তখন খুব আস্তে নিজেরই কানে-কানে বলি,/একটা মানুষ জন্ম পাওয়া গেল/ নেহাত অ-জটিল কাটল না!...' জীবনকে আকণ্ঠ ভালোবেসে দু'হাতে উজাড় করে গদ্য-পদ্য লিখে বাংলাভাষী মানুষের প্রিয় লেখকে পরিণত হয়েছিলেন বরেণ্য কবি ও কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাণবন্ত, সৃষ্টিমুখর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোটি অনুরাগীকে হতবিহ্বল করে নিঃশব্দে চলে গেলেন মহাসিন্ধুর ওপারে।

কেবল এরাই নন, ২৪ অক্টোবর আমাদের কলকাতায় যখন সুনীলের প্রয়াণে নবমীর সকাল বিষাদে ভারী, কিন্তু খবরের কাগজ বন্ধ থাকায় টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে হচ্ছে মুহূর্তের শিরোনাম, ঢাকার সমস্ত খবরের কাগজে প্রথম পাতার হেডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বার্তা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে সুনীলের এক আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। শৈশবে পৈতৃক ভিটেমাটি ছাড়তে হলেও পরে স্বাধীন বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার গিয়েছেন। কিন্তু তারও আগে, মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের মতো করে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। ফলে, সাহিত্যের পাঠকরা ছাড়াও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনে এই কৃতি সন্তানের জন্য সংবেদন, উষ্ণতা, ভালোবাসা রয়েছে। সুনীলের প্রয়াণের পরদিন অর্থাৎ ২৪ অক্টোবরের 'কালের কণ্ঠ' দৈনিক থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিলে হয়তো প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও শোকের আবহটা কিছুটা বোঝা যাবে।

হেমন্তের রাতে সুনীলের প্রস্থান

বাংলাদেশেও শোক: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবরে বাংলাদেশেও তাঁর ভক্তরা মুষড়ে পড়েন। শোকবার্তা দেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা থেকে শুরু করে অনেকেই। শোকবার্তায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তাঁকে চিরদিন স্মরণে রাখবে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হল।...'

মুক্তিযুদ্ধের সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেই সময় তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার সাহস জুগিয়েছিল।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় সুনীলের ভূমিকার কথা লিখেছে 'প্রথম আলো' সংবাদপত্র:

বিদায় সুনীল, বিদায়!

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে। ঘুরেছেন বিভিন্ন শরণার্থী শিবির। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন প্রবন্ধ, কবিতা ও উপন্যাস। মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গকে নিয়ে তিনি গিয়েছেন বনগাঁ শরণার্থী শিবিরে। সেসময় লিখেছিলেন '১৯৭১' নামে একটি কবিতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় লিখেছেন অর্জুন নামে একটি উপন্যাস।

সেই অর্থে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে সুনীলের প্রয়াণ আসলে একই বছরে দু-দুটি চরম শোকের ধাক্কা। প্রথমে হুমায়ূন আহমেদ, এবারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। হুমায়ূনও অসম্ভব জনপ্রিয় এবং বহুপঠিত সাহিত্যিক ছিলেন সেদেশে। '**কালের কণ্ঠ**'-এ **সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন** সে কথাই লিখেছেন:

> এভাবে একই বছরে বাংলা সাহিত্যের দুই কিংবদন্তির বিদায়, এই বেদনা আমরা কোথায় রাখি! এত বড় বড় ধাক্কা হৃদয় সামাল দেয় কী করে! (যাওয়া তো নয় যাওয়া)

এদিন বিভিন্ন কাগজে বাংলাদেশের প্রতি সুনীলের অনুভূতির কথা উঠে এসেছে বারবার ওপার বাংলায় তাঁর সতীর্থদের স্মৃতিচারণে।

'**দৈনিক ইত্তেফাক**'-এ সুনীলের দীর্ঘকালের সুহৃদ **বেলাল চৌধুরী** লিখেছেন:

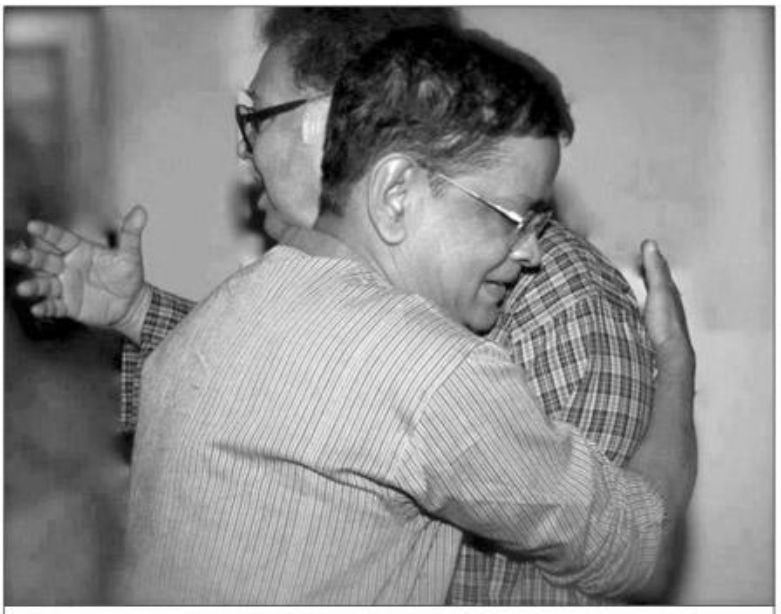

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও হুমায়ূন আহমেদ

বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর একটা দুর্বলতা ছিল সবসময়। বাংলাদেশের বাজারে তাঁর বই দেদারভাবে পাইরেসি হচ্ছে বলে কেউ যদি অনুযোগ করতেন, তিনি হাসিমুখে বলতেন—ঠিক আছে, বই যেহেতু আছে এমন কিছু তো হবেই!...তিনি বাংলাদেশ প্রেমী ছিলেন। এই প্রেমটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কলকাতায় ২১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান উদযাপনের প্রচলন তিনিই করেছিলেন। (বাংলাদেশের প্রতি দুর্বার টান ছিল সুনীলের)

এতে কোনও দ্বিমত নেই, এই ভালোবাসা অবশ্যই ছিল অন্য দিক থেকেও। সেটা শুধু সুনীলের অবিস্মরণীয় কবিতা কিংবা উপন্যাসের গুণে নয়। যেকথা স্পষ্ট করে বলেছেন **সেলিনা হোসেন, ২৪ অক্টোবরের 'দ্য ডেলি স্টার' সংবাদপত্রকে:**

এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে সুনীল জন্মেছিলেন বাংলাদেশে (ফরিদপুর)। বাংলাদেশের পাঠক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁদের হৃদয়ে জায়গা দিয়েছিলেন। প্রয়াত সাহিত্যিক সেকথা খুব ভালো করেই জানতেন।

ওই সংবাদপত্রেই হায়াৎ সইফ লিখেছেন:

বাংলাদেশের বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে মিল যেমন আছে তেমনই অনেক অমিলও আছে। সুনীল ছিলেন এ দুয়ের মাঝে একটা শক্তপোক্ত সেতু, যা এই পার্থক্যগুলিকে কমিয়ে এনেছিল। ওঁর মধ্যে

> তাঁর হাতে লাগানো নারিকেল গাছের চিরল পাতা বেয়ে ঝরে পড়ছে শোক। গাঁয়ের আকাবাঁকা মেঠোপথে শোকাহত মানুষের দীর্ঘ সারি।

কোনও সংকীর্ণতা ছিল না।

'নিউ এজ' পত্রিকায় বর্ষীয়ান সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকও প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন:

আমি ওঁর অসাম্প্রদায়িক মন, তীব্র ধী-শক্তি এবং বাস্তবোচিত আচরণের গুণগ্রাহী।

সুনীলের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেক কথাই মনে পড়ে গিয়েছে এই শোকের দিনে।

'একদিন আমি, হায়াৎ মামুদ আর জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরে গিয়েছি ভাত খাওয়ার জন্য। আমাদের মধ্যে কে যেন কথায় কথায় বলল, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কী? অম্লান বদনে হায়াৎ মামুদ বললেন, ব্লিক। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তাহলে পশ্চিমবাংলার অবস্থা কী হায়াৎ? তখন এক নতুন সাহিত্যের কথা উঠে পড়ল। একদল সাহিত্যিক পুরনো সব কিছু ভেঙে ফেলতে চাইছেন। সুনীল একালের যুবক-যুবতীদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন 'আত্মপ্রকাশ'। প্রায় আধাঘণ্টা ধরে হায়াৎ সেই উপন্যাসের গল্পটা শোনালেন। মনে পড়ছে আমি খানিকটা চমকে গিয়েছিলাম।'

—লিখেছেন হাসান আজিজুল হক, এদিনের 'কালের কণ্ঠ' দৈনিকে।

'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ প্রবীণ কবি মহাদেব সাহা লিখেছেন:

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার এত প্রিয় মানুষ যে, কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে প্রথম যাঁর নামটি মনে পড়ে, যে মুখটি চোখে ভাসে সে সুনীলদা। কলকাতায় যে কোনও অসুবিধায় প্রথম মনে পড়ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। আসলে কলকাতায় সুনীলদা ছিল নির্ভরতা ও আশ্রয়ের মতো। সেই জায়গাটি হারিয়ে গেল। এ যে কত বড় শূন্যতা—তা বুঝিয়ে বলা কঠিন।...রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে বলতে ইচ্ছে করছে, ' তোমার কাছে এ বর মাগি/মরণ হতে যেন জাগি/ গানের সুরে। যদি এই গানের সুরে সুনীলদা একবার জেগে উঠতেন! আমি আমার এই দুচোখ ভরা জল দেখাতাম। ('স্মরণার্ঘ্য)

'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় ইমদাদুল হক লিখেছেন, সুনীলকে প্রথমবার দেখার দিনটির কথা:

সুনীলদাকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৭৪ সালে। সেবছর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার লেখকরা এসেছিলেন ঢাকায়। বাংলা একাডেমীর মঞ্চে একুশে ফেব্রুয়ারির সকালবেলায় কবিতাপাঠের আসর। সভাপতিত্ব করছেন বেগম সুফিয়া কামাল। ...শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লেন 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটি। সঙ্গে আরো দু-একটি কবিতা। সুনীলদা প্রথমে কী একটা কবিতা পড়লেন। তাঁর পরনে প্রিন্টেড হাফহাতা শার্ট। একটু ভারীর দিকে শরীর। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গোলগাল মুখে আলো ঝলমল করছে। কবিতাপাঠ শেষ করে বসে পড়বেন, বেগম সুফিয়া কামাল অনুরোধ করলেন 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতাটি পড়ার জন্য। সুনীলদা আবার দাঁড়ালেন, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করলেন 'তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি'। কবিতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল করতালি। (যাওয়া তো নয় যাওয়া)

মধুর দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন কবি

বেলাল চৌধুরীও, যিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন সুনীলের, সেই 'কৃত্তিবাস' পর্যায় থেকে। **'সমকাল'**-এ তাঁর কলমে পাওয়া গেল সেই সময়েরই এক টুকরো ছবি:

> একটা সময় খুব সম্ভবত ২৫ নম্বর সংখ্যা থেকে সুনীলদা ঘোষণা দিয়ে কৃত্তিবাস বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। হঠাৎ কী খেয়াল হল—আমি ও আমার তখনকার প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী কবি নিমাই চট্টোপাধ্যায় ঠিক করলাম আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি না কেন। আমাদের আরেক বন্ধু অমল লাহিড়ী পিছন থেকে করতালি দিতেই সুনীলদা বললেন, তথাস্তু। আসলে সুনীলদা মানুষটার শব্দ ভাণ্ডারে 'না' শব্দটির ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। যে কথা সেই কাজ। আমরা লেগে গেলাম কৃত্তিবাসের জন্য লেখা আর বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাচে। কবিদের লেখা পেতে কোনো অসুবিধাই হল না। একটা প্রেসও পেয়ে গেলাম। পূর্ণেন্দু পত্রী করে দিলেন একটি মানানসই প্রচ্ছদ।
>
> সুনীলদা দিয়েছিলেন 'উত্তরাধিকার' নামে অসাধারণ সেই কবিতা, যা একমাত্র আত্মজনকেই দান করা যায় অনায়াসে। (সে যে চলে গেল, বলে গেল না...)

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের নির্বাচন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। **সেই সময় সুনীল-সাহচর্যের কথা লিখেছেন মিলন:**

> ছিয়ানব্বইয়ের ইলেকশনে বিদেশি অবজারভাররা এলেন বাংলাদেশের ইলেকশন দেখতে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও এলেন। তাঁর সঙ্গে আমাকে যুক্ত করা হল বাংলাদেশ থেকে। একজন সরকারি কর্মকর্তা আমাদের নিয়ে গেলেন বরিশাল অঞ্চলে। দু-একটি ভোটকেন্দ্র দেখার পর সুনীলদা আমাকে বললেন, অনেক হয়েছে। এবার চলো, জীবনানন্দের ধানসিরি নদীটা দেখে আসি।
>
> আশ্চর্যের ব্যাপার, ধানসিরি নদীর সন্ধান কেউ দিতেই পারে না।
>
> শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল নদীটি। খালের মতো সরু, দুপাশে গাছপালাঘেরা ছবির মতো নদী। আমরা নৌকা নিয়ে দু-তিন ঘণ্টা ধানসিরিতে ঘুরলাম। সুনীলদাকে দেখি কীরকম উদাস হয়ে আছেন। পরে কলকাতায় ফিরে গিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় তিনি লিখলেন 'ধানসিরি নদীর সন্ধানে'।
>
> কী অপূর্ব লেখা! (যাওয়া তো নয় যাওয়া)

বেশ বোঝা যায় ফেলে আসা জন্মভূমির সঙ্গেও কী গভীর প্রেমে মিশে ছিলেন সুনীল! একসময় এই পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষার ক্রমবর্ধমান কোণঠাসা দশা লক্ষ করে মহানগরের রাজপথে নামতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে, কলকাতার সমস্ত দোকানের হোর্ডিংয়ে অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলাকেও যাতে সসম্মানে স্থান দেওয়া হয়, সেই দাবিতে। এসময়ই তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ঢাকাই বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের রাজধানী। **'ডেইলি সান'** পত্রিকা তাঁর এই মন্তব্যকে অন্যতম স্মরণীয় মন্তব্য আখ্যা দিয়েছে। **'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের মনের কথাটি তুলে ধরেছেন:**

> আমাদের একজন বন্ধু চলে গেলেন। বাংলাদেশের একজন বন্ধু চলে গেলেন। বাংলা সাহিত্যের খুব বড় মাপের একজন লেখক চলে গেলেন।

সুনীল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফরিদপুরের মাইজপাড়া গ্রামে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। **'যুগান্তর'** দৈনিকের সংবাদদাতা লিখছেন সেখানকার মানুষের আবেগের কথা:

> তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত মাইজপাড়া গ্রামের প্রতিটি মানুষ। শোকে স্তব্ধ তাঁর সুনীল আকাশ (সুনীল সাহিত্যচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র)। তাঁর হাতে লাগানো নারিকেল গাছের চিরল পাতা বেয়ে ঝরে পড়ছে শোক। গাঁয়ের আঁকাবাঁকা মেঠোপথে শোকাহত মানুষের দীর্ঘ সারি। এ সময় কথা হয় কবির বাল্যবন্ধু আবদুর রাজ্জাক কাজীর সঙ্গে। তিনি জানান, ১০-১২ বছর বয়সে কবি অভিমান নিয়ে চলে যান ভারতে। এসেছেন অনেক পর। চারিদিকে তখন সুনীলের খ্যাতি। তবু তিনি ভোলেননি তার মাটি। (কাঁদছে সুনীলের গ্রাম মাইজপাড়া)

'দৈনিক ইত্তেফাক' লিখেছে:

> মাইজপাড়ার বাসিন্দা সুমন হাওলাদার জানান,...আমরা চাই তার স্মৃতির উদ্দেশে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাথুরিয়া পাড় থেকে মাইজপাড়া পর্যন্ত সড়কটি তাঁর নামে করা হোক। (সুনীলের জন্মস্থান মাইজপাড়া গ্রামে শোকের ছায়া)

বিজয়া দশমীর রাতে পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট সীমান্তের ইছামতী নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে দুই পার থেকে এসে জড়ো হন দুই প্রতিবেশী দেশের মানুষ। সেদিনটা সীমান্তের বাধা থাকে না। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতির বিদায়তিথিও যেন সেভাবেই মিলিয়ে দিয়ে গেল শোকে মুহ্যমান দুই বাংলাকে।

বইমেলায়

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উপন্যাস

বিষাদগাথা

লেখকের অন্যান্য বই

নিমফুলের মধু
১৮টি গল্পের সংকলন। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৬০

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
৩৯টি নতুন কবিতার সংকলন। ₹৫০

সম্পাদিত বই

কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি-সমালোচক। ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কিশোর-উপন্যাস

বরফের বাগান

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
পাতায় পাতায় যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি ₹১২০

লেখকের অন্যান্য ছোটদের বই

হীরু ডাকাত ৯ম মুদ্রণ। ₹৪৫
শাদা ঘোড়া
পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত। ৫ম মুদ্রণ। ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০
ঋষিকুমার ₹২০
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
নানা ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। ২য় সংস্করণ। ₹৭৫
পাখির খাতা ৫ম মুদ্রণ। ₹৪০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ₹১৫
তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫
আমার বনবাস ₹১২

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণকথা

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগঅন করুন

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane
Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-Mail: info@swarnakshar.in

সাময়িকপত্রে সেকালের লেখা

বারিদবরণ ঘোষ

আনন্দময়ীর আগমনে

ধূমকেতু

হপ্তায় দু'বার ক'রে দেখা দেবে

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা] সারথি—কাজী নজরুল ইসলাম [নগদ মূল্য ১০ পয়সা

১ম বর্ষ } মঙ্গলবার, ৯ই আশ্বিন ১৩২৯ সাল ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২ { ১২শ সংখ্যা

পর্ব: ৭

ধূমকেতু

বন্ধু মুজফফর আহমদের কাছে তাঁর এক পূর্বপরিচিত মানুষ, নাম মসউদ আহমদ— একটি প্রস্তাব সবিনয়ে রাখলেন। বললেন মুজফফর— তুমি একটা সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা বের করোতো, আমি তোমাকে কিছু টাকাপয়সা দেব। টাকার পরিমাণ কত জানতে চাইলেন তিনি। পরিমাণ শুনে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! বলে কী পাগলটা? আড়াইশো টাকায় একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে বের করতে হবে। ঘাড়টি এদিক-ওদিক দুলিয়ে তিনি একেবারে পত্রপাঠ বিদায় করে দিলেন তাঁকে।

এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না মসউদ সাহেব। তিনি সোজা গিয়ে মুজফফরের বন্ধু কাজি নজরুল ইসলামের কাছে একই দরবার জানালেন। নজরুল তখন 'সেবক' পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন— তবে তাতে একেবারেই খুশি ছিলেন না। তাই আড়াইশো টাকাই সই— তিনি ঘাড় পেতে দিলেন। আর তাতেই বাংলা ভাষার সাড়া জাগানো অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র জন্ম হয়ে গেল ১১ আগস্ট ১৯২২ (২৬ শ্রাবণ ১৩২৯) শুক্রবারে। পত্রিকার পরিচয়ে লেখা হল 'সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম।' পরপর সাত সংখ্যায় তা-ই ছাপা হল। অষ্টম সংখ্যা থেকে বদলে গেল পরিচয়— 'সারথী কাজী নজরুল ইসলাম'। অর্থাৎ মসউদ সাহেব আর রইলেন না, কাগজের সবটাই কাজি সাহেবের। ধূমকেতুর তিনিই চালক, পরিচালক সবই, তিনি সারথি। ঠিকানা ৩২ কলেজ স্ট্রীট— বউ বাজারের মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি।

নজরুল-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কখনও চিড় ধরেনি এমন নয়, কিন্তু বরাবরই কবি তাঁকে স্নেহ করেছেন— এটাই সর্বৈব সত্য। তারই দাবিতে হাবিলদার কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাণী আদায় করে নিয়ে এসেছেন— প্রথম সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত কপালটুকিতে এই আশীর্বাণী ঝুলিয়ে ধূমকেতু আলোকদ্যুতি বিচ্ছুরিত করেছে।

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেবে চমক মেরে,

আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

শুধু কি রবীন্দ্রনাথ? শরৎচন্দ্র আবেদন রাখলেন 'শত্রুমিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা' বলার। নবম সংখ্যায় (ভাদ্র ২৯, ১৩২৯) ছাপা হল দেওঘরের জগৎগুরু সত্যানন্দ-এর চিঠি— 'ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি। এমন সময় ধূমকেতু এসে উদয়। পড়ে আত্মহারা হয়ে গেলাম। খিদে তেষ্টা নাশ হয়ে গেল। আজ তোমার কাগজ যে পড়েছে তারই তাক লেগে গেছে।' পরের সংখ্যায় আশীর্বাণী কুমুদরঞ্জন মল্লিকের (একসময় তো তাঁরই ছাত্র ছিলেন নজরুল)। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী অভয়চৈতন্য জানালেন— 'পত্রটি সুন্দর হইয়াছে। ... আপনার কাগজ ... দশের উপকারে লাগিবে।

খ্যাত-অখ্যাত লেখকে কাগজ ভরে যেতে লাগল আর তাতেই অচিরকাল মধ্যে 'ধূমকেতু' জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকার পক্ষ থেকে অনেকেই একে স্বাগত জানালেন। 'বাসন্তী' লিখলেন— 'ধূমকেতু জাতির ও দেশের বাধাবিঘ্ন জড়তা ধ্বংস করিয়া দেশে নূতন প্রাণের উৎস আনয়ন করুক আমরা এই প্রার্থনা করি।

'পরিদর্শক' লিখলেন— 'ধূমকেতু'র পুচ্ছাঘাতে অনেকেরই চমক ভাঙ্গিবে, নেশা অনেকেরই ছুটিবে।'

কিন্তু বিরোধীদের কারও কারও ভাষা এতখানিই জঙ্গি ছিল যে উদ্ধার না করে পারা যায় না। 'ইসলাম দর্শন'-এর হুঁশিয়ারি— 'দুষ্টাত্মা শয়তানকে কেমন করিয়া বিতাড়িত ও দূরীভূত করিতে হয়, তাহা মুসলমানেরা ভালো মতোই অবগত আছেন।' এখানেই মুনশি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ প্রশ্নবোধক প্রবন্ধ 'লোকটা মুসলমান না শয়তান?'-এ লিখলেন— 'ধূমকেতু প্রত্যেক সংখ্যায় সচিত্র ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে গরল উদগীরণ করিতেছে। একটা ধর্মজ্ঞানশূন্য বুনো বর্বরের নিকট— অকাট মূর্খ পাষণ্ডের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে? এইরূপ বর্ণদ্রোহী কুবিশ্বাসীকে মুসলমান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ... খাঁটি আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়।'

'মুণ্ডপাত' করার ব্যবস্থাই তো নজরুল করেছেন নানা 'বিভাগ' খুলে। 'দেশের খবর', 'মুসলিম জাহান', 'পরদেশী পঞ্জী'-তে রাজনীতির চূড়ান্ত। আক্রমণের ভাষা যেমন জঙ্গি তেমনই অননুকরণীয়। কামাল পাশার বিজয়ের পর মিত্রশক্তি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ষড়যন্ত্র করছে বুঝতে পেরে লেখা হল— 'কিন্তু দাদা বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?'

এবার তুর্কির ভোঁতা তলোয়ার শানানো হয়েছে, অতএব একটু ধীরে।' অথবা 'পরদেশপঞ্জী'তে— 'মার্কিন-গান্ধী পুন্যাহ/ ... গত ১৮ জুলাই তারিখে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বন্ধু ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা চতুর্থ গান্ধী-পুণ্যাহ পালন করেছিলেন। 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে?' অথবা 'ঘট ভাঙলো/ লণ্ডনের কম্পোজিটার ধর্মঘটটা এতদিনে মিটল। এ ঘট চিপ্পটাং হতেও যতক্ষণ উৎপটাং হতেও কতক্ষণ।'

'খাট্টামিঠা টিপ্পনি' কাটতে ধূমকেতুর সারথির তুলনা নেই। এবং তাঁর পিছনে লাগতে ইংরেজ সরকারের ভূমিকারও তুলনা নেই। কাগজটিকে তারা জন্মলগ্ন থেকেই 'উগ্রপন্থী' কাগজ বলে চিহ্নিত করে রেখেছিল। তক্কেতক্কে থাকে কখন মওকা আসে, সম্পাদককে গিরেফতার করা চলে। প্রতি সংখ্যার বাংলা লেখার ইংরিজি তরজমা করিয়ে উর্ধ্বতন গোয়েন্দাদের কাছে পেশ করে নজরদারি পুলিশ। বিশেষ করে 'এগারো বছরের বালিকা' লীলা মিত্রের গাত্রদাহী রচনাগুলি— বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ বাজেয়াপ্ত করার জন্য তারা মুখিয়ে। সরকার মন্তব্য করে— 'The policy of the paper as it is evident from the articles written is one of destroying all existing state of things and to embrace chaos and disorder.' বলশেভিক সম্পর্কিত প্রথম লেখা এখানেই লিখলেন বর্ধমানের 'আর্য্য' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক বলাই দেবশর্মা। নজরুল লিখলেন সম্পাদকীয় 'রুদ্রমঙ্গল'-এ 'জাগো জনশক্তি! মার মার করে ডেকে ওঠ হে আমার অবহেলিত পদ-পিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা। তোমাদের হাতের ওই লাঙল আজ বলরাম স্কন্ধে, হলের মতো ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক, উলটে ফেলুক। আনো তোমাদের হাতুড়ি ভাঙো ওই উৎপীড়নের প্রাসাদ— ধূলায় লুটাও অর্থ পিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমাদের বুকের রক্তমাখা লালে লাল ঝান্ডা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমাদের পায়ের তলায় আন।'

কাজি নজরুল ইসলাম

ইংরেজ সরকারের ভূমিকারও তুলনা নেই। তক্কেতক্কে থাকে কখন মওকা আসে, সম্পাদককে গিরেফতার করা চলে। প্রতি সংখ্যার বাংলা লেখার ইংরিজি তরজমা করিয়ে ঊর্ধ্বতন, গোয়েন্দাদের কাছে পেশ করে নজরদারি পুলিশ।

তবে কেন গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা হবে না— 'Kazi Nazrul Islam has committed offences under section 124A of I.P.C. in respect of publications of the three articles- (1) Rudramangal (ii) Ulkapat (iii) Bajrabishan

'অতএব একটা সময়ে 'The Dhumketu Office searched and Printer Arrested.' নজরুলকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁর 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হল।

মনে হতে পারে, তবে কি ধূমকেতু একটা রাজনৈতিক পত্রিকা ছিল? রবীন্দ্রনাথ,

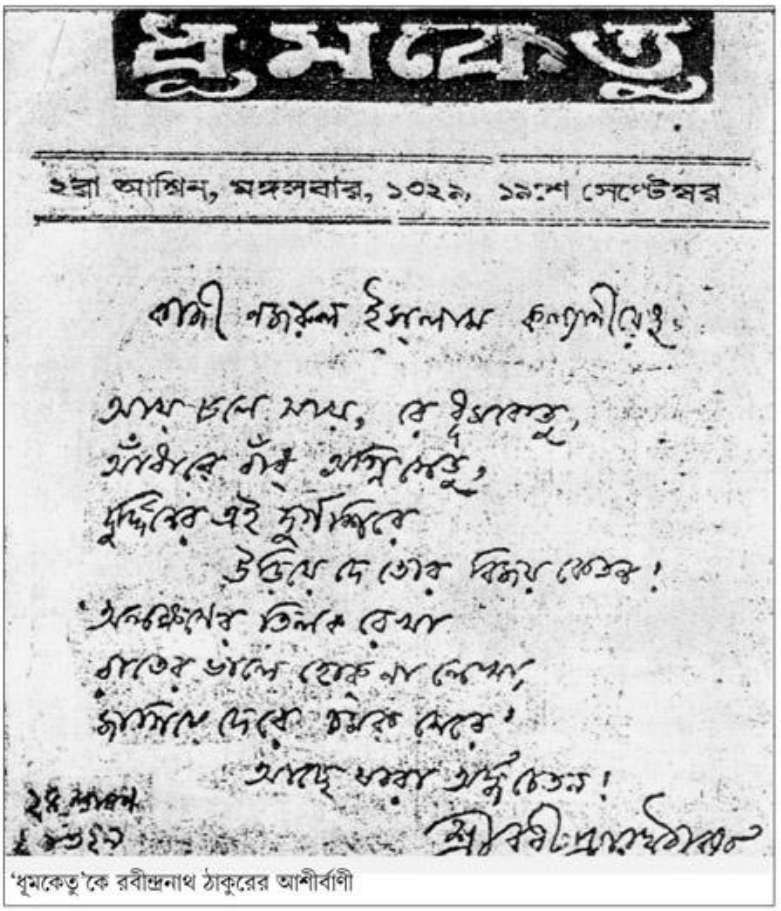

'ধূমকেতু'কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাণী

'সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।' তাই 'ধূমকেতু'তে তিনি ক্ষুদিরামের ছবি ছাপিয়ে দিয়ে এর রাজনৈতিক চরিত্রটি সম্বন্ধে সবাইকে নিঃসন্দেহ করে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ থেকে সরোজিনী নাইডুরা আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন— এটাও একটা সংবাদমাত্র হতে পারে। কিন্তু মাত্র মোট বত্রিশটি সংখ্যা ছেপে একটা পত্রিকা কালজয়ী হয়ে উঠতে পারে কি শুধু আশীর্বাণী আর রাজনৈতিক উত্তেজনা-আবেগে ফুটে উঠে? একটা দেওয়ার মতো খবর— এই বত্রিশটি সংখ্যার মধ্যে পাঁচটি ছিল বিশেষ সংখ্যা। এগুলি হল— মোহররম সংখ্যা (৭ম সংখ্যা ২ সেপ্টেম্বর ১৯২২), আগমনী সংখ্যা (দ্বাদশ সংখ্যা ২৬ সেপ্টেম্বর), দেওয়ালী সংখ্যা (পঞ্চদশ সংখ্যা, ২০ অক্টোবর), কংগ্রেস সংখ্যা (ত্রিংশ সংখ্যা) এবং শেষ ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩-এ প্রকাশিত ৩২ সংখ্যা— 'নজরুল সংখ্যা'। প্রথমটি প্রকাশিত হয় নজরুল যখন 'সম্পাদক', বাকিগুলি 'সারথি' নজরুলের।

খুব মজা লাগছে একথা ভেবে যে এই প্রথম একটি পত্রিকা পেলাম যেখানে সম্পাদকের জীবিতকালেই তাঁর নামেই একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলেন স্বয়ং সম্পাদক। এটি কি তাঁর সেই পণ যেখানে উচ্চারণ করেছেন— 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ?' তা তো নয়। এখনই বোধকরি বত্রিশটি সংখ্যাই নতুন করে ছেপে একালের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। 'ধূমকেতু' আবার আকাশ আলোকিত করুক। এই বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য এই প্রস্তাব নয়, এখানে মুদ্রিত লেখাগুলি এবং লেখনির সম্ভারের কারণেও।

'ধূমকেতু'তে কে-না লিখেছেন গদ্যে এবং পদ্যে। 'আশীর্বাণী'র বাইরে রবীন্দ্রনাথ আর কবিতা লেখেননি বটে, তবে তাঁর 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় সেটি অষ্টম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। আর যাঁরা লিখেছিলেন তাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র, মুজফফর আহমদ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজা মুখোপাধ্যায় (তখনও 'আনন্দ'-যুক্ত হননি), মিসেস আর এস হোসেন, হুমায়ুন জহীরুদ্দিন আমির-ই কবীর, শৈলবালা ঘোষ জায়া, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখের গদ্য রচনা এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়িরা কবিতায় গণনীয় ছিলেন। ছাপা তো হয়েছিল মোট ৩২টি সংখ্যা— লেখক তালিকা খুব একটা দশাসই হবে কী করে?

বলাই দেবশর্মার বলশেভিজিমের ওপর প্রবন্ধ লেখার কথা আগেই বলেছি। এখানে তিনি প্রায় রবীন্দ্রনাথের মতোই একটি ঋষিবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন— 'যিনি ভাঙতে আসছেন কেবল গড়বার জন্য।' ১৯২২-এর আগে এমন করে কথা বলতে আর কাউকে শুনিনি। নাম-তালিকায় হুমায়ুন জহিরুদ্দিন আমির-ই কবীর-এর নাম উল্লেখ করেছি। একে অচেনা মনে হতে পারে— কিন্তু তিনি আমাদের খুবই পরিচিত— তিনিই হুমায়ূন কবির। ধূমকেতুর পঞ্চম সংখ্যায় নজরুলের বাল্যবন্ধু শৈলজা মুখোপাধ্যায় 'জাগরণী' নামে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন— চোখ তুলে দেখ একটিবার তোমার ঘরে কে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসছে। সোনার ভারত চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল... অমৃতের সন্তান তুমি, এসো, অযুত নবীন কণ্ঠের প্রলয়োল্লাস তোমায় ডাকছে— মরণ বরণ করে এগিয়ে চল তোমার চিরন্তন সত্যের পানে।' গল্প-উপন্যাসের পাঠক ধূমকেতুতে কিছু পাবেন না।

আসলে একা নজরুলই 'ধূমকেতু'র মূল অগ্নিপুঞ্জ। 'আনন্দময়ীর আগমনে' (দ্বাদশ সংখ্যা, ৯ আশ্বিন ১৩২৯)— এই একটা কবিতাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল ধূমকেতুকে উজ্জ্বলতর করে। কারণ 'সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।' তাই 'ধূমকেতু'তে তিনি ক্ষুদিরামের ছবি ছাপিয়ে দিয়ে এর রাজনৈতিক চরিত্রটি সম্বন্ধে সবাইকে নিঃসন্দেহ করে দিয়েছিলেন। লীলা মিত্র— এগারো বছরের বালিকাটি আড়ালে নজরুলের মতোই আহ্বান করেন:

স্ব নি র্বা চি ত গ ল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নসিরাম

রামতারণ লোকটা অভদ্র বটে, কিন্তু ত্যাঁদড় নয়, বুঝলি সতু?

সতুর কথা বলার মতো অবস্থা নয়। চকবেড়ের হাটে নফরের তামাকপাতার দোকানের পিছন দিকটার নিরিবিলিতে রোদের দিকে হাঁ করে চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে বড় বড় শ্বাস টানছে। একবার শুধু মাথাটা নেড়ে জানাল, কথাটা ন্যায্য।

মরা কুলগাছটায় থিক থিক করছে শুঁয়োপোকা। কাঁচা নর্দমায় পাঁক পচে ফেঁপে উঠেছে। দুপুরের রোদে ঘাঁটা-পড়া নর্দমার কটু একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে কখন থেকে। আর কিছু দেখার নেই, লক্ষ্মীছাড়া জায়গায়। দুদিকে দুসারি দোকানের পিছন। লোকজনের যাতায়াত নেই, শুধু দোকানিরা মাঝে মাঝে পেচ্ছাপ করতে আসে। মতি সিং-এর শিকলে বাঁধা সাইকেলটার একটা চাকা দেখা যাচ্ছে বেড়ার আড়াল থেকে। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছন দিকটায় মস্ত একটা মানকচুর গাছ। লালু মিত্রর টেলারিংয়ের চালে একটা নধর বেড়াল বসে আছে কখন থেকে, নড়ছেও না চড়ছেও না। গদার চায়ের দোকানের পিছন দিকটায় কানা লক্ষ্মীকান্ত এক নাগাড়ে কয়লা ভেঙে যাচ্ছে। এসব আলগা চোখে লক্ষ করতে করতে বাঁ গালে একবার হাত বোলায় নসিরাম। গালে রুক্ষু দাড়ি খড়খড় করছে। আর দাড়ির নীচে এখনও চিনচিনে ব্যথা। রামতারণের থাবড়াটা তার চোয়াল যে খসিয়ে দেয়নি এই যথেষ্ট।

বুঝলি সতু! নসিরাম গালে হাতখানা চেপে রেখেই বলে, রামতারণ থানাপুলিশও করতে পারত। একেবারে জলের মতো কেস।

রামতারণের থাবড়াগুলো খুব অল্পের ওপর দিয়ে যায়নি। সতু এমনিতেও কিছু রোগাভোগা লোক। কদিন আগেও ন্যাবা হয়ে চোখ মুখ সব হলুদচোবা হয়ে গিয়েছিল। শেষে বৈরাগী মণ্ডল কাঠির মালা করে দেয়। সে ভারি মজার ব্যাপার। একশো আটখানা কড়প্রমাণ কাঠি সুতোয় বেঁধে চুড়ির মাপের ছোট্ট একখানা মালা ব্রহ্মতালুতে রেখে বলল, হাত দিয়ে চেপে থাকো। সতু তাই থেকেছিল। দেখ না দেখ সেই মালা আপনা থেকেই বড় হতে হতে মাথা গলিয়ে গলায় চলে এল। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সেই মালা বেঢপ বেড়ে নাইকুণ্ডুলি ছুঁই ছুঁই। সকালে বাসিমুখে চুনের জলে সতুর হাত ধুয়ে দিয়েছিল মণ্ডল। একেবারে হলুদগোলা হয়ে গেল ফটফটে সাদা জলটা। দুপুরের দিকে মালা বেড়ে যখন শরীর গলিয়ে যাওয়ার মতো হল তখন মালা ছাড়ল সতু, দাঁত মাজল, খেল। ন্যাবা সেই বিদেয় হল বটে, কিন্তু শরীরটা এখনও জুতের নেই। রামতারণ ভালো খায় দায়। হোঁৎকাটার একেকটা হাতের ওজনই গোটা সতুর সমান। তার ওপর থাবড়া মারার সময় রামতারণ আবার বাঁহাতে সতুর চুলটাও ধরেছিল মুঠো করে। লেগেছে খুব। সতু এখনও দম ফিরে পায়নি, মাথা ঝিমঝিম করছে। তবু নসিরামের কথাটার একটা জবাব দিল সে। বলল, পুলিশ আর এর বেশি কীই বা করত! যা ঝেড়েছে! ওফ!

একথায় নসিরাম একটু লজ্জা পায়। রামতারণ দুজনকেই ঝেড়েছে বটে, কিন্তু তার তেমন লাগেনি। চোয়ালের ব্যথাটা দিনদুই থাকবে হয়তো। তবে তেমন কিছু নয়। চোয়ালের হাড় সরে যায়নি, দাঁত ভাঙেনি। গালের মাংসে দাঁত বসে যাওয়ায় ক'ফোটা রক্ত পড়েছিল শুধু। সে কথা বলল না, রোঁয়াহীন একটা শালিকের বাচ্চা কোথা থেকে পড়েছে নর্দমার ধারে। কয়েকটা কাক সেটাকে ঠুকরে ঠুকরে শেষ করল এইমাত্র। মা-শালিকটা ধারেকাছে নেই, থাকলে কাককে মজা দেখাত। নসিরাম বুঝতে পারছে রামতারণের পক্ষ নিয়ে কথা বলা তার উচিত নয়। বললে হয়তো সতু ভাববে, মার খেয়ে নসিরামের মাথাটাই গুলিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক ঠিক বিচার করলে রামতারণকে কি দোষ দেওয়া যায়? গাজিপুর থেকে তারা রামতারণের পিছু নিয়েছিল। নেওয়ারই কথা। রামতারণ আদায় উশুল করে ফিরছে। গাজিপুরের গোটা বাজারটাই ওর কিনা। মেলা টাকা। একজন পাইকও সঙ্গে ছিল।

লহরার ইসমাইল। তার কোমরে চাকু, হাতে লাঠি।

সতু আর নসিরাম সব খবরই নিয়েছিল। বনবিবিতলায় ইসমাইলকে ছেড়ে দেবে রামতারণ। কারণ ওখানেই ইসমাইলের দু'নম্বর বিবি ওলন থাকে, ওলন ভারি আহ্লাদী মেয়েমানুষ। বুকে দয়ামায়া আছে, ধর্মভয় আছে। বড় একটা এদিক-সেদিক করে না। তবে ইসমাইল রামতারণের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার তক্কে আছে। ওলনবিবি দেখতে খারাপ নয়। বালবাচ্চা নেই, শরীরটাও তাই ভাঙেনি।

ইসমাইলকে ছেড়ে রামতারণ বনবিবিতলার বড় মাঠে পড়ল। পথও তার বেশি ছিল না! মাইলটাক গেলেই পীরগঞ্জের পাকা সড়ক। ফটফট করছে দুপুরের রোদ। ছাতা মাথায় রামতারণ দুলকি চালে হাঁটছিল। আচমকাই সতু আর নসিরাম চড়াও হল তার ওপর। সতুর হাতে ভোজালি, নসিরামের হাতে দেড়ফুট লম্বা গুপ্তি ছোরা।

রামতারণ ভয় খেয়েছিল কিনা বলা শক্ত। তবে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল ঠিকই। সতু ভোজালিটা আপসাতে আপসাতে বিকট গলায় বলল, জয়কালী, করালবদনী! একদম চেঁচামেচি করবে না বলে দিচ্ছি। লাশ ফেলে দিব। এইখানেই লাশ পড়ে থাকবে, কুকুর শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে। মালটা দিয়ে দাও ভালোয় ভালোয়। পাশ থেকে গুপ্তির চোখা ডগাটা রামতারণের ভুঁড়িতে ঠেকিয়ে রেখেছিল নসিরাম। তেমন বেগতিক দেখলে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা । তবে সেটা কথাই। সতুও কোনওদিন কারও লাশ ফেলেনি, নসিরাম গুপ্তি উঁচিয়ে দেখায়নি। তেমন জোরালো কলজে তাদের নেই। কিন্তু রামতারণের তো ভয় খাওয়ার কথা, দু-দুটো ঝকঝকে অস্ত্র চোখের সামনে দেখেও শালা ঘাবড়াল না। অ্যাঁ! নসিরাম ঘটনাটা আবার ছবির মতো দেখছিল চোখের সামনে।

সতু চোখ পিটপিট করে দেখছিল নসিরামকে। হঠাৎ অন্তর্যামীর মতো বলে উঠল, 'শালা ভয় খেলে না কেন বলো তো!'

নসিরাম বিরক্ত হয়ে বলল, 'কাজের সময় বেশি কথা কইতে নেই। যারা বেশি কথা কয় তাদের কেউ ভয় খায় না।'

সতু ফিসফিস করে বলল, 'মালটা ছাড়ছিল না যে!'

'ওর বাপ ছাড়ত। দুটো খোঁচা খেলেই বাপ বাপ বলে ছাড়ত। ভোজালিটা তোমার হাতে ছিল কী জন্যে!'

সতু মিইয়ে গেল। ফের হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল, চোখ বুজে দোষটা সতুর ঘাড়ে চাপাল বটে নসিরাম, কিন্তু পুরো দোষটা ওরও নয়। বোধহয় ওর চেহারাটারই দোষ। ল্যাঙপ্যাঙে

ল্যাঙপ্যাঙে একটা লোক যদি ভোজালি নিয়ে কেরদানি দেখায় তবে কার না ইচ্ছে করে তাকে একটা থাবড়া বসাতে? তার ওপর সতু হঠাৎ রামতারণের কুচ্ছো গাইতে শুরু করল, তেঘরেতে তোমার বাপের একজন রাখা মেয়েমানুষ আছে। সব ফাঁস করে দেব।

একটা লোক যদি ভোজালি নিয়ে কেরদানি দেখায় তবে কার না ইচ্ছে করে তাকে একটা থাবড়া বসাতে? তার ওপর সতু হঠাৎ রামতারণের কুচ্ছো গাইতে শুরু করল, তেঘরেতে তোমার বাপের একজন রাখা মেয়েমানুষ আছে। সব ফাঁস করে দেব। ইসমাইল মিত্তিরের দু-নম্বর বিবি ওলনের সঙ্গে তোমার আশনাইয়ের কথাও জানি। হপ্তায় দুদিন ওলনের ঘরে তুমি যাও। ট্যা-ফোঁ করেছো কী এসব কথা ঢোল সহবৎ হয়ে যাবে। বুঝেছো?

রামতারণ আচমকাই থাবড়াটা কশাল। আর কী থাবড়া বাপ। সতুর মুণ্ডুটা তখনই ধর ছেড়ে গিয়ে আলের ধারে পড়ার কথা। শব্দটাও হল বোমার মতো। সেই শব্দে কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল নসিরাম। হাতের গুপ্তিটার কথা তখন বেবাক ভুল। সেই অবশ অবস্থাতে রামতারণ হঠাৎ ঘুরে তাকেও একটা ওরকম থাবড়া কশাল। মাঠের মধ্যে দিনের আলোয় অন্ধকার দেখতে দেখতে মাটিতে বসে পড়ল নসিরাম। আর রামতারণ তখন একহাতে সতুর চুল ধরে তুলে পটাপট কয়েকটা থাবড়া দিয়ে গেল নাগাড়ে। সতু চেঁচাচ্ছিল, আর মেরো না। ন্যাবা থেকে উঠেছি, শরীর জুতের নয় হে, মরে যাব।

হোঁৎকা এক কথায় থামল। তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, তোরা কারা?

সতু মাটিতে পড়ে চষা খেতের এক চাঙর মাটি আঁকড়ে ধরে দম নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কথা বলার অবস্থা নয়। লুঙ্গি খসে গিয়ে দিগম্বর অবস্থা তার। নসিরাম টলতে টলতে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা হচ্ছি— বলে একটু ভাবতে হল। নাম দুটো স্মরণ হচ্ছিল না ঠিক।

রামতারণ ধমক দিল, কারা তোরা?

আমি নসিরাম।

আর ও?

ও তো সতু!

কোন গাঁ?

আমি লোহারগঞ্জ, আর ও কালীতলা।

ঠিকঠাক বলছিস?

বানানোর মতো কথা মাথাতেই আসছে না। ঠিকঠাক না বলে উপায় কী? নসিরাম জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

রামতারণের বোধহয় তাড়া ছিল, দুজনের জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে ভেবে চোখ পাকিয়ে বলল, এই দণ্ডে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাবি। ফের দেখতে পেলে পুঁতে ফেলব। যাঃ যাঃ...

গরু তাড়ানোর মতো তাড়া খেয়ে তারা দুজনে সেই দণ্ডেই মাইলটাক পথ হেঁটে চকবেড়ের খাল পেরিয়ে হাটে এসে সেঁদিয়েছে। ভয়ের চোটে এতক্ষণ গা গতরের ব্যথা তেমন টের পায়নি। এখন পাচ্ছে। তবে গায়ের ব্যথাটা বড় কথা নয়। রামতারণ ইচ্ছে করলে পীরগঞ্জের থানায় তাদের জমা করতে পারত। আরও বিপদের কথা, ইসমাইলকে লাগাতে পারত পিছনে, ইসমাইলের জমার ঘরে অন্তত পঁচিশটা খুন লেখা আছে। আরও দুটো বাড়লে ক্ষতি ছিল না।

নফর চেনা লোক। কিন্তু তাদের দেখে খুশি হয়নি মোটেই । দুজনের চেহারা দেখেই বিরস মুখে বলল, কোত্থেকে চোরের ঠেঙানি খেয়ে এসেছো! ভালোয় ভালোয় সরে পড়। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।

তা চোরের ঠ্যাঙানিও তারা খেয়েছে বৈকি। নফরের দোষ নেই। এই তো মোটে সেদিন শীতলাদলের বাজারে রামহরির দোকানে মাঝরাতে ঢুকেছিল দুজন। সতু আগে পিছনে নসিরাম। ঢুকেই সতুটা হেঁচে ফেলল। রামহরির ছেলে দোকানে শোয়। তার হাতের কাছেই টর্চ অর লাঠি। 'কে রে?' বলে লাফিয়ে উঠতেই ভাঙা জানলা গলে পালাল দুজন। কিন্তু বাজার বলে কথা। চোখের পলকে চৌকিদার দোকানি আর ব্যাপারি মিলে বিশ-পঁচিশ জন জুটে তাড়া করে খালধারে প্রায় ধরে ফেলল দুজনকে, তবে ভাগ্য ভালো সবাই অত জোরে ছুটতে পারে না। আর তারাও প্রাণের ভয়ে দৌড়াচ্ছিল। ধরল এসে জনা চারেক। কিল চড় চাপড় গোটা কয়েক পড়ল বটে, কিন্তু দু'জনেই বুদ্ধি করে শীতের রাতে খালের বরফগোলা জলে লাফিয়ে

পড়ায় অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যায়। কাজেই নফরের দোষ নেই। তারা যে লোক কেউ ভালো নয় একথা সবাই জানে। তবে সুবিধেটা এই যে আজকাল লোক কেউ ভালো হয় না। এই যে নফর দিব্যি তামাকপাতার পাইকারি কারবার খুলে বসে আছে। আলটপকা দেখলে মনে হয় ভারি সিধেকারবার। কিন্তু তামাকপাতার আড়াল দিয়ে গুলি, গাঁজা, চরস, ভাঙ, আফিংয়ের যে ফলাও কারবার চলছে তার খোঁজ রাখে কজন? নসিরাম আর সতু সবই জানে। তাই চলে যেতে বললেও তারা যায় না। নফরও আর বেশি গাঁইগুঁই করেনি!

বেলাটা পড়ে এল, দোকানে পিছনকার ঘাঁটাপড়া জায়গায় আলোটা বিলিতি বেগুনের রং ধরল। নসিরামের মনে হল, যথেষ্ট জিরেন হয়েছে।

ও সতু! উঠবি?

সতু আধশোয়া হয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন দেখা গেল, ন্যাবা মাটির ওপর হাতে মাথা পেতে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। তা ঘুমোবেই। শরীরটা জুতের নেই। ন্যাবার আলিস্যি আছে। রামতারণের ওই অসুরের মারেও তো কম ধকল যায়নি।

নসিরামের কাছে বিড়ি নেই। থাকলে একটা ধরাত। শরীরটা উশখুশ করছে। সতুর কাছেও নেই, সে জানে। বিড়ি নেই, ম্যাচিস নেই, পয়সা নেই। নসিরাম উঠল। কারণ, বসে থাকার কোনও মানে হয় না। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছনে মস্ত মানকচু গাছটা অনেকক্ষণ ধরে তার চোখ টানছে। মাটির ওপরেই কচুর যে মাথাটা উঠে আছে সেটা দেখে মনে হয়, দশ সেরের কম ওজন হবে না। যুধিষ্ঠির কচুগাছের গোড়ায় রোজ এঁটো ভাত, ছাই, গোবর আর কী কী সব ফেলে ফেলে দিব্যি পুরুষ্টু করে তুলেছে জিনিসটিকে।

শীতের শেষ টান। নসিরাম জানে এই হাটে এখনও মানকচু খুব একটা ওঠেনি। অনায়াসে দু-তিন টাকায় বিকিয়ে যাবে। টেনে তুলতেও কষ্ট নেই। জল পড়ে পড়ে জায়গাটা এমনিতেই ভুসভুসে হয়ে আছে।

নসিরাম সাবধানে নর্দমাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল। চাল থেকে সেই নট নড়ন-চড়ন বেড়ালটা হঠাৎ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে।

যুধিষ্ঠিরের দোকানের পিছন দিককার দরজাটা আবজানো। কে খোলা রাখবে বাপ! যা দুর্গন্ধ। কচুটা টেনে তোলার সময় নসিরামের একবার মনে হল, ছিঃ ছিঃ কাজটা ঠিক হচ্ছে না, একটু আগেই বনবিবিতলার মাঠে যার হাতে গুপ্তি ছোরা ছিল এখন সেই কিনা কচু— তুচ্ছ কচু চুরি করছে। লোকে দেখলে বলবে কী?

অবশ্য দেখছে না কেউ। কানা লক্ষ্মীকান্ত কয়লা ভেঙে উঠে গিয়েছে। দেখছে শুধু

কচুটা টেনে তোলার সময় নসিরামের একবার মনে হল, ছিঃ ছিঃ কাজটা ঠিক হচ্ছে না, একটু আগেই বনবিবিতলার মাঠে যার হাতে গুপ্তি ছোরা ছিল এখন সেই কিনা কচু— তুচ্ছ কচু চুরি করছে। লোকে দেখলে বলবে কী?

বেড়ালটা। লালুমিত্তিরের টেলারিং-এর চাল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে খুব লক্ষ করছে তাকে আর মিহিন মিয়াঁও আওয়াজ ছাড়ছে। তবে বেড়াল বলে রক্ষে। কুকুর হলে এতক্ষণে ঘাউ ঘাউ করে দুনিয়াকে জানান দিত।

যত সহজে কচুটাকে তোলা যাবে ভেবেছিল নসিরাম, কার্যকালে ততটা সহজ মনে হচ্ছে না। মাটিটা ভুসভুসে পচা মাটি ঠিকই, কচুটাও নড়বড় করছে বটে। কিন্তু গোলমাল অন্য জায়গায়। সেই সকালে দুগাল পান্তা মেরে বেরিয়েছিল নসিরাম। সেই পান্তা কবে তল হয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরেই পেটটা একেবারে বোমভোলা ফাঁকা। মেহনতও বড় কম যায়নি। এখন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, শরীরটা কাহিল লাগছে! ভারী কচুটা খানিক নাড়িয়ে মাটিটা আরও আলগা করে টান দিতে গিয়েই পাঁজরে খিঁচ ধরে দম বন্ধ হয়ে এল। দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে উবু হয়ে বসে পড়ল সে। হাতখানেক বেরিয়ে আসা কচুটা আবার নিজের গর্তে বসে গেল। লালুমিত্তিরের চাল থেকে বেড়ালটা পায়ে হেঁটে চলে আসছে যুধিষ্ঠিরের দোকানের চালে। খুব চেল্লাচেল্লি করতে লেগেছে হঠাৎ। নসিরাম একটা ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল। তারপরই বুঝল ভুল হয়েছে। ঢেলাটা বেড়ালের গায়ে লাগল কিনা কে জানে, তবে যুধিষ্ঠিরের টিনের চালে খটাং করে একটা শব্দ হল।

নসিরাম ফেরত যাওয়ার জন্য উঠতে যাচ্ছিল। কপাল খারাপ। বাঁ পায়ে জোর ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। একেবারে অবশ। উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়তে হল। দোকানঘরের পিছনের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল যুধিষ্ঠির।

এমনিতে দেখলে যুধিষ্ঠিরকে ভয়ের কিছু নেই। রোগাভোগা চেহারা। গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, গায়ে হাফহাতা গেঞ্জি। কিন্তু চেহারা দেখে বিচার করলে খুবই ভুল হবে। যুধিষ্ঠির দেখা দিয়েই মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, কোন শুয়োরের বাচ্চা রে।

আশ্চর্য, নসিরামের রাগ হল না। আজকাল রাগটাগ কমে যাচ্ছে। সে একটু তেজি গলায় বলার চেষ্টা করল, গালমন্দ করছ কেন?

গলায় তেজ তো ফুটলই না, বরং খোনা স্বর বেরোল। উপোসি পেট থেকে আর কত বড় আওয়াজ বেরোবে?

যুধিষ্ঠির তার সাধের কচুটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ছিল। মাটি আলগা, কাদায় চোরের পায়ের ছাপ, চোরও বেকায়দায় পড়ে বসে রয়েছে সামনে।

যুধিষ্ঠির কোমরে হাত দিয়ে তেজের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, গালমন্দ করব না তো কি জামাই-আদর করতে হবে নাকি রে ছ্যাঁচড়া হারামজাদা? ওরে ও পতু, ইদিকে আয়—

পতুর আসা মানে সাড়ে সর্বনাশ। যুধিষ্ঠির রোগাভোগা হলেও তার মেজো ছেলে পতিতপাবন রোগা নয়। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। নসিরামের যা অবস্থা এখন ইঁদুরের লাথি খেলেও সইতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, তা আমি কী করে জানব যে কচুটা তোমার!

আমার নয় তো কি তোর বাবার?

নসিরাম উকিল মোক্তারের মতোই বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, জমিটা তো আর তোমার নয়। সরকারবাবুদের হাট, তাদের জমি।

তাই নাকি রে শুয়োরের পো? তোর এত আইনের জ্ঞান? ওরে পতু—

ঝিঁঝি ছাড়াতে পায়ে থাবড়া মারতে মারতে উঠে দাঁড়াল নসিরাম। বলল, চেঁচাচ্ছ কেন খামোখা? যেতে বলেছো যাচ্ছি।

কখন তোকে যেতে বললাম রে খানকির ছেলে? ওরে পতু! শুনছিস। শিগগির আয়—

পতু প্রথমটায় শুনতে পায়নি। এবার পেল। বেরিয়ে এসে বলল, কী হয়েছেটা কী?

এই দ্যাখ। চোর ন'সে আমার কচু লিয়ে পালাচ্ছিল। ধর হারামজাদাকে।

নসিরামের ঝিঁঝি ছেড়েছে। সে আচমকাই লাফ দিয়ে নর্দমাটা পেরিয়ে গেল। নফরের দোকানের দিকে জোরকদমে হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এঃ, ভারি তো কচু! পতু যে রেলের মাল নামায়, তার বেলা। চোর আমি একা, না?

একেবারে বেঁচে যাবে এতটা আশা করেনি নসিরাম। পতুও সমান তেজে নর্দমাটা পেরিয়ে

তেড়ে এল। দৌড়তেই নসিরাম গুনে গুনে তিনটে গাঁটটা খেল মাথায়। যেন তিনটে ঝুনো নারকেল ডগা থেকে খসে মাথায় এসে পড়ল। আর কিছু অকথ্য গালাগাল। তবে দোকানে খদ্দেরের ভিড় আছে বলেই বোধহয় পতু ঝামেলা আর বাড়াল না। তিনটে রামগাঁট্টায় মাথায় তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

ফের চোখে অন্ধকার দেখল নসিরাম। মরা কুলগাছটায় হাতের ভর রেখে অন্ধকারটা ছাড়িয়ে নিল চোখ থেকে। একরাজ্যের গুঁয়ো লেগে হাতটা চুলকোতে থাকে। তবু অঙ্কের ওপর দিয়েই গিয়েছে বলতে হবে।

কিন্তু কথাটা সে অন্যায্য বলেনি। যুধিষ্ঠিরের চায়ের দোকান যত ভালোই চলুক, তাদের আসল আয় দোকান থেকে নয়। পতু জংশন স্টেশনে রেল থেকে মাল খালাস করার দুনম্বরি ব্যবসায় বহুদিন হল ভিড়ে গিয়েছে। রেলের পুলিশ নিজেরাই ব্যবসাটা ফেঁদেছে। পতুরা কম দামে মাল নামিয়ে আনে। বেশি দামে বেচে দেয়। ধরা পড়ার ভয়টা নেই।

সতু এতক্ষণে উঠে বসেছে। কাণ্ডটা বোধহয় দেখছেও। হাই তুলে বলল বেশি কথা বলা তোরও দোষ। অত কথা বলতে যাস কেন?

নসিরাম রাগ করে বলে, খামোখা গালমন্দ করছিল দেখলে না?

খামোখা করে রে পাগল। তোরও দোষ ছিল। চল রওনা দিই। আজ আর কিছু হওয়ার নয়। দিনটাই খারাপ!

বয়সে সতু নসিরামের চেয়ে বছর কয়েকের বড়। তার বউ আছে, গোটা চারেক বাচ্চা আছে। নসিরামের ওসব নেই। দুজনেই ভুঁইয়াদের জমিতে চাষ করত। বর্গা রেজিস্ট্রির সময় মাতব্বররা তাদের বাদ দিয়ে অন্য দুজনের নাম বসাল! কিছুতেই টলল না। নতুন বর্গাদার ভুঁইয়াদের নিজস্ব লোক। মাতব্বরদের টাকা খাইয়ে ওরাই ওই কাজ করে। সেই থেকে সতু কষ্টে আছে। দুজনেই বুদ্ধি পরামর্শ করে চুরি ছ্যাঁচড়ামির লাইন ধরল বটে, কিন্তু আজ অবধি তেমন সুবিধে হল না।

নসিরাম গোঁ ধরে বসে বলল, তুমি যাও। আমি যাব না।

তবে কি এখেনে বসে বসে মশা তাড়াবি?

তাই তাড়াব।

তোর বড় তেজ। অত তেজ ভালো নয়। আজ আর লোহারগঞ্জ গিয়ে কাজ নেই, কালীতলাতেই চল। একটা চট পেতে দাওয়ায় পড়ে থাকবি।

অভিমান ভরে নসিরাম বলে, তোমার বউ তোমার জন্য রেঁধে রেখেছে, আমার জন্য তো আর রাখেনি। একথায় সতু হাসল, বলল, রেঁধে রেখেছে তো মেলা। উনুনে নিজের হাত পা গুঁজে দিয়ে নিজের মুণ্ডুটা সিদ্ধ করে রেখেছে।

চারদিক ঝেঁপে অন্ধকার নামছে। চকবেড়ের হাটে আলো জ্বলে উঠছে একে একে। কুপি, হ্যাজাক, হ্যারিকেন, কারবাইড। আনমনে দৃশ্যটা দেখছিল নসিরাম। ভারি সুন্দর এই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লড়াই। আলো ভালো লাগত যদি পেটের খোঁদলটা এমন হাঁ হাঁ না করত।

চল, নুন দিয়ে মেখে তাই খাবি। তাও নুন যদি মুদির পো ধারে দেয়।

নসিরামের অভিমান যায়নি। বলল, তোমার বউয়ের মুণ্ডু তুমি খাও গে।

তোর বড্ড মেজাজ। ঠান্ডা হ তো বাপু। ঠান্ডা মাথায় বসে ভাব। ভাবতে ভাবতে একটা কিছু বেরিয়ে পড়বে।

বিড়ির কী ব্যবস্থা করা যায় বলো তো?

নফরাকে বল না।

নফরা দিতে বসেছে আর কী।

তবে যা, একটু তামাক পাতা নিয়ে আয়। দুজনে বসে চিবুই।

কিন্তু নসিরাম নড়ল না। গোঁ ধরে বসে রইল। চারদিক ঝেঁপে অন্ধকার নামছে। চকবেড়ের হাটে আলো জ্বলে উঠছে একে একে। কুপি, হ্যাজাক, হ্যারিকেন, কারবাইড। আনমনে দৃশ্যটা দেখছিল নসিরাম। ভারি সুন্দর এই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লড়াই। আলো ভালো লাগত যদি পেটের খোঁদলটা এমন হাঁ হাঁ না করত।

সতু একটা কোঁক দিয়ে ধীরে ধীরে উঠল। কোমরের গামছাটা খুলে মাথায় জড়াতে জড়াতে বলল, এখন সাঁঝের পর খুব হিম পড়ে। কালীতলায় যদি না যাস তো লোহারগঞ্জেই যা, ঘরে গিয়ে আজকের রাতটা জিরো।

নসিরাম তবু নড়ল না, তার কেমন একটা ভাব এসেছে। রামতারণ তাকে একটা মোটে থাবড়া দিয়েছিল। সতুর ভাগটা ছিল অনেকটাই বেশি। এখন আবার পতুর গাঁট্টা তিনটে খাওয়ার পর নসিরাম আর সতু প্রায় সমান সমান। তার চেয়ে বড় কথা, তিনটে গাঁট্টা তার মাথার ভেতরটা কেমন গুলিয়ে দিয়েছে। চারদিককার এই হাটবাজার, পচা নর্দমার গন্ধ, রৈ-রৈ শব্দ কিছুই যেন তাকে তেমন ছুঁচ্ছে না।

সতু আবার জিজ্ঞেস করল, কী রে যাবি?

না, তুমি যাও।

সতু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে আবার বসে পড়ল। বলল, তোর হয়েছেটা কী বল তো!

নসিরাম হঠাৎ মুখ তুলে বলল, হবে আবার কী? এতক্ষণে রামতারণের লাশ মাঠের ধারে পড়ে থাকার কথা, তার ওপর মাছি ভন ভন করার কথা। আমাদের দুজনের হাতে দু-দুটো অস্ত্র ছিল, তবু তা হল না। লোকটা ভয় পেল না। কেন বলো তো সতু গোঁসাই? এক গোছা টাকা ট্যাঁকে নিয়ে সে দিব্যি ফিরে গিয়ে এতক্ষণে বউয়ের হাত পাখার নীচে বসে বাতাস খাচ্ছে।

হাতপাখার বাতাস খাওয়ার মতো গরম এখনও পড়েনি, কিন্তু সে কথাটা আর সাহস করে বলতে পারল না সতু। গলাটা উদাস রেখে বলল, প্রথম প্রথম ওরকম হয়। ওকে যে মারতে হয়নি সেটা ভালোই হয়েছে। মানুষ মারার অনেক হেপা রে। আমরা তো মারতে চাইনি। টাকাটা চেয়েছিলুম।

আর উল্টে যে ও আমাদের মারল!

তা কী করবি বল। রামতারণ শালা খায় দায় ভালো। বোধহয় ডন-বৈঠকও করে। তোর আমার মতো উপোসি পেট তো আর নয়। আমরাও দু'দিন ভরপেট খেয়ে নিলে অত সহজে পারত নাকি! তার ওপর আমার ন্যাবাটা হয়ে...

রাখো তোমার ন্যাবা। নসিরাম খেঁকিয়ে উঠে বলে, আসলে আমরা মরদই নই।

কথাটা অন্যায্য মনে হয় না সতুর। সে চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে ভয়ে ভয়ে বলে, চল, হাটে একটু ঘুরে দরদস্তুর দেখি।

দেখে কী হবে?

চল না। জিনিসপত্তর দেখলে মনটা অন্যদিকে থাকবে। দরটাও জেনে রাখা ভালো। আমার মুখে থুথু আসছে। একটু তামাকপাতা মুখে না দিলেই নয়।

নসিরাম চোখ পাকিয়ে বলল, কচুটা কি যুধিষ্ঠির শালার বাপের?

সতু উদাস গলায় বলল, তারই বা কী করবি? জোর যার মুলুক তার।

এঃ জোর! আমরা যে আসলে মরদই নই সে কথাটা স্বীকার যাচ্ছ না কেন?

যাচ্ছি বাপ, স্বীকার যাচ্ছি।

নসিরাম হঠাৎ একটা ঝাঁকি মেরে উঠে সতুকে দুহাতে নাড়া দিয়ে বলল তাহলে চলো মরদের মতো একটা কিছু করি।

ভয় খেয়ে সতু বলে, কী করবি?

একটা কিছু করি, নইলে কোন লজ্জায় বাড়ি ফিরব।

নসিরামের মাথায় যে পতুর তিনটে গাঁট্টা তাড়ির মতো কাজ করছে তা জানে না সতু।

তবে তার চোখে-মুখে হন্যে ভাবটা দেখে সে বুঝল, নসিরাম নিজের বশে নেই। পাগলার বায়ু চড়েছে। সে নসিরামের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, চল তো আগে বেরোই। তারপর দেখা যাবে।

দুজনে বেরোবার মুখে একটা আস্ত তামাকপাতা নফরের চোখের সামনেই তুলে নিল নসিরাম। আস্তটা না নিলেও হত। কুঁড়ো কাঁড়া মেলা পড়ে থাকে। তাই দিয়েই চলে যেত। তবু আস্ত পাতাটাই একটা থাক থেকে তুলে নিল নসিরাম। নফর কিছু বলতে যাচ্ছিল। হয়তো মা-বাপ তুলে একটা খিস্তিই দিত। কিন্তু নসিরাম তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। কী জানি কেন, কিছু বলল না নফর।

বাইরে এসে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে বলা নেই কওয়া নেই চুনের বাটি থেকে এক খাবলা চুন তুলে নিল নসিরাম। পানের দোকানি হাঁ-হাঁ করে উঠেও শেষ অবধি আর কিছু বলল না।

চুন দিয়ে ডলা খানিকটা তামাকপাতা ঠোঁটের নীচে গুঁজবার পর একটু ধাতস্থ হল দুজন।

নসিরাম খানিক থুথু ফেলে বলল, আমাদের কী নেই বলো তো? কেন আমাদের দিয়ে কাজ হচ্ছে না?

সতু মিইয়ে গিয়ে বলে, আমরা লোক ভালো। ভালো লোকদের দেখলেই চেনা যায় কিনা।

তোমার মাথা। ভালো লোককে ধরে তাহলে ঠেঙায়?

ভালো লোক বলতে ঠিক ভালো লোক নয় বটে। আসলে আহম্মক ঠাওরায়।

তাই বলো। আহম্মক আর ভালো কি এক হল?

অত কথা জানলে তো এতদিন কালীতলা প্রাইমারিতে মাস্টারি করতুম রে। অত কথা কি জানি?

ভুঁইয়ারা যখন জমিতে নতুন বর্গা লাগালে তখন আমরা যেমন আহাম্মক ছিলুম আজও তেমনি আহাম্মক আছি বলছ?

সতু মাথা নেড়ে বলে, আছিই তো।

তাহলে মরদও নই?

তাও খানিকটা ঠিক। কারও সঙ্গেই আমরা

লোকটার সেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোটা চোখে পড়াতেই ইসমাইলকে দেখতে পায় নসিরাম। দেখেই একটা চমক লাগে তার। বুকে একটা চড়াই পাখি কঁকিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইসমাইলের ধরণটাও ভালো ঠেকে না তার চোখে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চোয়াল শক্ত, ভ্রূ কোঁচকানো, ফর্সা মুখটা একটু রাঙা দেখাচ্ছে।

তেমন এঁটে উঠছি না। তবে রোজ একটু একটু অভ্যেস করলে দেখিস হয়ে উঠব একদিন।

তোমার বয়স কত?

সতু অবাক হয়ে বলে, কত আর। তোর চেয়ে পাঁচ-সাত বছরের বড় হব। তোর কত?

তা জানি না। তবে বেশি নয় খুব একটা, কমও নয়। ভাবছি হয়ে উঠতে আর কদিন লাগবে। ততদিন বুড়ে ধুড়ো হয়ে যাব না তো দুজনে?

সতু খুব হাসে। গামছার ল্যাজে মুখ মুছে বলে, বুড়ো হওয়া তো ভালো কথা রে। বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয় তাহলে। গতিক যা দেখছি, ততদিন বেঁচে থাকাটাই তো দায়।

নসিরাম আর একবার থুথু ফেলে বলে, তাইতো বলছিলাম, এসব রয়ে সয়ে হয় না। এসো মরদের মতো একটা কিছু করে ফেলি।

মেটে আলুর দর জিজ্ঞেস করতে একটু দাঁড়িয়েছিল সতু। দোকানি তেরছা একটু চেয়ে দেখল। জবাব দিল না। মাল চেনে। সতুও আর চাপাচাপি করল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল, কী বলছিলে?

বলছিলাম অত ভয় খাও কেন? একটা ধুন্ধুমার কিছু লাগিয়ে দিই এসো। যা হোক, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড।

অত উতলা হোস না। রোস ক'দিন।

সেটা আর ক'দিন; ভালো পথ তো আর নেই। খারাপ পথেও ভিড় বাড়ছে। শেষে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন?

কেন, এই তো সেদিন রতন সিং-এর গরুটা চুরি করলুম দুজনে।

সে আর ক'টা টাকাই বা দিয়েছে। গো-হাটার লোকটা চোরাই গরু বলে ধরে ফেলল। দিল মাত্র একশটা টাকা। ভাগাভাগি হয়ে তোমার পঞ্চাশ, আমার পঞ্চাশ। ও তো পিচেশপানা। বড় কিছু না করলে বড় দাঁও মারা যায় না, বুঝলে!

বুঝছি রে বাপ, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। তুই বড় ছটফট করছিস আজ। এমন তো ছিলি না।

আজ রক্তটা কিছু গরম লাগছে।

আয় তেলেভাজা খাই। পেটে কিছু পড়লেই রক্ত ঠান্ডা হবে। আমার কাছে একটা টাকা আছে।

আছে? বলোনি তো এতক্ষণ!

বলার ফাঁক দিলি কই?

যা গেল হুজ্জুত। পরশু ব্রজবিলাসের বাড়ি থেকে দুটো কাঁসার থালা সরিয়েছিলাম। তারই তলানি একটা টাকা পড়ে আছে।

তাহলে তেলেভাজা খেতে চাইছ কেন? অত বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়? বরং একটু কুথি কলাই আর নুন কিনে বাড়ি যাও। সিদ্ধ করে ছেলেপুলে বউ নিয়ে খাবে।

বলছিস?

বলছি। খিদেটা আছে থাক। শরীরটা গরম লাগছে। চনমনে লাগছে। পেটটা ঠান্ডা হলে এই ভাবটা মরে যাবে।

সতু আমতা আমতা করে বলল, তোকে আমার এখন একটু একটু ভয় করছে কেন রে নসু?

নসিরাম হাঁঃ হাঁঃ করে খানিক হাসল। মাথায় একটু হাত বোলাল সে। তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়েছে পতু শালা! কেন? না একটা কচু নিয়ে বৃত্তান্ত। দুনিয়াটা যে কী ছোটলোকই হয়ে গিয়েছে বাপ!

চকবেড়ের সরকারদের এই হাট ভারি রমরমে জায়গা। নামে হাট হলেও আসলে পাকা এবং স্থায়ী বাজার। হপ্তায় দুদিন বাজারের গায়েই হাট বসে। আজ সেই হাটবার। মেলা লোকের আনাগোনা। দুজনে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বিশেষ লক্ষ করছে না তাদের।

সতু বলল, কথাটার জবাব দিলি না?

কোন কথাটার?

তোকে দেখে এখন আমার একটু গা ছমছম করছে কেন?

ওঃ, কী যে ছাতামাথা বলো না! আমি কি ভূত যে গা ছমছম করবে?

ভূত নোস। তবে তোর হাবভাব ভালো লাগছে না রে নসু। কী যে একটা মতলব আঁটছিস মনে মনে!

সে তো আটছিই। হাবভাব ভালো করার জন্য এ লাইনে নেমেছি নাকি।

তা বটে। তবে মাথাটা ঠান্ডা রাখিস।

রাখা যাচ্ছে না। মাথা ঠান্ডা থাকে কখনও? হাতে অস্ত্র নিয়ে হামলা করলুম, তাও রামতারণ শালা পুলিশে দিল না। এমনকি ইসমাইলকে পর্যন্ত পিছুতে লাগাল না। তার মানেটা বুঝছো? তার মানে, রামতারণ আমাদের মনিষ্যি বলেই জ্ঞান করেনি। ছিঁচকে চোরকেও লোকে এর বেশি খাতির দেয়। তা জানতে চাইছিলুম, আমাদের কী নেই! কিসের অভাব আছে। লোক ভয় খাচ্ছে না। পাত্তা দিচ্ছে না। রামতারণ এমন কিছু ডাকাবুকো লোকও নয়। গেরস্ত মানুষ, পাইক নিয়ে চলে, মেয়েমানুষ করে, তার ভয় ভীতি থাকার কথা। তারপর ধরো, যুধিষ্ঠিরের পো পতু চোর বলে তিনটে গাঁট্টা আর গালাগালি দিয়ে ছেড়ে দিল। লোক জড়ো করল না, তেমন চেঁচামেচি করল না। তার মানেও কিন্তু ওই। মানুষ বলেই ধরছে না।

তোর মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছে আজ।

তা বলতে পারো। নাও তামাকটা একটু ডলো। আর একটু চড়াই।

খিদেটা মরেছে?

মরেছে। আর একবার চড়ালে একদম মরে যাবে।

মাসুদের জরদার দোকানের সামনে একটা আয়না ঝোলানো। ম' ম' করছে গন্ধ। খইনি ডলতে আচমকাই সতু আয়নাটার দিকে চেয়ে চমকে গেল। চেক লুঙ্গি, শার্ট আর সোয়েটার পরা একটা ছিপছিপে লোক পিছু ফিরে আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বোধহয় মুখের ব্রণ টিপছিল। হ্যাজাকের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল মুখখানা। ইসমাইল। হাতে টর্চ ছাড়া আপাতত কোনও অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর লুঙ্গি বেল্ট দিয়ে বাঁধা থাকে। সেই বেল্টে ঝোলে চাকুর খাপ। কিন্তু কথা হল, ইসমাইল তাদের খবর রাখে কিনা।

খইনি ডলতে ডলতে থেমে গিয়ে সতু বলল, নসু, ইসমাইল।

প্রথমটায় নসিরাম বুঝতে পারেনি। হাত বাড়িয়ে খানিকটা খইনি সতুর হাত থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। তারপর আচমকা সেও ইসমাইলকে দেখতে পেল।

দেখতে হয়তো পেত না। কিন্তু ইসমাইল আয়নার ভেতর দিয়ে নিজের মুখ দেখার ছল করে আসলে হাটের লোকজনকে চোখে চোখে রাখছিল। তাদের দুজনকে দেখতে পেয়েই ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। লোকটার সেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোটা চোখে পড়াতেই ইসমাইলকে দেখতে পায় নসিরাম। দেখেই একটা চমক লাগে তার। বুকে একটা চড়াই পাখি কঁকিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইসমাইলের ধরণটাও ভালো ঠেকে না

জানি। কিন্তু আগে অস্ত্র বের করো, তারপর কথা। অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কিসের হে! বের কর শালা তোর অস্ত্র। নিজের গলার স্বরে নসিরাম নিজেই অবাক হয়ে গেল। যেন এক বাঘ এসে এখন সেঁদিয়েছে গলার মধ্যে। খোনা স্বরটা আর পাওয়া যাচ্ছে না তো!

তার চোখে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চোয়াল শক্ত, ভ্রূ কোঁচকানো, ফর্সা মুখটা একটু রাঙা দেখাচ্ছে।

ইসমাইল তাদের নড়বার সময় দিল না। মাসুদের দোকান থেকে একটা লাফ মেরে রাস্তার মাঝখানে পড়ল।

কি রে শশালা! খুব মস্তান হয়েছিস?

রামতারণ তাহলে খবর দিয়েছে? অ্যাঁ! রামতারণ শালা শেষ অবধি খবর দিয়েছে তাহলে?

সতু কঁকিয়ে উঠে বলল, নসু! দৌড়ো! পালা!

নসিরামেরও বুকের মধ্যে তোলপাড়। তবু সে একটু সত্যিকারের হাসি হেসে বলল, আঃ! দাঁড়াও না। রামতারণ শেষ অবধি তো মনিষ্যির মানটা দিয়েছে না কি?

কী যে বলিস বিপদের সময়! দৌড়ো!

তুমি পালাও।

তুই?

জবাবটা দেওয়ার সময় পায় না সতু। ইসমাইল চট করে এসে বাঁ হাতে একটা রদ্দা মারল সতুর ঘাড়ে। সতু পড়ে গেল।

নসিরাম দেখল, ইসমাইল তার ছুরি বের করেনি। খুব রাগ হল তার। দু-দুটো লোককে শুধু হাতেই মেরে ক্ষান্ত হবে নাকি গুণ্ডাটা? সে হাত ছড়িয়ে ইসমাইলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ঢ্যামনার মতো হাত চালাচ্ছ কেন?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ইসমাইল দ্বিতীয়বার হাত তুলতে গিয়েও একটু থমকে গেল। গনগনে গলায় বলল, কত বড় খুনিয়া হয়েছিস রে শালা রেণ্ডির ব্যাটা? জানিস এটা আমার এলাকা।

জানি। কিন্তু আগে অস্ত্র বের করো, তারপর কথা। অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কিসের হে! বের কর শালা তোর অস্ত্র।

নিজের গলার স্বরে নসিরাম নিজেই অবাক হয়ে গেল। যেন এক বাঘ এসে এখন সেঁদিয়েছে গলার মধ্যে। খোনা স্বরটা আর পাওয়া যাচ্ছে না তো!

ইসমাইল একটু দ্বিধার পড়ে গিয়েছে। চারদিকে লোকজনও জড়ো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কোমরে জামার তলায় হাত রেখে সে স্থির চেয়ে বলল ফের এই তল্লাটে পা দিয়েছিস তো—

কিন্তু কথাটা শেষ হল না তার। নসিরাম হঠাৎ ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গেল তার দিকে, রেণ্ডির পুত আমি না তুইরে? অ্যাঁ! কাঁচা খেয়ে নেবো তোকে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব শালা! আয়, আয় শালা...

কী যে হল তার হদিশ পাওয়া মুশকিল। তবে কেমন যেন ভড়কানো মুখে ইসমাইল পিছু হটতে লাগল।

আয় শালা! আয় শালা! বলে এগোতে লাগল নসিরাম। হাতে অস্ত্র নেই। পেটে খোঁদল। গালে রামতারণের থাবড়া এখনও চিন চিন করছে। মাথায় পতুর তোলা তিনটে আলু। তবু শুধু হাতেই সে হঠাৎ বেড়ালের মতো একটা লাফ মেরে গিয়ে পড়ল ইসমাইলের এক হাতের মধ্যে।

আর পারল না ইসমাইল। বোধহয় জীবনে এই প্রথম সে মুখ ঘুরিয়ে ছুট লাগাল। এক হাট লোকের চোখের সামনে।

নসিরাম নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে; সে লক্ষ করল চারপাশে জড়ো হওয়া শয়ে শয়ে লোক তাকে নীরবে দেখছে। তাদের চোখে ভয়।

***

একটু বেশি রাত করেই ফিরছিল দুজন। সতু আর নসিরাম।

সতু বলল, তোর সঙ্গে যে রাত বিরেতে ফিরি, কোনওদিন ভয় লাগে না। আজ লাগছে। তোকে আজ ভয় খাচ্ছি কেন রে?

নসিরাম নিজের মাথার তিনটে আলুতে হাত বুলিয়ে বলল, কি জানি কেন, আজ আমার নিজেরই নিজেকে এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে!

আমলাহি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদা

জেলাশাসকের সাদা মেটাল-টপ গাড়ি চলেছে হুহু করে হাইওয়ে বরাবর, ড্রাইভার মাঝেমধ্যে বলছে, স্যার, দুপাশের ধানজমিতে দিনদুই জল জমে ছিল, এখন আর জল নেই।

গাড়ির ভেতরে জেলাশাসক চলেছেন প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে। এলাকাটা বন্যাপ্রবণ, লোকে বলে কুকুরে পেচ্ছাপ করলেও এখানে বানভাসি হয়। একবার বানভাসি হলে তার জের চলে কয়েক মাস। এবারও একটানা চার-পাঁচদিন কখনও ঝমঝম কখনও ঝিরঝির কখনও টিপটিপ কখনও ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হওয়ায় এলাকায় বন্যা-বন্যা ভাব।

তার পরিণামে স্থানীয় এম এল এ কখনও টেলিফোনে, কখনও সশরীরে আবির্ভূত হয়ে একবার এস ডি ও-র কাছে, একবার ডি এমের কাছে চিৎকার-চেঁচামেচি করছেন বন্যা ডিক্লেয়ার করতে।

জেলাশাসক জানেন একবার বন্যা ব্যাপারটা প্রেস করে দিতে পারলেই টন টন গম আর রিলিফের টাকা পৌঁছবে এলাকায়। কয়েকদিন চেঁচামেচি শোনার পর এস ডি ও-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী ব্যাপার, মুখার্জি, সত্যিই বন্যা হয়েছে নাকি? রাইটার্স থেকেও ফোন আসছে বারবার, জানতে চাইছে এলাকায় বন্যা হয়েছে, অথচ জেলা থেকে কোনও রিপোর্ট আসছে না কেন!

মুখার্জি বলেছে, স্যার, বৃষ্টিতে দিনদুই জল জমেছিল ঠিকই, কিন্তু পাশে নদী আছে, এখন নেমে গিয়েছে। সেরকম মুষলধারায় তো হয়নি। আমি ওদের বলেছি, জল দীর্ঘদিন স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে না থাকলে কী করে বন্যা বলে এস্টাব্লিশ করা যাবে! সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের টিম ইনস্পেকশনে এলে তো ধরে ফেলবে! স্যার, আপনি একবার স্বচক্ষে দেখে যান। আপনি দেখলে আর ওদের কিছু বলার থাকবে না।

জেলাশাসক অতএব চলেছেন সরেজমিনে তদন্ত করে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে। গাড়িটা চলছে সজোরে, স্পটে এম এল এ সহ স্থানীয় নেতারা থাকবেন, ডি এমের উপস্থিতিতে আজই ফয়সালা হবে বন্যা হয়েছে কি হয়নি!

কিন্তু পথিমধ্যে হঠাৎ এক উটকো ঝামেলার উদয় হতে তাল কেটে গেল তাঁর ট্যুরের। সোজাসরল রাস্তা, এক হাইস্কুলের কাছে পৌঁছে বাঁদিকে বাঁক নিতেই একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ, তার নীচে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আট-দশজন যুবক, তারা হাত দেখাতেই ড্রাইভার ভেবেছে হয়তো এরাই স্থানীয় নেতাটেতা, সে হুশ করে ব্রেক চেপে গাড়ি দাঁড় করাতেই তারা ঘিরে ধরল গাড়ি।

জেলাশাসক নিজেও ভেবেছেন নিশ্চয় এরাই অভিযোগকারী, কিন্তু না এম এল এ, না এস ডি ও বা বি ডি ও, কেউই নেই দেখে ইতস্তত করছিলেন নামতে, সেই ফুরসতে যুবকেরা গাড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে বাড়িয়ে দিল একটা বিল, চাঁদা দিন। চাঁদা দিন।

—চাঁদা! চাঁদা কীসের! ডি এমের বিস্ময় ও বিরক্তি।

—বাহ্, দুর্গাপুজো আসছে না! পুজোর চাঁদা দেবেন না?

জেলাশাসকের কাছে কিছুদিন ধরে অভিযোগ আসছিল হাইওয়ের ওপর যাবতীয় বাস-ট্রাক-প্রাইভেট গাড়ি থামিয়ে চাঁদার জুলুম চলছে এলাকায়। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও অ্যাকশন নিচ্ছে না পুলিশ!

ড্রাইভারের পাশেই বসেছিল ডি এমের সিকিউরিটি, সে তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে বলল, এটা ডি এমের গাড়ি, এক্ষুনি রাস্তা ছাড়ুন।

যুবকগুলি হইহই করে হেসে উঠল, ওরে, এটা ডিমের গাড়ি। তা কীসের ডিম, হাঁসের না মুরগির!

বলে এমন ফিচেল হাসি হাসতে শুরু করল সবাই যে, মাথা ঠিক রাখাই দায়!

জেলাশাসক কম কথার মানুষ, তিনিও মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা এরকম গাড়ি থামিয়ে চাঁদা চাইছ, এটা আইনের চোখে অফেন্স, তা জানো? পথ ছাড়ো—

—ও রে, এ লোকটা আবার আইন দেখাচ্ছে! একজন হো হো করে হেসে উঠে বলল, এরকম আইন সবাই দেখায়, চটপট একশোটা টাকা ছাড়ুন, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি।

জেলাশাসক একবার আড়চোখে দেখে নিলেন তাঁর সামনে বাড়িয়ে দেওয়া বিলটি, তাতে বড় বড় করে কাঁচা অক্ষরে একের পিঠে দুটো শূন্য

লেখা। হাতটা প্রায় তাঁর কোলের কাছে বাড়ানো, হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, দ্যাখো, যদি ভালো কথায় না শোনো, তাহলে আমি অ্যাকশন নিতে বাধ্য থাকব। গাড়ি ছাড়ো—

গাড়ির বনেটের সামনে জনা চারেক যুবক, দুপাশে আরও চার-পাঁচজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যাতে ড্রাইভার কিছুতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে! সামনে বসা সিকিউরিটি বেরনোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু গাড়ির ওপাশে দরজা চেপে দাঁড়িয়ে আরও দুজন।

এদিকে রাস্তা ফাঁকা, লোকজন কোথাও নেই, পিছনে এখনও কোনও গাড়িটাড়ি এসে পৌঁছয়নি, যুবকেরা তখন হই হই করছে, হুঁ, উনি অ্যাকশন নেবেন। কত অ্যাকশন দেখানেওলা এল-গেল! আগে টাকা ছাড়ুন, তারপর ফোঁসফোঁসানি দেখাবেন।

সিকিউরিটি সামনে থেকে হুঙ্কার ছাড়ল, ডি এমের গাড়ি আটকে চাঁদা চাইছ, এর ফল কিন্তু ভালো হবে না! গাড়ি ছাড়ো, নইলে—

—নইলে কী করবি তুই? বেশি ফ্যাঁচফ্যাঁচ করলে ঘাড়ে এমন একখানা রদ্দা কষিয়ে দেব, চোখে ধুতরোফুল দেখবি!

যে-যুবকটি কথাটা বলল তার চেহারাটা বেশ তাগড়াই। ভেতরে জেলাশাসকের মুখচোখ হয়ে উঠেছে লাল টকটকে। বিলবইটা তাঁর সামনে বাড়ানোই আছে, রাস্তার মধ্যে এমন জোরাজুরি দেখে তাঁর এলাকায় পুলিশের শাসন কীরকম চলছে তা বুঝতেই পারছেন! তিনি ডি এম —এই পরিচয় জানার পরেও যা ব্যবহার করছে এরা, সাধারণ মানুষের ওপর তাহলে কী জুলুম চলছে!

সিকিউরিটি তখন অন্য পথ ধরে, বলল, জানো, সামনে এম এল এ সাহেব অপেক্ষা করছেন ডি এমের জন্য!

—এম এল এ আমাদের কী করবে! অ্যাঁ, আমাদের এম এল এ দেখানো হচ্ছে!

বলে এম এল এ-র নাম করে বলল, হুঁ, অমুকদাকে আমরা পকেটে পুরে রাখি!

বেশ কিছুক্ষণ তড়পানির পরেও যখন তারা গাড়ি ছাড়ার কোনও লক্ষণ দেখাচ্ছে না, তখন সিকিউরিটি বাধ্য হয়ে তার স্বরূপ প্রকাশ করে, কোমর থেকে পিস্তলটা বার করে হুঙ্কার দিল, তখন থেকে বলছি, এটা ডি এমের গাড়ি, তোমাদের কানে ঢুকছে না, এরপর কিন্তু গুলি ছুড়তে বাধ্য হব!

বলতে বলতে একরাউন্ড ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতেই যুবকেরা পরস্পর চোখাচোখি করে পিছু হটে, কিন্তু তখনও জুলুমবাজি ছাড়েনি, ঠিক আছে, এখন ছেড়ে দিচ্ছি, ফেরার সময় আরও অনেক ছেলে নিয়ে ঘেরাও করব! এক পৌষে শীত যাবে না—

গাড়ির ড্রাইভার প্রস্তুত ছিল, যুবকেরা রাস্তা ছেড়ে দিতেই সে হুশ করে গাড়ি চালিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। কিন্তু জেলাশাসক তখন রাগে লাল হয়ে গিয়েছেন, ড্রাইভারকে বললেন, আপনি আগে থানায় চলুন। গাড়ি থামিয়ে চাঁদার জুলুমবাজি চলছে, প্রথমে তার ফয়সালা হোক, তারপর বন্যা দেখব।

ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ সামনে মোড় থেকে টার্ন নিয়ে খুব দ্রুত পৌঁছে গেল থানায়। ডি এমের গাড়ি অসময়ে থানায় দেখে থানার সেন্ট্রি স্যালুট দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেল ও সি-র চেম্বারে।

থানার বাইরে তখন অনেক মানুষের ভিড়। বেশিরভাগ লোকই চত্বরে দাঁড়িয়ে, কয়েকজন বসে আছে থানার বারান্দায় যে হাতলওলা চেয়ারটা পাতা থাকে, তার ওপর। তারা নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছিল উত্তেজিতভাবে, দামি সাদা গাড়ি দেখে থম মেরে গেল মুহূর্তে।

ও সি তড়াক করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে একখানা বিরাশি সিক্কার স্যালুট দিয়ে দিল জেলার কর্ণধারকে। 'আসুন, স্যার, আসুন, স্যার' বলে সাহেবকে যত্ন করে তাঁর সিটে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, স্যার, চা, না কফি?

কিন্তু জেলাশাসক তখন গনগন করছেন রাগে, চেয়ারে বসে বললেন, রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চাঁদা চাইছে, তার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না!

এসব থানার ও সি-রা খুব ধুরন্ধর টাইপের হয়, সাহেবের অভিব্যক্তি দেখেই মালুম করে নেয় রাস্তায় কী ঘটেছে! তৎক্ষণাৎ চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে বলল, স্যার, আপনার গাড়িকেও ধরেছিল নাকি!

ডি এম তখন খুব সংক্ষেপে ঘটনাটি জানিয়ে রাগতকণ্ঠে বললেন, এলাকায় কী ঘটছে তা আপনার জানা নেই!

ও সি মাথা চুলকে বললেন, স্যার, কমপ্লেন এলেই ফোর্স পাঠিয়ে ধরে আনি। কিন্তু ধরার কিছুক্ষণ পরেই স্যার, ওপর থেকে ফোন আসে, বলে এরা পার্টির ক্যাডার, ছেড়ে দিন। এদের টাইট করা খুব কঠিন, স্যার। তারপরও দুটো পার্টিকে অ্যারেস্ট করেছিলাম, কিন্তু স্যার, বেলেবল অফেন্স। জামিন নিয়েই আবার শুরু করে চাঁদা তুলতে।

ডি এম গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি এখনই তুলে আনুন সব কটাকে। লক-আপে ভরে রাখুন। আমি বন্যার জায়গা ঘুরে আসছি, তারপর দেখছি কোন সেকশনে ওদের টাইট করা যায়!

ও সি তৎপর হয়ে বললেন, স্যার, এখনই সব ক-জনকে ধরে আনছি। ঠিক স্পটটা বলুন, স্যার।

ডি এম বললেন, ওই যে, রাস্তার ধারে একটা হাইস্কুল আছে, তারপর বাঁদিকে টার্ন নিয়েছে রাস্তাটা, একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, সেখানেই—

—বুঝেছি স্যার, ওটা পল্টাদের দল। খুব জ্বালাচ্ছে ক-দিন ধরে। আপনি কিছু ভাববেন না, স্যার। দেখুন না কীরকম টাইট করে দিচ্ছি।

বলেই বেল বাজিয়ে ডাকলেন একজন হোমগার্ডকে, বললেন, বাইরে গিয়ে দ্যাখো, ডাকাতি কেসের বাদী বসে আছে, ডাকো তো! আর মেজোবাবুকে বলো, ডাকাতি কেসের কমপ্লেনটা আমার টেবিলে পাঠিতে দিতে।

হোমগার্ড ডি এম সাহেবকে মস্ত স্যালুট দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। পরক্ষণে প্রথমে একটা দু-পাতার দরখাস্ত, তার একটু পরেই গাঁয়ের একটি লোক ঢুকে পড়ল ভেতরে। ও সি সেই লোকটিকে বললেন, হারাধনবাবু, আপনার বাড়িতে যারা ডাকাতি করেছে বলে সন্দেহ করেছেন, তাদের ন-জনের নাম লিখেছেন তো?

লোকটি ঘাড় নাড়তেই ও সি দরখাস্তটা এগিয়ে দিয়ে আবার বললেন, তার নীচে আরও তিনজনের নাম লিখুন—

বলে ও সি পল্টা ও আরও দুজনের নাম বলতে লোকটি দরখাস্তে লিখে ফেলল পটাপট। পরক্ষণেই ও সি তাকে বলেন, ঠিক আছে, এবার আপনি আসতে পারেন, হারাধনবাবু।

লোকটি বাইরে বেরতে ও সি বললেন, স্যার, ওদের পাণ্ডা তিনটেকে ঝুলিয়ে দিলাম।

ডি এম জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই ও সি খোলসা করলেন, স্যার, কাল অশ্বিনীপুর গ্রামে একটা বড় ডাকাতি হয়েছে, বাড়ির মালিক হারাধনবাবু তাঁর পাড়ার লোকজনকে নিয়ে এসেছেন থানায় ডায়েরি করতে। এই সেই দরখাস্ত। যারা ডাকাতি করতে এসেছিল বলে উনি সন্দেহ করছেন, এই দেখুন স্যার, তাদের ন-জনের নাম লিখেছেন। যাঁরা চাঁদা চেয়ে আপনাকে উত্যক্ত করছিল তাদের তিন পাণ্ডার নাম ওঁকে দিয়েই লিখিয়ে নিলাম ন-টা নামের নীচে। তাতে কী দাঁড়াল বুঝতে পারলেন, স্যার?

ডি এম বোঝার চেষ্টা করছিলেন।

—স্যার, চাঁদার তিন পাণ্ডাকে ডাকাতি কেসের আসামি করে দিলাম। কালই তাদের নামে কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট অব অ্যারেস্ট বেরবে, তারপর ন-জন ডাকাতের সঙ্গে তিন পাণ্ডাকে পুলিশ ধরে চালান করে দেবে কোর্টে। আপাতত অন্তত চোদ্দোদিনের হাজতবাস। তারপর যদি বেল পায়ও, আরও বছর পাঁচেক ঘুরতে হবে দু-তিন মাস পর পর কোর্টে হাজিরা দিতে ও প্রমাণ করতে যে তারা এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল না!

বলে হাসলেন ধুরন্ধর ও সি, বললেন, স্যার, এ জীবনে আর চাঁদা চাইবে না ওরা! ডি এম সাহেবকে হেনস্থা করলে কী হয় তা বুঝুক। যেমন উকিলের পিছনে জলের মতো টাকা খরচ হবে, তেমনই মাসের পর মাস হয়রানি আর উৎকণ্ঠা!

শিরোচিত্র: অর্ক পৈতণ্ডী ছবি: শংকর বসাক

আগামী সংখ্যায়

এই লেখকের

বুড়োক্রেজি

ঢিলটি মারলে...

কাপাডোকিয়া

প্রতাপকুমার রায়

বছরখানেক আগে ইস্তাম্বুলে ট্র্যাভেল এজেন্টের অফিসে তুরস্কের নানা স্থানের ভ্রমণের প্রচারপুস্তিকা ঘাঁটছিলাম। একটা পাতা দেখে চমকে উঠেছিলাম। এ কোথাকার ছবি? আমাদের জানা জগতের নয়। হয় অন্য কোনও গ্রহের অথবা কোনও উন্মাদ ভাস্করের পরাবাস্তব সৃষ্টি। জায়গাটির নামেও চমক। কাপাডোকিয়া। তখনই যাবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু অন্তত তিনদিন লাগবে কাপাডোকিয়া যাতায়াতে। অত সময় হাতে নেই, তাই যাওয়া হল না।

এবারে ইস্তাম্বুলে পনেরো দিন থাকব। ইস্তাম্বুল আমার মনোমতো শহর। শহরের যে অঞ্চলে আমাদের নির্বাচিত হোটেল, সেটা বোঝাতে গেলে আমাদের চিৎপুর বা বাগবাজার অঞ্চলের কথা বলতে হবে। অর্থাৎ শহরের প্রাণকেন্দ্র, সুলতান আমেট। পঞ্চদশ শতাব্দীর সুলতান আমেটের নামে এই অঞ্চল। আমাদের বাগবাজার বা চিৎপুরের মতো এলোমেলো, অভাবে পীড়িত নয়। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে প্রশস্ত। ইস্তাম্বুলের প্রাচীনতম অংশ। দক্ষিণে সি অব মারযারা, পুবে গোল্ডেন হর্ন। রাস্তার মাঝখান দিয়ে আধুনিক চার-কামরার ট্রাম চলেছে। গাড়ি ও পথচারীর অন্ত নেই। এই পাড়াতেই ইস্তাম্বুলের প্রধান দ্রষ্টব্য চারটি স্থান, ব্লু মস্ক, সান্তা, সোফিয়া, তোপকাপি প্রাসাদ, সুলেমানিয়া মসজিদ। পৃথিবীবিখ্যাত কভারড বাজারও এখানে।

ইস্তাম্বুল থেকে একঘণ্টার উড়ানে পৌঁছনো যায় কায়সেরি, যেখানে কাপাডোকিয়ার এয়ারপোর্ট। কাকভোরে প্লেনে উঠতে হয়। অবশ্য সন্ধ্যার উড়ানেও যাওয়া যায়, সে যাত্রার ভাড়া বেশি। অতএব একদিন ভোর চারটেয় উঠে এয়ারপোর্ট যাওয়া স্থির হল। আরও সস্তায় যাওয়া যায় বাসে চড়ে— সারা রাত্রি ধরে। আমাদের সে ধকল সইবে না।

পাঁচটার আগেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম। কোথায় চেক-ইন করতে হবে খুঁজে পাই না। আমাদের এই যাত্রায় গাইড এবং গাড়ি আমাদের সঙ্গে থাকবে কায়সেরি থেকে। কায়সেরি পৌঁছতে হবে নিজেদের উদ্যোগে।

চেক-ইন কাউন্টার খুঁজে পেলাম। এত যাত্রী বুঝি পুজোর সময় হাওড়া স্টেশনেও হয় না। মানুষের জটলা, কোলাহল, এলোমেলো লাইন। ঠিক কিউতে দাঁড়িয়েছি কিনা বোঝা কঠিন। এ অব্যবস্থা আমাদের এয়ারপোর্টকে হার মানায়— দিল্লি থেকে বেসরকারি এয়ারলাইন্সে প্রস্থানের সময় যেমন হয়। কাউকে জিজ্ঞাসা করব— তার উপায় নেই। কে বুঝবে আমাদের ইংরিজি।

অধৈর্য অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজল যখন কাউন্টারে পৌঁছলাম। সুন্দরী মেয়েটি আমাদের টিকিট নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলল, দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম উইথ ইওর টিকেটস, আপনি টিকিট নিয়ে সেলস কাউন্টারে যান। কেন, কী অসুবিধা আমাদের টিকিটে, সেসবের জবাব দেবার সময় নেই সুন্দরীর। বলল, নেক্সট। পিছনে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও অধৈর্য, দুবার প্রশ্ন করবার সুযোগ নেই। সেলস কাউন্টার কোথায় জিজ্ঞাসা

করতে মেয়েটি বলল, পাশের উইংয়ে।

পিছনের ঠেলায় অস্থির হয়ে ভিড় ঠেলে মোটঘাট নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মোট বলতে সামান্যই। দুটো ছোট স্ট্রোলার মাত্র সঙ্গে। বাকি সব সম্পত্তি ইস্তাম্বুলে রেখে এসেছি। ভাগ্যিস; নইলে ওই ভিড় ঠেলে বেরোনোই কঠিন হত।

সেলস কাউন্টার খুঁজে পেতে বেশি দেরি হল না। খালিও ছিল কাউন্টার। সেখানের অধিকারী টিকিটদুটি ভালো করে দেখলেন, বললেন, হোয়াটস দ্য প্রবলেম? আপনি যান, চেক-ইন করুন, নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে। কোনও প্রবলেম নেই। সব ঠিক আছে।

আবার ফিরে গেলাম, সেই কাউন্টারের উদ্দেশে। সেখানে ভিড় কিছুমাত্র কমেনি। তাছাড়া কে কোন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে বোঝাও মুশকিল। এবং সব যাত্রীর সঙ্গেই প্রভূত মোটঘাট।

ঘড়ি বলছে পৌনে ছটা। ছটা পাঁচ, না দশে, আমাদের উড়ান। লাইন আর এগোয় না। আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি সবার শেষে। কী যন্ত্রণা বোঝানো মুশকিল। আমাদের সামনের যাত্রীরা অন্যান্য নানা স্থানে যাচ্ছিল। সব চেক-ইন হচ্ছে এই কাউন্টারে। বোকা সুন্দরী মেয়েটি আমাদের কী অনর্থক হয়রানি করল।

ছটা বাজল। কোনও আশা নেই প্লেন ধরবার। হোটেল, ডে ট্যুর বুক করা আছে কাপাডোকিয়াতে। সব বৃথা যাবে। আমাদের হাতে সময় নেই এত যে আবার কাল যাবার আয়োজন করব। তাছাড়া নতুন করে আবার টাকা দিয়ে আয়োজন করবার সামর্থ্যও নেই।

এমন সময় পরিত্রাতা মধুসূদন নারী-বেশে উদয় হলেন। তিনি কাউন্টারের পিছন থেকে চিৎকার করে বলতে লাগলেন কায়সেরি (এবং অন্য একটি জায়গার নামও বললেন) যাবার যদি কেউ থাকেন তো এগিয়ে আসুন।

কাজটা সহজ নয়। কাউকে সরিয়ে, কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কারও সুটকেসে হোঁচট খেয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। মনে ভয় উনি আবার কী প্রবলেমের কথা বলবেন। তিনি আমাদের টিকিটদুটি হাতে নিয়ে দ্রুত কোথায় যেন চলে গেলেন। আমরা আশঙ্কা করছি উনি আবার কী খবর দেবেন। আজকের যাত্রাটা যন্ত্রণায় শেষ হবে। কিন্তু তিনি ফিরে এলেন দুটি বোর্ডিং পাস হাতে নিয়ে এবং আমাদের বললেন, অবিলম্বে চলে যান, উড়ানের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। যাত্রীরা প্লেনে উঠে পড়েছেন। যান, দ্রুত। জিজ্ঞাসা করব, তবে কেন আমাদের এত হয়রান করা হল, তার সুযোগ দিলেন না মহিলা। প্রায় বিরক্ত গলায় বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান। দেরি করলে প্লেন ধরতে পারবেন না।

এবারে সদর্পে, কারও সুটকেস মাড়িয়ে, কারও পায়ের ওপর দিয়ে, প্রভূত ঠেলাঠেলি করে ভিড় সরিয়ে দৌড়লাম। প্লেনে উঠেও পড়লাম।

ঘণ্টাখানেক পরে কায়সেরিতে নেমেছিলাম। বেরিয়ে দেখি আমাদের নামের প্ল্যাকার্ড নিয়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদের গাড়ির চালক। এর পর তো নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে পা ফেলে হাঁটা।

ষাট কিলোমিটার দূরে আমাদের হোটেল। চালক হুসেন একটা স্টেশন ওয়াগানে আমাদের বসিয়ে রওনা দিল। একঘণ্টা লাগবে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে।

কায়সেরি ছোট শহর। চমৎকার মসৃণ চওড়া রাস্তা। বাঁদিকে বরফের চূড়া নিয়ে এরসিয়েস পাহাড়। পুরনো আগ্নেয়গিরি। হুসেন বলল, এই পাহাড়ের ঢালুতে শীতকালে স্কি করা হয়। কিন্তু একদিন এটা আগ্নেয়গিরি ছিল। এখন অবসর নিয়েছে। পুবে এই এরসিয়েস আর পশ্চিমের হাসান আগ্নেয়গিরি একদা একসঙ্গে উদ্গীরণ শুরু করে। তার ফলেই কাপাডোকিয়ার আজকের চেহারা।

ঘটনাটা কয়েক লক্ষ বছর আগের। এরসিয়েস এবং হাসান দুটি আগ্নেয়গিরির ক্রোধে লাভায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বিশাল অঞ্চল, দুলক্ষ বর্গকিলোমিটার।

কালে লাভা শীতল হল। ঝড়জলে ভিজে সেই জমাট লাভার বিচিত্র রূপের সৃষ্টি আজকের কাপাডোকিয়া অঞ্চল। তখনও জানি না সে দৃশ্য কত বিচিত্র, কত অপ্রত্যাশিত। শুধু ছবি দেখেছি। ছবির সঙ্গে আসল জিনিসের এত তফাত হয়?

এখন দুপাশে শস্যক্ষেত্র, গম ভুট্টা, আরও কী খাদ্যশস্যের। মাঝে মাঝে ফলের বাগান। আপেল বাবুগোসা গাছ দেখছি সারি সারি। মাঝে মাঝে নাতিউচ্চ পাহাড় পার হচ্ছি। আকাশ নির্মল নীল।

যে ছোট শহরে পৌঁছলাম, তার নাম গোরেম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। ছোট ছোট দোকানপাট। সামান্য লোকালয়। আমাদের গাড়ি ছেড়ে এখানে ট্যুর কোম্পানির অফিসে বসতে হল কিছুক্ষণ। হোটেল এখান থেকে অনেক দূর। অল্পক্ষণ পরেই একটি মাঝারি সাইজের কোচ এসে পৌঁছল। ভেতরে কিছু যাত্রী বসে আছেন। এঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে ট্যুরে যাবেন।

পরিচয় হল। পাকিস্তান থেকে এসেছেন চারজন। তাঁদের বাড়ি লারকানায়। মাঝবয়সী কর্তার কদমছাঁট চুল। তাঁর স্ত্রী সম্পূর্ণ কালো বোরখায় ঢাকা। দুটি মেয়ে। ছোটটি স্কুলে পড়ে। বড় ডাক্তারির দ্বিতীয়বর্ষে। সে মেয়েটি ভালো ইংরিজি বলে, মিশুকে। আমাদের সঙ্গে খুব গল্প জুড়ে দিল। মনে হচ্ছিল, তার মা কথা বলতে উৎসুক। কিন্তু বোরখার আড়াল থেকে বেরোতে পারছেন না। চারজনের একটা দল অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন। কর্তা গিন্নি মেয়ে এবং তার বন্ধুকে নিয়ে ভ্রমণে বেড়িয়েছেন। গাড়ি চালাচ্ছে হুসেন, যে আমাদের কায়সেরি বিমানপত্তন থেকে এনেছিল। মানুষটা আমাদের সবকিছু দেখাতে, বোঝাতে চায়। বলল, যেখানে আমরা প্রথম যাচ্ছি তাকে আমরা বলি ভ্যালি অব ইমাজিনেশন। কেন বলি একটু পরেই বুঝতে পারবেন।

ইতিমধ্যে খানিকটা উঁচুতে উঠছি, পাহাড়ি পথ দিয়ে। পাহাড়ি পথ বলতে পাহাড়ের পথ। কিন্তু অতি সযত্ন রক্ষিত। দুপাশে ক্রমশ গাছপালা কমে আসছে। এবারে দুধারে কিছু উদ্ভট আকারের পাথর বা পাহাড়ের চূড়া দেখা গেল।

কোচ থামল যেখানে, নেমে দেখি কোনও অপরিচিত জগতে এসে পৌঁছেছি। হুসেন বলল, এবারে আপনি মনে করে নিতে পারেন, কিসের মতো দেখতে এই পাহাড়। ওই দেখুন, মনে হচ্ছে না কি, গলা উঁচু করে উট চলেছে? আর এপাশে কী বলুন তো?

চেনা কোনও পরিচিত ছবির সঙ্গে মিল পাচ্ছিলাম— ওটা কি পরাজিত নেপোলিয়নের মূর্তি?

হুসেন বলল, আমরা সবাই নানাভাবে দেখি কল্পনায়। তাই নাম ভ্যালি অব ইমাজিনেশন। ছোট-বড় পাথরে তৈরি পাহাড়ের অংশগুলি একেবারে অন্যরকম দেখতে। একসারি উঁচু ঢিবি পাহাড় অন্য রঙের একটা পাথর মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের এমন চেহারা বুঝি কেবল এখানেই দেখা যায়। পাশে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামা যায়, সেও অলৌকিক ওই পৃথিবীর অংশ। সারি সারি ছোট-বড়, কমবেশি উঁচু ঢিবি। ওই যে অন্য রঙের টুপি পাহাড়ের মাথায়, ওটা ওই ঢিবির আচ্ছাদ্য অংশ।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ এবং তারপরে হাওয়া ও বৃষ্টির তাড়নায় পাহাড়গুলির এমন রূপ হয়েছে। যেন কোনও উন্মাদ ভাস্করের কীর্তি। যে দিকে চাই, একই ধরনের রকমফের পাহাড়, যেন অলৌকিক কোনও ভাস্কর্য দেখছি।

এখান থেকে আমরা যাব আরেক অঞ্চলে সেখানেও বিচিত্র মূর্তির জটলা। এখানের মূর্তিগুলি আরও বড়। একই ধরনের, তবু ভিন্ন। পরপর পাহাড় পার হয়ে উপত্যকায় নামছি। ঢিবিগুলি ছোট নয়, বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু।

দ্বিপ্রহরের ভোজনের আয়োজন করেছিল আমাদের ট্যুর এজেন্সি। আয়োজন ভালো ছিল। আরও ভালো লেগেছিল নানা প্রকার ফলের জন্য। তার ব্যবস্থাও প্রভূত। কিন্তু সবার থেকে

ভালো লেগেছিল, ভোজনশালার অবস্থান। খাবারঘরের জানলার পাশ থেকেই পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে উপত্যকায়। সেখানেও সেইসব অলৌকিক প্রাকৃতিক নির্মাণের ব্যাপ্তি।

ভোজনের পর বিশ্রামের সময় নেই। আমরা এবার চলেছি কেভ চার্চ দেখতে। কাপাডোকিয়া অঞ্চলে অনেকগুলি এমন লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন চার্চ আছে। এগুলি নির্মাণ হয়েছিল সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। খুব বড় গুহা বলতে পারি না, কিন্তু বিস্ময়কর ফ্রেস্কো— প্রাচীরচিত্র। যিশুর জীবনের নানা ঘটনার চিত্রায়ন বহু রঙের কাজে। এবং আশ্চর্য, অনেক ক্ষেত্রে হাজার বছরের রঙিন কাজ এখনও অবিকৃত আছে।

প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক— এমন দুর্গম স্থানে মানুষের নজরের বাইরে এইসব গুহা কেন তৈরি হয়েছিল, কারা করেছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রসারের ইতিহাস বলে রোমানরা তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, তার প্রচার শুরু করে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীও অনেক ছিলেন, তাঁরা সর্বত্র গির্জা ধ্বংস করতেন এবং এই ধর্মপ্রচারে বাধা দিতেন। তখন খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা বিধর্মীদের আক্রমণ বাঁচাতে এইসব গোপন গির্জা তৈরি করেছিলেন। তারা এতই গুপ্ত ছিল যে দূর থেকে গুহামুখ দেখাই যেত না।

আমরা গোরেম ওপেন এয়ার মিউজিয়ামের পাশে একটি গির্জায় গিয়েছিলাম। ঢালু কাঁকুরে পথ থেকে খানিকটা নীচে নামতে হল। গির্জার প্রবেশদ্বার কোথায় দেখতে পাওয়া যায় না। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে ডানদিকে একটু চড়াই ভাঙতে হল। তখনও গির্জার ছোট দরজা দেখতে পাওয়া যায় না। গির্জার ভেতরে আলো প্রবেশ করে না। বিজলির আলোয় প্রথম যে হল-এ পৌঁছলাম, তার মাপ তিরিশ বাই চল্লিশ ফুট হবে। তারপর আরও দুটি অনুরূপ হল। আমার ক্যামেরায় সেই আশ্চর্য ছবি নেওয়া গেল না। এই গির্জার উপযুক্ত নাম হিডন্ চার্চ।

সেই ভোরে বেরিয়েছি। কোথাও শোওয়া বসা নেই। আমার শরীর আর বইছিল না।

হুসেনকে বলতে, সে আমাদের আলাদা নিয়ে চলল হোটেলে পৌঁছে দেবার জন্য। অন্য যাত্রীরা আরও খুঁটিয়ে দেখছিলেন। পাকিস্তানি মেয়েদুটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারাও আমাদের সঙ্গে ফিরতে চাইল। কিন্তু তাদের হোটেল আবার অন্য কোনও জায়গায়। আমাদের সঙ্গে আসতে চাইল না।

জানতাম আমরা কেভ হোটেলে থাকব। কিন্তু সেটা যে অভিনব, অন্য কী কারণে তার রূপ কল্পনা করতে পারিনি। এখন চূড়াগুলির গায়ে মস্ত মস্ত ফোকর, গুহামুখ প্রকৃতির তৈরি করা। একদা অনেক গুহাতে মানুষ বাস করত। এখন তারা নীচের উপত্যকায় নেমে বাড়িঘর করে আছে।

আমাদের হোটেলের নাম সারিহান। আসলে কেভ হোটেল। পাহাড়ের বিভিন্ন ধাপে গুহা নিয়ে আমাদের হোটেল। কুড়ি পঁচিশটি ঘর বা গুহা আছে। গুহার সামনে পাথরের গাঁথনি করে হলঘর তৈরি করা হয়েছে। ওই হল থেকে গুহায় ঢুকতে হবে। যে গুহাতে আমরা থাকব, যাবতীয় সুবিধা আছে সেখানে। এয়ারকন্ডিশনিং নেই, দরকার হয় না। গুহার ভেতর খুব শীতল। কৃত্রিম হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে। শীতকালে গরম করা হয় ঘর, তার ব্যবস্থাও আছে। বাথরুম সম্বলিত, ঠান্ডাগরম জলের ব্যবস্থা। এককথায় আজকের যাবতীয় প্রয়োজন মেটায়। ঘরের দেওয়াল এবড়োখেবড়ো পাথরের, তার ওপর কলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভালো বিছানা। ব্রেকফাস্ট হবে বাইরের ছাদে।

ছাদে উঠে চিত্ত বিহ্বল হয়ে উঠল। যেহেতু হোটেল কিছুটা উঁচুতে, তিনদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখা যাচ্ছে, সব জুড়ে আছে ওই বিমূর্ত কীর্তিগুলি।

আজকের ট্যুর শেষ হয়েছে। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে নীচের রেস্টুরেন্ট বা বাজারে। আমরা ক্লান্ত। কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। হোটেলের মালিক সপরিবার এখানে থাকেন। তাঁকে বললাম, এখানেই ভোজনের কথা। তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, সে কী, খাবার দেবার তো কথা নেই।

আমরা বললাম, সেকথা জানি, কিন্তু দাম দিলে ব্যবস্থা করা যায়? ভদ্রলোক বললেন, নিশ্চয় করা যায়। এখনই ব্যবস্থা করছি। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ডিনার তৈরি হয়ে যাবে।

এইসব গুহা হোটেল আসলে পাঁসিওর মতো। থাকার আয়োজন এবং প্রাতরাশ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না।

মালিক বললেন, তাঁর মা রান্না করবেন।

ডিনারের আগে চা-পর্ব সারা হল আমাদের ঘরের সামনের ছাদে। ক্রমে আলো কমে এল। ছাদেই পানীয়ের আয়োজন হল। হুইস্কি দেখে হোটেল মালিকও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন। রাত্রে ভোজন হল নীচের বসবার ঘরে। এখানে আহারের ঘর নেই। নিচু সোফায় বসে ভোজনে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু মালিকের মায়ের আশ্চর্য রান্নার হাত। স্যুপ ছিল এবং সালাদ। মেষমাংসের কাবাব খুব উত্তম বলতে পারি না। কিন্তু তুর্কিরা কোফতা বলে যে কিমার ব্যঞ্জন খায়, সেটির স্বাদ অপূর্ব। শেষে আমাদের অতি পরিচিত কাস্টার্ড পুডিং এবং কফি। এমন পরিপূর্ণ আয়োজন। কিন্তু জানি না কত খরচ নেবেন হোটেল মালিক এই বাবদ। তার জন্য সামান্য অস্বস্তিও ছিল।

রাত্রে গুহার ভেতর আরামদায়ক শয্যায় আদিম মানুষের গুহাবাসের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গুহার ভেতরে বেশ ঠান্ডা। লেপ মুড়ি দিয়ে পরিপাটি নিদ্রা হল। সকালে প্রাতরাশ শেষ হতে না হতেই হুসেন এসে গেল। কিঞ্চিৎ নিরাশ হতে হল। তুরস্কে নানা স্থানে থেকেছি। কিন্তু এই প্রথম প্রাতরাশে অলিভ অনুপস্থিত। অলিভের ব্যাপক চাষ হয় তুরস্কে। অলিভের অনুষঙ্গ ছাড়া কোথাও প্রাতরাশ হয়েছে মনে পড়ে না। অলিভ আমাদের পছন্দের জিনিস।

কোচে উঠে বসলাম। কালকের দলই বলা চলে, আমাদের দলের দুজন ছাড়া, তাঁরা আজ নিজেদের উদ্যোগে পাহাড়ের মাথায় একটি হ্রদ আছে, তাই দেখতে গিয়েছেন।

আবার সেই পরিচিত পথ দিয়ে চলেছি। দুধারে কোন অন্য গ্রহের কারিগরের তৈরি বিশালাকার মূর্তি। তিন চার কিলোমিটার যাবার পর হুসেন বলল, আজকের প্রোগ্রামে আছে একটা ট্রেক, অর্থাৎ পদযাত্রা। হাঁটতে হাঁটতে চাষের খেতের মধ্য দিয়ে, ফলের বাগান পার হয়ে খানিকটা নীচে নেমে আমরা পৌঁছব এক গ্রামে ঘণ্টাদুয়েক পর। সেখান থেকে আবার কোচে রওনা হব।

আমরা হাঁটতে চাইলাম না। হুসেন আমাদের নিয়ে ওই গ্রামে চলল। সেখানে আমরা বসব ঘণ্টাদুয়েক, তারপর পদযাত্রীরা এসে পৌঁছলে আবার কোথাও যাওয়া হবে।

আমরা দুজন একটা বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে চেরি গাছের তলায় দুটি চেয়ার নিয়ে বসলাম। আশপাশের ছোট একতলা বাড়িগুলি দেখছি, কয়েকটা গুহাতেও মানুষের বাস আছে দেখলাম। বাড়ির মালিক একটা দোকান চালান, চা কফি কোক পেপসি এবং কিছু সুভেনির পাওয়া যায় সেখানে। দু-চারটে চড়ুই ঘুরে বেড়াচ্ছে। হুসেন আমাদের একগুচ্ছ চেরি দিয়ে গেল গাছ থেকে ছিঁড়ে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। কয়েকটা মেয়ে নীচের কল থেকে জল নিয়ে ওপরে উঠছে। অতি শান্ত জীবনযাত্রা। পাশে একটা আখরোট গাছে ফল ধরেছে। কাঠবিড়ালিরা তার আহরণে ব্যস্ত।

দুয়েকটা সুভেনির কিনলাম। জানি আরও দরদস্তুর করলে সস্তায় হত। এই শান্ত সকালবেলায় তর্কে যেতে ইচ্ছা করল না।

হইহই করতে করতে পদযাত্রীর দল ফিরে এল। আবার বাসযাত্রা হবে। তাঁরা আঙুরের বাগান এবং অন্যান্য শস্যের খেত দিয়ে এসেছেন। পথে একটা শিয়াল দেখেছেন। তাকে নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা।

কোচে উঠে পড়া গেল। আবার সেই অদৃষ্টপূর্ব গ্রহের মধ্য দিয়ে যাত্রা। আমরা আবার গেলাম গোরেম ওপেন এয়ার মিউজিয়াম। প্রায় এক কিলোমিটার ছড়ানো মিউজিয়াম। নানা

প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যে সাজানো।

তুরস্কে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের অভাব নেই। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। কৃষিকাজে পটু মানুষ যে কয়টি জায়গায় প্রথম দেখা গিয়েছিল, তুরস্ক তার মধ্যে একটি। এই কাপাডোকিয়া অঞ্চলেই পাঁচ হাজার বছরের প্রত্নচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আগ্নেয়গিরির নিষ্ক্রিয়তার বহুযুগ পরে এখানে মানুষ বাস করা শুরু করেছিল। বিচিত্র আকারের পাথরের স্তম্ভগুলিতে জলহাওয়ায় গুহার সৃষ্টি হয়েছিল স্থানে স্থানে। সেখানে মানুষ প্রকৃতির তৈরি বাসস্থান পেয়েই গিয়েছিল। এই পাথর নরম, অল্প পরিশ্রমে কাটা যায়, সুতরাং গুহাগুলি মানুষ প্রয়োজনমতো বড় করে নিয়েছিল। এখনও কিছু মানুষ স্থানে স্থানে পরিবর্ধিত গুহাতে বাস করে। বেশিরভাগ যদিও নেমে এসেছে পাহাড়ের নীচের সমভূমিতে।

তুরস্কের আধুনিক ইতিহাসও চমকপ্রদ। গত দুহাজার বছরে তাদের পর গ্রিক, রোমান, সেলজুক এবং শেষে অটোমান তুর্কিরা এই দেশে রাজত্ব করেছে। রোমানরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর এখানে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ শুরু হয়। কিন্তু অন্য বিধর্মীরা তাদের সহ্য করতে পারত না। তাই খ্রিস্টানদের উপাসনার স্থান গোপন রাখতে হত। গুহার গভীরে লুকোনো অনেক গির্জা কাপাডোকিয়ায় ছড়িয়ে আছে। গুহার প্রবেশদ্বারও আড়াল করে রাখা হত, যাতে আক্রমণকারী শত্রু সেই গির্জার খোঁজ না পায়। অনেক গির্জার ভেতরে ভক্তদের দ্বারা আঁকা ফ্রেস্কো প্রাচীরচিত্র এখনও দেখা যায়। ওপেন এয়ার মিউজিয়ামের একপাশে খোলা সমভূমি থেকে খানিকটা ওপরে উঠে পাহাড়ের একপাশে আমরা হিডন্ গির্জা কাল দেখেছি।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে এবার নদীর অপর পারে। অনেকখানি নীচে নেমে এলাম, নদীর ওপর খুব নিচু সেতু পার হয়ে যে শহরটিতে ঢুকলাম তার নাম আভানোস, ছবির মতো সুন্দর। প্রচুর গাছপালায় সবুজ। সব বাড়ির সামনে কিছু রঙিন কারুকার্য করা। আমরা চলেছি একটি কারখানা দেখতে, সেখানে নানা সেরামিক বস্তু তৈরি হয়। চাক ঘুরিয়ে কুমোর বিভিন্ন আকৃতির বাটি ঘটি ঘড়া থালা তৈরি করছে। তারপর কিলনে চড়িয়ে তাতে রং দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে দুই যাত্রী কুমোরের চাকে হাত লাগিয়েছিলেন, তাঁদের হাতে যা তৈরি হল তা শিব গড়তে বানর। এই শহর সেরামিকের কাজের জন্য বিখ্যাত।

এবারে দিনের শেষ প্রোগ্রাম। মাটির নীচে শহর। এমন শহর সাঁইত্রিশটি আছে কাপাডোকিয়ায়। আমরা একটি বড় শহর দেখব। মাটির নীচে আটতলা পর্যন্ত খনন করা গিয়েছে। হয়তো নীচে আরও আছে।

বাজার অঞ্চলের ভেতর দিয়ে অকিঞ্চিৎকর প্রবেশদ্বারে পৌঁছলাম। সামনে প্রথমে একটা ছোট্ট হল বা বড় ঘর। ঘরের একপাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। সম্ভবত খ্রিস্টানরা শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য এই ভূগর্ভ শহর তৈরি করেছিলেন। সেও বারো চোদ্দশো বছর আগের ঘটনা। প্রথম খ্রিস্টানদের নিরাপদ ধর্মাচরণ, প্রার্থনার জায়গা। পরে ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে আরব আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিরাপদ আশ্রয়। পাঠশালা, পাকশালা, ভাঁড়ার ঘর, শোবার ঘর, ভোজনের স্থান। মদ তৈরির ঘর, অস্ত্রাগার, পালিত পশু রাখবার ঘর, শৌচাগার, বায়ু চলাচলের সুড়ঙ্গ বা নালি। সর্বোপরি গির্জা এবং উপাসনাকক্ষ বিভিন্ন তলায়। এই শহরের নাম ডেরেনকুয়ু।

ডেরেনকুয়ুর গির্জায় কোনও প্রাচীরচিত্র নেই। শুনেছি কয়েকটি ভূগর্ভ শহরের গির্জা ফ্রেস্কোতে অলংকৃত।

নীচের তলায় পালিয়ে যাবার গোপন দরজা। দরজা অর্থে মস্ত জাঁতাকলের মতো গোলাকার একখণ্ড পাথর। এমন দরজা সুড়ঙ্গের প্রবেশের দিকেও আছে। ভেতর থেকে না খুললে সেই বিরাট পাথর সরানো যায় না। শত্রুকে আটকাবার বন্দোবস্ত।

সুড়ঙ্গ অতি সংকীর্ণ। উঁচুতে পাঁচ ফুট, স্থানে স্থানে তারও কম। মাথা উঁচু করে যাওয়া যায় না। ঘাড় নিচু করে থেকে ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি। তারই মধ্যে উঁচু-নিচু সুড়ঙ্গ এবং মাঝে মাঝে সিঁড়ি। কোথাও কিছু ধরবার নেই। দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটু দম নেব, তাও কঠিন। দেওয়াল এবড়োখেবড়ো রুক্ষ পাথরের। সমভূমির ষাট সত্তর ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। আমরা সাতটি তলা দেখলাম। তার নীচে আর খনন করা হয়নি। হয়তো আরও কয়েকতলা আছে সেখানে।

এইরকম ভূগর্ভের শহরে, অনুমান করা হচ্ছে, দুহাজার মানুষ থাকতে পারতেন।

আমরা বছর দুই আগে ভিয়েতনাম গিয়েছিলাম। সেখানে দক্ষিণ ভিয়েতনামে হো চি মিন সিটির (যার নাম ছিল সায়গন) উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত গেরিলা সৈন্যদের সুড়ঙ্গ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। এই তো সেদিনের ঘটনা, এখনও অর্ধশতাব্দী হয়নি। আর, এখানে কাপাডোকিয়ায় যে সুড়ঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি সেটা তৈরি হয়েছিল বারোশো বছর আগে। তখন মানুষের কোনও যন্ত্র ছিল না। খনন করবার, পাথর কাটবার হাতিয়ারও আদিম ছিল। তা সত্ত্বেও মানুষের এই কীর্তি দেখে বাকরোধ হয়ে যায়।

ইলেক্ট্রিক আলো ছিল বলে আমরা এই সুড়ঙ্গে চলাফেরা করতে পেরেছি। কী করত প্রাচীন মানুষেরা, কেমন করে এই অন্ধকূপে বাস করত দুহাজার মানুষ? কত বছর লেগেছিল একটা ভূগর্ভের শহর তৈরি করতে, কত শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করেছিল, কোথায় নিয়ে ফেলল ভূগর্ভের মাটি ও পাথর? এইসব নিয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করছেন। আমরা একটি শহর দেখেই চমৎকৃত।

এবারে হোটেল ফিরে গেলেই হয়। কিন্তু তার আগে হুসেন বলল, আমরা একটা পুরনো গ্রিক ও তুর্কি গ্রাম দেখব। এখন অবশ্য অতি সামান্য সংখ্যক গ্রিক বাসিন্দা আছে তুরস্কে। একদা গ্রিকদেরই আধিপত্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে, গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যে ঐতিহাসিক বাসিন্দা বিনিময় হল। দশ লক্ষাধিক স্থায়ী গ্রিক অধিবাসী তুরস্ক ছেড়ে মাতৃভূমিতে ফিরে গেলেন এবং কমবেশি পাঁচ লক্ষ তুর্কি তুরস্কে ফিরে এসেছিলেন।

আমরা যে গ্রাম বা ক্ষুদ্র শহরটি দেখতে গেলাম সেখানে গ্রিকদের পুরনো বাড়ির বিশেষত্ব ছিল প্রবেশদ্বারের দেওয়ালের ভাস্কর্য। পাথরের তৈরি বাড়িঘর। এখন সেখানে তুর্কিরা বাস করে। শহরের আগে গ্রিক নাম ছিল সিনাসস, এখন নাম হয়েছে মুস্তাফাপাশ।

শহরের উপকণ্ঠে সেন্ট বেসিল চার্চ পাহাড় কুঁদে তৈরি করা— যেমন আমাদের ইলোরা। গির্জার ভেতর বহুবর্ণ ফ্রেস্কো, যেমন আছে অজন্তায়। কিন্তু এখানে প্রায় অবিকৃত, যদিও অজন্তা ও সেন্ট বেসিল গির্জা প্রায় সমসাময়িক।

রাতে ইচ্ছা ছিল বাজার অঞ্চলে নেমে কোনও ছোট রেস্টুরেন্টে আহার করব। আজ আর মালিকের মাকে কষ্ট দেব না।

সন্ধ্যায় ছাদে বসে পানের আসরে বাধা পড়ল। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। অতএব গুহার ভেতর ফিরে যেতে হল। বজ্র-নির্ঘোষে বেশ বারিপাত হয়েছিল। বৃষ্টি যখন থামল তখন প্রায় নটা বাজে। আমাদের হোটেল থেকে অনেকটা নীচে বাজার। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। নীচে নামার ইচ্ছে হল না। আজ হরিমটর করেই চালাতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দেখি এক অপার্থিব ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চরাচর নানা কল্পনাতীত মূর্তিতে পূর্ণ। এক জায়গায় যেন তিনজন দীর্ঘদেহী রামমোহন দাঁড়িয়ে আছেন— তেমনই প্রলম্বিত পরিধান, মাথায় তেমনই টুপি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর এসে যায়। চাঁদের মায়ায় সব স্থির শান্ত।

কাল সকালে আমরা ফিরে যাব আমাদের পরিচিত জগতে। প্রাকৃতিক এই শিল্পকীর্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের আধুনিক শিল্পকলার প্রকাশ দেখব ইস্তাম্বুলে।

চাঁদের আলোয় এই অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় পৃথিবীকে বিদায় জানালাম।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

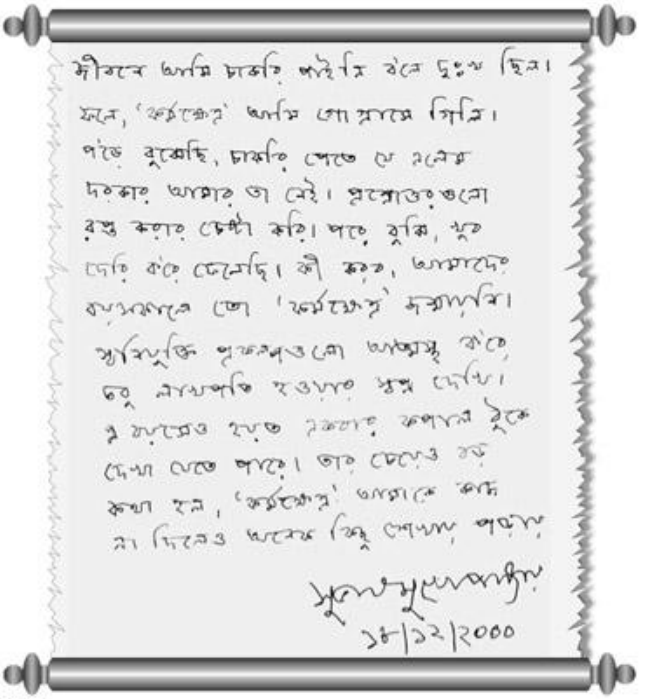

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোকলোর-বিদ্যা, তার বিপুল উপকরণের একটা বড় ভাগ ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বেঁক আর একটু ছন্দের দোলা দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য।

বিদেশেও হেঁয়ালির খেলা দেখতে পাই পার্লার গেমের মধ্যে। কিন্তু দেশ-বিদেশের ধাঁধা-হেঁয়ালির যত সঞ্চয় আজ স্তূপিত হয়ে উঠেছে তার প্রায়টাই পুরনো লোকস্মৃতি। লোকমুখের সেসব হেঁয়ালি-কথার ওপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায়নি।

।। ১ ।।
বন-জঙ্গলে ঘুরছি, হঠাৎ পেয়ে গেলুম।
বসে পড়ি, বসে খুঁজছি— কই সে? কোথা?
খুঁজে খুঁজে আর পাই নে, কী করি! অগত্যা
জঙ্গল থেকে বাড়ি বয়ে তাকে নিয়ে এলুম।

।। ২ ।।
জলে হাত ধুই— পড়ে না সে জলে, চলে না
গড়িয়ে।
গামছায় মুছি— আবোনা কাপড়, ধরে না
জড়িয়ে।

।। ৩ ।।
ছিলুম না কোনোদিনই,
হব হব, খালি ভাবি।
দেখে নি আমায় কেউই,
দেখবেও না কদাপি।
সকলেরই তবু আশা,
ভরসাও— মনে হয়,
আজ দিন কাটলেই
এসে যাব নিশ্চয়।

।। ৪ ।।
বসন্ত মাস ফূর্তিমন্ত,
জামাজোড়া পরি মহা আনন্দ।
তাপ বাড়ে, আর আরো জামা পরি,
আরো জামা পরি, উপরি-উপরি—

আর তারপরে আসে হী হী শীত,
হাওয়া কন্‌কন্, ছাওয়া কম্পিৎ—
কাঁপি ধ'রে বুকে, আর কোথা আছি!
জামাজোড়া খুলে, সব খুলে বাঁচি!

।। ৫ ।।
কাঁধাকাঁধি ক'রে ছেলেগুলো গেছে সক্কালে
হাট করতে,
বাপ বসে আছে ভেতরে সেঁদিয়ে কোনোমতে
বেঁচেবর্তে।

।। ৬ ।।
শত জল হোক,
আভিজে।
জঙ ধরল না
তাবিজে।
স্বর্গ আছড়ে
গর্জন ওঠে,
আমরা এখানে
কাঁপি যে!

।। ৭ ।।
দুধের সাদা,
বরফি সাদা,
তার চাইতেও
আর কী সাদা?

।। ৮ ।।
বসে ঘষে যায়, মুখে গিলে খায়,
কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে যায়।

।। ৯ ।।
হাত নেই, পাও নেই, তাও সে
ছেলে কোলে নেয় কোন্ সাহসে!

।। ১০ ।।
কারা ঢুকে আসে অপ্রতিহত?
ঘাসের চেয়েও অপরিযাপ্ত?
বরফের চেয়ে শুভ্র সফেদ?
সেরা খাওয়া— তাতে নেই মতভেদ?

।। ১১ ।।
দুটো পাথর-চাঁইয়ের পাঁচিল,
দুটো ভরা দিঘি কাছাকাছি,
দুটো জ্যান্ত কবরখানা,
দুটো বুনো গাছ ডাল টানা।

।। ১২ ।।
লোহা বাঁধ তুলে বাঁধা চারি ধার।
ভেতরে কী করে বইছে জোয়ার?

।। ১৩ ।।
কুলকুলানি গাছ-ঢুলানি
ডগায়মগায় ঘুম-বুলানি,
রঙ ধরতেই জিহ্বে চুষি—
ঝাঁকায় চেপে যায় রুপুসী।

।। ১৪ ।।
ছেড়ে আসা গাঁ—
তা নিয়েই ঘা,
মন-মন কেঁদে-
কেটে একশা!

।। ১৫ ।।
ভারি সুন্দর গাড়িটা গো মাসি
যত ডাকি, দাঁড় করো না গো, আসি—
ভেতরে লোকটা অমনি হুবুহু
খালি মাথা নাড়ে: উঁহু, উঁহু, উঁহু...

উত্তর:
(১) কাঁটা। *বিলিতি*। (২) শিশির আর রোদ। *মার্কিন*। (৩) আগামী কাল। *বিলিতি*। (৪) গাছ। *কানাডা*। (৫) কলা, কলাগাছ। *বাংলা*। (৬) হাঁসের পিঠ, সোনার তাবিজ, বজ্রগর্জন। *আরমেনিয়া*। (৭) দিনের আলো। *আইরিশ*। (৮) কলসি। *বাংলা*। (৯) মাদুর। *য়োরুবা*। (১০) ভয়, ঈর্ষ্যা, ভালোবাসা; শিশির; সত্য; দুধ।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে

প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা

শঙ্খ ঘোষ

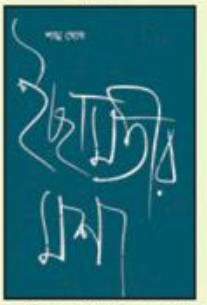

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

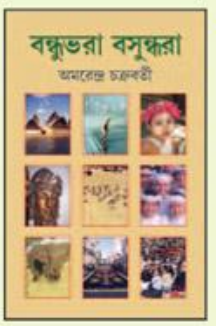

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
₹১৫০

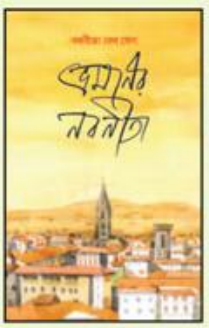

ভ্রমণের নবনীতা

নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

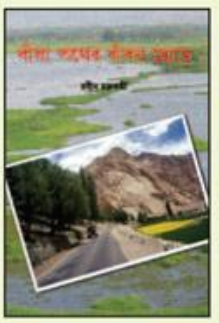

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

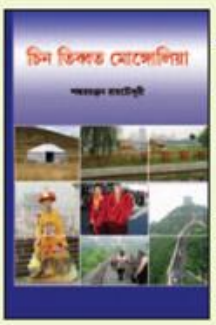

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। **₹৬০**

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগঅন করুন

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

দানিয়েল পেনাক-এর কিশোর উপন্যাস

নেকড়ের চোখ

মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ **মৈত্রেয়ী নাগ**

মানুষের চোখ

৮

— বিয়াম্মা, বিয়াম্মা, ও জেগে উঠছে!
— আলবাৎ উঠবে, কেননা আমি ওর সেবা করেছি।
— তা হলেও, এত শিগগির, আমি তো ভাবিইনি ...
— বিয়াব্বা, রদ্দিমাল, কবে থেকে আমি সেবাযত্নের কাজ করছি?
— কেন, ছোট্টবেলা থেকে, তা বছর পঞ্চাশ হবে!
— আর ক'জন সেরে ওঠেনি, বিয়াব্বা, বলতে পারো আমাকে?
— কেউ না, সক্কলে সেরে উঠেছে। প্রতিবারই, অলৌকিক ব্যাপার ...
— অলৌকিক নয়, বিয়াম্মার হাতের গুণ!
— সে যাই বলো, এই ছেলেটা, আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম মরে যাবে।
— হায় রে রদ্দিমাল, অন্য সক্কলের চেয়ে এ বেশি শক্তপোক্ত, একশো বছর বাঁচবে!

কিছুক্ষণ ধরেই আফ্রিকা ঘুমের মধ্যে এইসব ফিসফিস, আর সেইসঙ্গে মৃদু হাসির শব্দ শুনছিল। এখন চোখ মেলে চাইল।

— বিয়াম্মা, ও চোখ খুলছে!
— চোখ যে খুলছে, সে আমি ভালোই দেখতে পাচ্ছি। নারকোলের দুধটা দাও।

আফ্রিকা খেয়ে নেয় দুধটুকু। ঠান্ডা, ঘন, মিষ্টি আর সামান্য টক একটা তরল। ওর বেশ লাগে।

— মনে হয় ওর ভালো লেগেছে।
— ভালো যে লেগেছে, সে আমি ভালোই দেখতে পাচ্ছি, বিয়াব্বা, মালাটা একদম খালি করে দিয়েছে। আফ্রিকা আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়বার যখন ও জেগে উঠল, তখন বাড়িটা ছিল ফাঁকা। তবু, ও শুনতে পেল কে যেন ওকে উদ্দেশ করে বলছে:

— এই যে, নমস্কার।

একটা ছোট্ট, ধাতব নাকি-নাকি স্বর, যা বেরচ্ছিল একটা অদ্ভুত দর্শন

পাখির গলা থেকে, লাল লেজ, হালকা নীল রং, ঠোঁটটা যেন বাদাম ভাঙার জন্যই তৈরি হয়েছে। পাখিটা বসেছিল একটা মাটির কলসির ওপর।

— নমস্কার, উত্তর দেয় আফ্রিকা, কে তুমি?
— আমি টিয়েপাখি, আর তুমি?
— আমি রাখাল ছিলাম, ব্যাপারিও ছিলাম, মানে পুরোপুরি নয় ...
— ওই দ্যাখো, বলে ওঠে টিয়েটা, বিয়াব্বার মতো। তুমিও বোধহয় শেষমেশ তেনার মতো চাষবাসই করবে।
— আমি বেরোতে পারি? জিজ্ঞেস করে আফ্রিকা।
— নিজের ঠ্যাংয়ের ওপর যদি খাড়া দাঁড়াতে পারো, তো ঠেকাচ্ছে কিসে?
খুব সাবধানে উঠে দাঁড়ায় আফ্রিকা। সাবধানতার অবশ্য দরকার ছিল না, ও সেরে উঠেছিল। দুর্ঘটনায় জীবনের যেটুকু হারিয়ে গেছিল, সবটা যেন ঘুমের মধ্যে ওর ভেতরে ফিরে এসেছে। তখন ও আনন্দে চিৎকার করে উঠে দৌড়ে বেরোল বাড়ি থেকে। কিন্তু ওর চিৎকার নিমেষে পরিণত হল আর্তনাদে। বাড়িটা কতগুলো খুঁটির ওপর বসানো ছিল, ও ঝাঁপ দিয়েছে একেবারে শূন্যে। আফ্রিকা চোখ বুজে ফেলে মাটির সঙ্গে ধাক্কা লাগার অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু ঘটেছিল আর কিছু। দুটো বিশাল হাত, অবিশ্বাস্য শক্তিতে লুফে নিয়েছিল ওকে, ওর মনে হয়েছিল, যেন ছাগলদের রাজার বিছানার মতোই চওড়া, লোমশ, গদি আঁটা একটা বুকের মধ্যে কেউ পিষে দিল ওকে। তারপর এমন জোরে এক অট্টহাসি শুরু হল, যে বনের সব পাখি উড়ে গেল।
— বিয়াব্বা, একটু আস্তেও তো হাসতে পারো!
— এই রে, ঘুমনোর সময় কি অত খেয়াল থাকে!
সমস্ত বনটা চেঁচামেচি করে আপত্তি জানাচ্ছিল।
— বিয়াম্মা, এই দেখো, পুরোপুরি সেরে গেছে।
বিয়াব্বা আফ্রিকাকে হাতে করে নাড়াচ্ছিল, ওকে তুলে ধরে দেখাচ্ছিল খুব ছোট্টখাট্টো এক বুড়িকে, বনের গহন থেকে বেরিয়ে আসছিল সে।
— তা নিয়ে এত হুলস্থুল করার দরকার নেই, বিয়াব্বা, আমি ভালোই দেখতে পাচ্ছি ও সেরে গেছে।
আফ্রিকা গোল গোল চোখ মেলে চাইল। বৃদ্ধার পিছন পিছন আসছিল দৈত্যাকার এক কালো গোরিলা, তার মুণ্ডুটা ছুঁচোল। তার হাতে ছিল একগাদা গোলাপি পেঁপে, যা কিনা শ্রেষ্ঠ ফল এবং শ্রেষ্ঠ ওষধি।
— আশ্চর্য, বলে উঠল গোরিলাটা, বিয়াব্বার মাথায় আর কোনওদিনই ঢুকল না যে তুমি সব্বাইকেই সারিয়ে তোলো।
— চুপ কর ভোঁদাই, জবাব দেয় বিয়াম্মা, আমাকে খুশি করার জন্য ও অবাক হবার ভান করে।
— অ! তাই বলো, বলল গোরিলা।

৯

বিয়াব্বা আর বিয়াম্মার চার পেয়ে বাড়িটা ছিল ঘন সবুজ বনের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গার ঠিক মাঝখানটায়।
— বাড়ির তলায় খুঁটি কেন? জানতে চেয়েছিল আফ্রিকা।
— সাপখোপ যাতে বাড়ির ভেতর না ঢুকে পড়ে, খোকা।
চতুর্দিকে বনের সবুজ গাছগাছালির দেওয়াল, এমন উঁচু যে, মনে হবে যেন সবুজ দিয়ে তৈরি কোনও গভীর কুয়োর মধ্যে ঢুকে পড়া গেছে।
বিয়াব্বা আর বিয়াম্মা আফ্রিকার যত্ন নিয়েছিল, ওকে খাইয়েছিল। কোনও প্রশ্ন করেনি। কাজ করতে বাধ্য করেনি।

দিনেরবেলা, ওরা ব্যস্ত থাকত বাড়ির আশপাশ আর গাছপালা নিয়ে। রাত্রিবেলা নানা বিষয়ে আলোচনা করত। ওরা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। গোটা সবুজ আফ্রিকার যাবতীয় মানুষ এবং জীবজন্তুদের ওরা চিনত। তিন আফ্রিকা এবং অন্য জগতের সর্বত্র ওদের সন্তানসন্ততি আর আত্মীয়স্বজনেরা ছড়িয়েছিল।
— অন্য জগৎ, সে আবার কী?
আফ্রিকার এই প্রশ্নের জবাব দেবে বলে বিয়াব্বা সবে মুখ খুলেছে, এমন সময় ডাল ভাঙার আর পাতা ঘষটে যাওয়ার একটা বিরাট ধপাস আওয়াজ তাকে বাধা দিল। শব্দটা খুব কাছ থেকে আসেনি, কিন্তু যে গাছটা পড়ল সেটা এত বড় ছিল যে, তার পড়ার শব্দ নির্ঘাৎ বনের সব জায়গা থেকে শোনা গেছে। তারপর বেশ খানিকক্ষণ সবাই চুপ, শেষে বিয়াব্বা বলেছিল:
— অন্য জগৎ? মনে হচ্ছে শিগগিরই আমরা অন্য জগতে চলে যাব।
— চুপ করো তো, বলেছিল বিয়াম্মা, বাচ্চাটার মাথায় এইসব চিন্তা ঢুকিও না।

কেউ না বললেও, আফ্রিকা বিয়াব্বা আর বিয়াম্মার কাজে হাত লাগিয়েছিল। ওদের সঙ্গে ও বনের ফল পাড়তে যেত, আর শনিবার করে তিনজনেই কাছের ছোট শহরের হাটে যেত। বিয়াব্বা, সে ছিল একজন চোস্ত ব্যাপারি, গলা ফেঁড়ে ফল বিককিরি করত। লোকে বিয়াম্মাকেও দেখাতে আসত, সে বলতে গেলে বিনা পয়সায় প্রায় সব অসুখই সারিয়ে দিত। কিন্তু ওইটুকু সময়ে যে সবচেয়ে বেশি নাম কিনেছিল, সে হল আফ্রিকা।
কেনাকাটা শেষ হতে না হতেই, সক্কলে এসে ভিড় করত ওর চারপাশে।
— বেশ বলে না?
— কী দারুণ গল্প বলে, তাই না?
— হ্যাঁ, তা বটে, বলে ভালো!

— আর তোরটা, তোর জীবনের গল্পটা, বলবি না আমাদের?
বিয়াব্বা যেদিন এই প্রশ্নটা করেছিল, সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। আর সে কি বৃষ্টি! জীবনকথা বলার মতো আবহাওয়াই বটে। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বিয়াব্বা আর বিয়াম্মা আফ্রিকার গল্প শুনছিল।
— তোর তাহলে, বাবা নেই? আফ্রিকার বলা শেষ হলে জানতে চেয়েছিল বিয়াব্বা।
— না, বাবা নেই।
— আর মাও নেই, অ্যাঁ? বিয়াম্মার প্রশ্ন।
— না, মাও নেই।

তারপর কিছুক্ষণ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা, কেননা তখন তিনজনের মাথাতেই একসঙ্গে একই চিন্তা।
এইভাবেই ও হয়ে গেল আফ্রিকা এনবিয়া, বিয়াব্বা আর বিয়াম্মার শেষ সন্তান, এর আগে ওদের আরও চোদ্দোজন ছেলেপুলে ছিলই, যারা আজ ছড়িয়ে আছে আফ্রিকার সর্বত্র এবং অন্য জগতের সব দেশে।

১০

তা নয় হল, এদিকে বছর যতই কাটতে থাকে, ততই একের পর এক গাছ পড়তে থাকে। বন খালি হতে থাকে। বিয়াব্বার কপাল কুঁচকোতে থাকে।
— ভেব না, একদিন এসব থেমে যাবে।
মুখে বললেও বিয়াম্মা ভালোই জানত যে এসব থামার নয়।
বর্ষার সময়, কাটা গাছগুলোকে নালায় (সবুজ আফ্রিকার নদী) ভাসিয়ে দেওয়া হত। এইসব নালা গিয়ে পড়ত সমুদ্রে। একদিন আফ্রিকা আর গোরিলা নদীর ধারে বসে কাটা গুঁড়িগুলোর ভেসে যাওয়া দেখছিল, গোরিলা হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল:
— খুব বেশিদিন চলার মতো আর তো বাকি রইল না ...
অন্য কথা পাড়ার ছলে আফ্রিকা জিজ্ঞেস করল:
— ধূসর আফ্রিকায় তোর এক তুতো-ভাই থাকে, জানিস?
— বেঁটে, মোটা, চ্যাপ্টা মুণ্ডু, সাভানায় তো? হ্যাঁ, তা জানি, অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় গোরিলা।
ফের দুজনেই চুপচাপ। আর এই নীরবতার মধ্যে গাছ কাটার নিয়মিত শব্দ।
— আচ্ছা, এই গাছেরা সব যাচ্ছে কোথায়? জানতে চায় আফ্রিকা।
গোরিলা একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়েই থাকে:
— কোথায় আর যাবে? অন্য জগতে, আবার কী!
আর তারপর বলেই চলে, যেন নিজেকেই:
— এই রে, এবারে তো একটা কিছু ঠিক করতে হয়, বলার আর কিছু নেই, এবারে মনস্থির করতে হবে।
— আমাকেও, একটা অদ্ভুত স্বর বলে ওঠে, ওদের খুব কাছ থেকেই।
গভীর, নির্জীব একটা নিশ্বাস, প্রায় বুজে যাওয়া একটা কণ্ঠস্বর।
— কেন, তোর আবার কী অসুবিধে? জিজ্ঞেস করে গোরিলা, তুই তো আর গাছে থাকিস না!
— ঠিকই তো, বুঝিয়ে বলে কুমির, আমি জলে থাকি, কিন্তু এখন আমার জলের মধ্যে যে তোর গাছেরা ...
বিয়াব্বাও মন ঠিক করে ফেলল:
— চল, চলে যাই, বলল সে।
— কেন? আফ্রিকা জিজ্ঞেস করে।
বিয়াব্বা ওকে বনের প্রান্তে নিয়ে যায়, ওকে দেখায় শুকনো, ফাটা মাটির সেই বিস্তার, যা আফ্রিকা ট্রাকে করে পেরিয়েছিল (দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন, অফুরন্ত সময় ধরে ...)।
— এই দেখো, বলেছিল বিয়াব্বা, তেমন বেশিদিন নয়, এখানে আদিগন্ত বন ছিল। এখন সব গাছ কেটে ফেলেছে। আর গাছ না থাকায় বৃষ্টিও আর হয় না। দেখো, কিছু গজায়নি। জমি এত শক্ত, যে কুকুরেও আর এই মাটিতে খাওয়া হাড় পুঁতে রাখতে পারে না।
বিয়াব্বা হঠাৎই আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখায়।
— ওই দেখো।
আফ্রিকা আঙুল বরাবর চায়, আর দেখে একটা ছোট্ট কালোমতো কী, উজ্জ্বল, ক্রুদ্ধ, নিজের মাথার ওপর একটা বাঁকানো ছুরি ঘোরাতে ঘোরাতে গোঁ ধরে বনের দিকে এগিয়ে চলেছে।
— কালো কাঁকড়াবিছেরও আর এই অনাবৃষ্টি সইছে না!
বিয়াব্বা চুপ করে। একটা গরম দমকা হাওয়া এসে ধুলোর একটা মেঘ পাকিয়ে তোলে।
— আমাদের সবুজ বাসারও এই দশা হবে ...
ওদের ঠোঁট শুকিয়ে গেছিল।
— চলো, চলে যাই, বলল বিয়াব্বা।

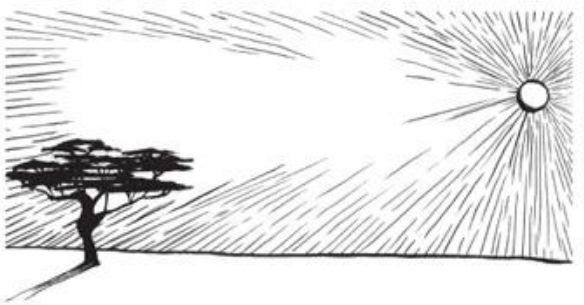

ছবি: কুরচি দাশগুপ্ত

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

ভ্রমণ the most read travel magazine in India*
now brings you

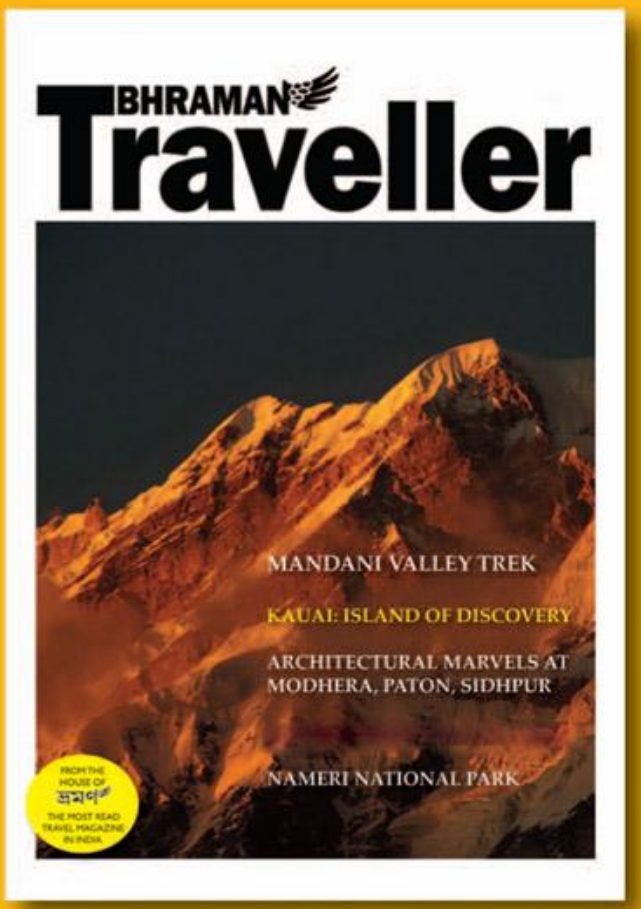

Email: bhramantraveler@gmail.com

BHRAMAN
Traveller

A monthly travel magazine in English

*INDIAN READERSHIP SURVEY 2012 Q2: AVERAGE READERSHIP OF 3,51,000 PER ISSUE

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার
গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 1 No. 8 □ 1 December 2012 □ Rs. 30 Title Code: WBBEN 14529/25/1/2012-TC □ Declaration No. 185 dt. 05/09/12

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

No. 1 Travel Magazine in India with the largest readership*

Available at Newsstand, also with Newspaper Hawker, OR

Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q2*

Website: www.bhraman.com □ www.ebhraman.com